বঙ্গদর্শন ।

মাসিক পত্র ও সমালোচন ।

পঞ্চম খণ্ড ।

কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব ।

প্রথম প্রস্তাব ।

মেঘদূত ।

কালিদাস যে সকল কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমবা তাহাব এক একখানি ধবিয়া ভৌগোলিক তত্ত্বেব বিচাবে প্রবৃত্ত হইব। আমবা সর্ব্বপ্রথমে মেঘদূতনিহিত ভৌগোলিক তত্ত্বেব বিচাবে প্রবৃত্ত হইব।

কুবেবেব জনৈক অনুচব অতিস্ত্রৈণতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা কবাতে কুবেব তাহাকে একাকী একবৎসব কাল রামগিরিতে থাকিতে আদেশ কবেন। যক্ষ কুবেব কর্ত্তৃক এই রূপে নির্ব্বাসিত হইয়া কতিপয় মাস রামগিবিব আশ্রমে অতিবাহিত করে। পরিশেষে আষাঢ়ের প্রথমদিবসে আকাশে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া বিরহবিধুব যক্ষ সজীব পদার্থ জ্ঞানে উহাকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত কবে। এবং বামগিবি হইতে স্বীয় আবাসবাটীর পথনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হয়। মেঘদূতে এই বামগিরি হইতে যক্ষেব আলয় অলকার পথবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগব পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সমস্ত প্রধান২ স্থানেব অবস্থানসন্নিবেশ একে একে বিবৃত হইবে। শৃঙ্খলাব অনুরোধে প্রথমে “বামগিবি” হইতে প্রবন্ধের আরম্ভ কবা যাইতেছে।

(বামগিরি) কালিদাসের বর্ণনানুসারে এই গিরির আশ্রমসলিল জনকতনয়া সীতাব স্নানহেতু পবিত্র এবং ইহার তট-

ভূমি পুরুষদিগের বন্দনীয় রামপদন্যাসে অঙ্কিত।[১] সুতরাং রামচন্দ্র যে অরণ্যবাসসময়ে এই পর্ব্বতে সীতার সহিত কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাস আছে। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে সর্ব্বপ্রথমে চিত্রকূটে সমুপস্থিত হয়েন। রামায়ণের নির্দ্দেশানুসারে ভরদ্বাজের আশ্রম প্রয়াগে ছিল।[২] চিত্রকূটের পথনির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া ভরদ্বাজ রাম ও লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলেন "এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদন তুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। * * তোমরা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গিয়া পশ্চিমযমুনার তীর অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর গেলে একটি তীর্থ (ঘাট) দেখিতে পাইবে, সেই তীর্থে নামিয়া ভেলাদ্বারা নদী পার হইবে। অনন্তর হরিদ্বর্ণ পত্রবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহার ছায়ায় বিশ্রাম কর আর নাই কর তথা হইতে এক ক্রোশ গেলে শল্লকী বদরীযুক্ত ও যমুনাতীরজ বিবিধ বন্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন নয়নগোচর হইবে। ঐপথ দিয়াই চিত্রকূটে যাওয়া যায়, আমি অনেকবার উক্ত পর্ব্বতে গিয়াছি।"[৩] রামায়ণের এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতীতি হয়, চিত্রকূট পর্ব্বত গঙ্গা ও

(১) "যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।" ৮।

* *

"বন্দ্যঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।" ১২।

(২) রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

(৩) "দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্নিবৎস্যসি।

চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ ॥

* * *

গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভৌ।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্ ॥
অথ সাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃসমাগতাম্।
তস্যাস্তীর্থং প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব ॥
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্।
ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তম্ হরিতচ্ছদম্ ॥

* * *

সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্বাতিক্রমেত বা।
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্যচ কাননম্ ।।
শল্লকীবদরীমিশ্রং রাম। বনৈশ্চ যামুনৈঃ।
স পন্থা চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া ॥

রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড।৫৪ ও ৫৫ অধ্যায়।

যমুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমবর্ত্তী বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। অধ্যাপক উইল্‌সনের মতে বুন্দেলখণ্ডস্থ বর্ত্তমান কমতা পর্ব্বতই পূর্ব্বে চিত্রকূট নামে প্রসিদ্ধ ছিল।[৪] অদ্যাপি এই পর্ব্বত পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। যাহা হউক, প্রামাণিক টীকাকার মল্লিনাথ এই চিত্রকূটকেই রামগিরি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৫] কিন্তু এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সরল পথে রামগিরি হইতে কৈলাসে যাইতে হইলে যে যে স্থান প্রাপ্ত হইতে হয়, মেঘদূতে তাহাই বর্ণিত আছে। কৈলাস রামগিরির উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং কৈলাসযাত্রীকে রামগিরি হইতে বাহির হইয়া উত্তরবর্ত্তী পথেরই অনুসরণ করিতে হইবে। এক্ষণে মেঘদূতে দেখা যাইতেছে, কুবেরের অনুচর মেঘের নিকট কৈলাসের পথনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া রামগিরির পর আম্রকূট পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছে। নর্ম্মদা বুন্দেল খণ্ডের দক্ষিণবর্ত্তী স্থান দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। রামগিরি বুন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকূট পর্ব্বতের নামান্তর হইলে নর্ম্মদা কৈলাসযাত্রী মেঘের গন্তব্য পথের ঠিক বিপরীত দিকে পড়ে, সুতরাং মল্লিনাথের সিদ্ধান্তানুসারে নর্ম্মদা নদী পড়িতিমেঘদূতে বর্ণনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কিন্তু কালিদাস যখন রামগিরির পর আম্রকূট পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন রামগিরির অবস্থানসন্নিবেশ এমন কোন স্থানে হইবে যে, সে স্থান হইতে কৈলাসের পথ অতিবাহন করিতে হইলে আম্রকূট পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিতে হয়। এই কারণে আমরা মল্লিনাথের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। মল্লিনাথের অনুসরণ পূর্ব্বক কালিদাসকে উদ্দিষ্ট স্থানানভিজ্ঞ ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা বিষয়ান্তরের অনুসরণ পূর্ব্বক রামগিরির অবস্থানসন্নিবেশ নির্দ্ধারণই অধিকতর সঙ্গত।

কিম্বদন্তী অনুসারে কৈমোর পর্ব্বত

(৪) Wilson's Megha Duta, verse 1 note. চিত্রকূট বুন্দেল খণ্ডস্থ বান্দা বিভাগের অন্তঃপাতী, এবং এলাহাবাদ হইতে ৭১ মাইল দূরে অবস্থিত। পাদদেশে এই পর্ব্বতের পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

কাম্‌তা নাথ চিত্রকূটের অপর নাম। ইহা কামদনাথের অপভ্রংশ। এই পর্ব্বতে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, লোকে বলে এই জন্যই ইহার "চিত্রকূট" নাম হইয়াছে। এই পর্ব্বত হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। Vide Atkinson's Statistical, Descriptive and Historical Account of the North Western Provinces of India. Vol. I, p. 405. Comp As. Res. Vol. XIV, p. 384.

(৫) রামগিরেঃ চিত্রকূটস্য ইত্যাদি। প্রথম শ্লোকের টীকা দেখ।

শ্রেণীর* পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী একটি পর্ব্বত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের আশ্রয়স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকে বলে, রামচন্দ্র প্রভৃতি অরণ্যবাস সময়ে এই পর্ব্বতে একরাত্রি বাস ও ইহার জলে আপনাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন।[৬] রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডে লিখিত আছে, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি পর্ব্বতের অদূরবর্ত্তী সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়াছিলেন।[৭] কৈমোর পর্ব্বতের পশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বত রামায়ণের লিখিত সুতীক্ষ্ণর আশ্রমসন্নিহিত পর্ব্বত হইতে পারে। যাহাহউক, সাধারণবিশ্বাস-অনুসারে এই পর্ব্বতের সহিতই রামগিরির অভিন্নতা কল্পিত হইয়া থাকে। ইহারই অন্যতর নাম রামটিক অথবা রামটেক্ষ। মহারাষ্ট্র ভাষানুসারে রামটেক্ ও রামগিরি একার্থ বোধক।[৮] কেহ কেহ বলেন মেঘদূতোক্ত রামগিরি নাগপুরের

* এই পর্ব্বতশ্রেণীর অক্ষাংশ প্রায় ২৪ ডিগ্রি ৪০ মিনিট ও দ্রাঘিমা প্রায় ৮২ ডিগ্রির সন্ধি স্থল হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় ৭০।৮০ মাইল বিস্তৃত। ইহার একটি অংশের আকার ঘোটাগ্রভাগের ন্যায় (Bengal and Agra Guide 1842, Vol. II. part I. 321.) সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সম্ভবতঃ ২০০০ ফীটের অধিক হইবে। এই পাহাড়শ্রেণী বিন্ধ্যপর্ব্বতের একটি অংশ Thorton, Gazetteer of India, Vol. III. p. 5. Comp. Journ. As. Soc. Beng. 1833, V. 477.

দেশাবলী গ্রন্থেও কৈমোর পাহাড় বিন্ধ্যপর্ব্বতের অংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"বিন্ধ্যগিরি দক্ষিণাংশো (বিন্ধ্যগিরের্দক্ষিণ ইশঃ ?)
কৈমোর পর্ব্বতাবতস্তরে (পর্ব্বতান্তরে ?।")

দেশাবলী। (হস্তলিখিত)

(৬) As. Res. Vol. VII. p 60-61.

(৭) " রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়াচ পরন্তপঃ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ॥
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্॥
ততস্তদিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ॥

* * *

তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবৎ তপোধনমভাষত॥
অস্যাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥

রামায়ণ। আরণ্যকাণ্ড ৭ম সর্গ।

(৮) Wilson's Megha Duta. verse 1. note.

নিকটবর্ত্তী।[৯] আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট রামটিক অথবা রামটোক্‌ও নাগপুরের নিকটে অবস্থিত। সুতরাং রামগিরির সহিত রামটিকের অভিন্নতা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

রামটিক—অন্যতর নাম রামটোক্—ইহা নাগপুর রাজ্যে ও সাগর হইতে নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে রামটিক নামে একটী নগর আছে। এই নগর নাগপুরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে ২৪ মাইল অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের চারিদিকে সমতল ক্ষেত্র। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে পাঁচ শত ফীট উর্দ্ধে কতকগুলি দেবমন্দির আছে। সুগঠিত সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপানদ্বারা উহার উপরে উঠা যায়। এই সোপানমার্গের স্থানে স্থানে বিশ্রাম-যোগ্য উপবেশন স্থান আছে।[১০] পর্ব্বতের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বহুবিধ পল্লী, জলাশয় ও আম্রকাননসমাকীর্ণ নাগপুরপ্রান্তর নয়নগোচর হয়। উত্তর দিকে দুই মাইল প্রশস্ত একটি উপত্যকার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে জঙ্গলময় পর্ব্বতশ্রেণী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই পর্ব্বতমালার অনতিদূরে বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামটিক পর্ব্বতের প্রধান প্রধান মন্দির গুলি রামের নামে উৎসর্গীকৃত, প্রতিবৎসর এই স্থানে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়(১১)। যাত্রীদিগের এই উৎসব চান্দ্র কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া দশদিন থাকে। যাত্রিগণ প্রধানতঃ নাগপুর ও নিজামের রাজ্য হইতে আসিয়া থাকে; ইহাদের সংখ্যা প্রায়ই এক লক্ষের ন্যূন হয় না। মন্দিরের উত্তরদিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বতগহ্বরে একটি প্রশস্ত ও সুন্দর জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের চারিদিকে কতকগুলি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র দেবালয় দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতশিখরস্থ মন্দির হইতে এই গুহাস্থিত দেবালয় পর্য্যন্ত একটি সুগঠিত, সুন্দর ও সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপান আছে। রামটিকের অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি, ২৪ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৯ ডিগ্রি, ২২ মিনিট (১২)।

যক্ষদূত মেঘ রামগিরি হইতে ক্রমাগত উত্তরমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। অধ্যাপক উইল্‌সন্ লিখিয়াছেন, মেঘ আদৌ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পরে উত্তরমুখে কৈলাসগন্তব্য পথে যাইতে আদিষ্ট হইয়া ছিল।(১৩) কিন্তু মেঘদূতের সহিত ইহার একতা লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয় উইল্‌সন্ মেঘদূতের পঞ্চদশ কবিতালিখিত 'পুরস্তাৎ'

(৯) Asiatic Anual Register for 1806

(১০) As. Res. Vol. xviii., p. 206.

(১১) Jenkins, Report on Nagpur, p. 53.

(১২) Thorton, Gazetteer of India, Vol. iv. p. 295-296. Comp. Hamilton, East India Gazetteer, Vol. ii. p. 458.

(১৩) Wilson's Megha Duta, verse 95, note

শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিকে (১৪) করিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মল্লিনাথের মতে পুরস্তাৎ শব্দের অর্থ অগ্রে। সুতরাং মেঘ যে রামগিরি হইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইবে, মল্লিনাথের ব্যাখ্যাদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ মেঘদূতে পূর্ব্বদিকের উল্লেখ নাই; যক্ষ রামগিরি হইতে কৈলাসগন্তব্য পথের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া মেঘকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্পষ্টই বলিয়াছে, 'সরস বেতসময় এই রামগিরি হইতে উত্তরাভিমুখ হইয়া আকাশপথে প্রস্থান কর' (স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্ মুখঃ খং।) যক্ষের এই উক্তিতে মেঘের প্রতি পূর্ব্বাভিমুখে গমনাদেশ সমর্থিত হইতেছে না। রামগিরির অবস্থানসন্নিবেশ পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, মেঘের গতি নাগপুরনগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকবর্ত্তী ছত্রিশ গড় (১৫) বিভাগের মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মানচিত্রে নাগপুর ও ছত্রিশ গড়ের অবস্থানসন্নিবেশ দেখিলেই ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মেঘ রামগিরি হইতে প্রস্থান করিয়া 'মাল' নামক ক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হয়। মাল শব্দের অর্থ শৈলপ্রায় উন্নত স্থল। কর্ণেল উইলফোর্ডকৃত পৌরাণিক স্থানাদির তালিকার মধ্যে "মাল" শব্দের উল্লেখ আছে।(১৬) উইলফোর্ডের মতে এই "মাল" মেদিনীপুর বিভাগের "মালভূমি।" ১৭) কিন্তু অধ্যাপক উইল্‌সন্ ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই। তিনি মেঘদূতোক্ত ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসরণ পূর্ব্বক উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকে ছত্রিশ গড় বিভাগের অন্তর্গত

---

(১৪) বত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ ইত্যাদি।

মেঘদূত। ১৫।

উইল্‌সনের অনুবাদ:—

Easlevard, where various gems, with blending ray, &c &c

(১৫) নাগপুর রাজ্যের গোন্দয়ানা প্রদেশ এই বিভাগে অবস্থিত। মুসলমানেরা এই স্থানকে প্রায়ই জেহার খণ্ড বলিয়া থাকে। এই বৃহৎ বিভাগের কোন কোন অংশে শৈলপ্রায় ভূমি ও অকৃষ্ট জঙ্গল আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সমুদয় স্থানই উর্ব্বরতা গুণসম্পন্ন। ছত্রিশ গড়ের রাজধানী রতনপুর। Vide Hamilton's Hindustan, Vol. II., p. 22. Comp. Spry. Modern India, Vol, II. p. 140.

রতনপুর হাজারিবাগ হইতে নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। ইহা হাজারিবাগের ৩৩০ মাইল। (Garden Tables of route, 200) দক্ষিণ পশ্চিম ও নাগপুরের ২৩৪ মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকবর্ত্তী। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রাজপুর (Blunt, As. Res. vii. 105) ছিল; পরে এই স্থানের জনৈক রাজা রতনসিংহের নামে ইহার "রতনপুর" নাম হইয়াছে। Blunt, As, Res, vii 101. Comp. Hamilton, ut. supra. p. 22-23. Thorton Gazetteer of India Vol, iv. p 349-350.

(১৬) As. Res. Vol. viii. p. 336.

(১৭) Ibid, p. 336.

করিয়াছেন।(১৮) কালিদাস যখন রাম-গিরির পরেই "মাল" নামক ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহা ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে বক্তব্য নাই। কিন্তু পুরাণান্তর্গত মালই যে কালিদাসের ছত্রিশ গড়ান্তর্গত মালনামক ক্ষেত্র তদ্বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। উইলফোর্ড মাল ও মালী একপর্য্যায়ে নিবেশিত করিয়া উভয়কেই মেদিনীপুরান্তর্গত মাল ভূমি বলিয়াছেন। মাল যদি মহাভারত ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত মালবের ন্যায় কেবল জাতিবাচক হয়,(১৯) তাহা হইলে মালীর সহিত উহার অভিন্নতা সমর্থিত হইতে পারে। সেকেন্দর সাহ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মালী ও অক্ষিদ্রক নামে দুটী রণপ্রিয় জাতিকে পরাজিত করেন। প্লিনি এরিয়ান ও স্ত্রাবো প্রভৃতির গ্রন্থে এই জাতিদ্বয়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। সেকেন্দর মালীদিগের হস্ত হইতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, এতন্নিবন্ধন তাঁহার সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া ইহাদের অনেককে মৃত্যুমুখে পাতিত করে,(২০) পাণিনি ৫।৩।১১৪ সংখ্যক সূত্রে এই বিধান করিয়াছেন যে, পঞ্জাব দেশীয় যোদ্ধৃজাতি বুঝাইতে তাহাদের নামের উত্তর "য" আদেশ ও পূর্ব্বস্বরের বৃদ্ধি হয়। টীকাকারগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল "মালব্য" ও "ক্ষৌদ্রক্য" এই দুটিপদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(২১) অতএব "মালব" ও "ক্ষুদ্রক" নামে যে পঞ্জাব দেশে দুটি

(১৮) Wilson's Megha Duta verse 99, note. Comp. Wilson's Essays, Annalytical &c., Vol vii Ed. by Fitzedward Hall p. 157, note. 5.

(১৯) মহাভারতে নকুলের পশ্চিম দিগ্বিজয় বর্ণনায় মালবের উল্লেখ আছে।
যথা ;—শিবং স্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চ কর্পটান্।
তথা মধ্যমকেয়াংশ্চ বাটধানান্ দ্বিজানথ॥ ইত্যাদি
মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায় ৩৬।

স্থলান্তরে—
অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।
বশাতয়শ্চ মৌলেয়াঃ সহক্ষুদ্রকমালবৈঃ॥
মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় ৫১।

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবা। ভাগবত পুরাণ।
Comp Wilson's Essays Ed. by Fitzedward Hall Vol. vii p. 133.note.

বিষ্ণুপুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনায় মালবজাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় :—
তথা পরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরা ভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারুষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

(২০) Cunningham, Ancient Geography of India, p. 238-239.

[২১] ৫।৩।১১৪ : আয়ুধজীবি সঙ্ঘাঞ্ঞ্যড্বাহীকেষ্বব্রাহ্মণরাজন্যাৎ।
বাহীকেষু য আয়ুধজীবিসঙ্ঘস্তদ্বাচিনঃ স্বার্থে ঞ্যট্। ক্ষৌদ্রক্যাঃ। মালব্যাঃ।
সিদ্ধান্তকৌমুদী।

বণপ্রিয় জাতি বাস করিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।(২২) এই "মালব" ও "ক্ষুদ্রকের" সহিত অনায়াসে সেকন্দারের পরাজিত "মালী" ও "অক্সিদ্রক" জাতি তুলনীয় হইতে পারে।(২৩) কানিংহাম মুলতান বাসীদিগকেই "মালী" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(২৪) যাহাহউক মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও পাণিনির "মালব" এবং গ্রীকদিগের "মালী" একজাতিবাচক শব্দ। এই জাতিবাচক "মালীর" সহিত স্থানবাচক শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উইলফোর্ড যে "মাল" ও "মালী" এক পর্য্যায়ে নিবেশিত করিয়া মেদিনীপুরান্তর্গত মালভূমের সহিত উহার অভিন্নতা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উইলসন্ সাহেব উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকেই কালিদাসের লিখিত "মাল" নামক ক্ষেত্র বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্থলান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বায়ু ও মৎস্য পুরাণে জাতিবাচক শব্দের মধ্যে "মাল" ও মালবর্ত্তীর প্রয়োগ আছে।(২৫) সুতরাং উইল্সনের মতানুসারে এক পৌরাণিক মালই একসময়ে স্থানবাচক অন্য সময়ে জাতিবাচক হইতেছে। এরূপ বিভিন্ন মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যে শব্দ একটি বিশেষ জাতিকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা কি প্রকারে একটি বিশেষ ক্ষেত্রের দ্যোতক হইবে? আমাদের বিবেচনায় পৌরাণিক "মাল" ও "মালব" এবং গ্রীকদিগের "মালী" সকলই একটি বিশেষ জাতির নির্দ্দেশক, ইহার সহিত মেঘদূতোক্ত মালক্ষেত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই। ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে একটি ক্ষেত্র শৈল

"ক্ষত্রিয়াদেকরাজা দিতিবক্তব্যং। কিং প্রযোজনং। সংঘপ্রতিষেধার্থং। সংঘান্মা ভূৎ। পঞ্চালানামপত্যং বিদেহানামপত্যমিতি। + × ইদং তর্হি ক্ষৌদ্রকানামপত্যং (ক্ষুদ্রকানামপত্যং ?) মালবানামপত্যমিতি। অত্রাপি ক্ষৌদ্রক্যো মালব্য ইতি।" পাণিনীয় ৪।১।১৬৮ সূত্রের পতঞ্জলির ভাষ্য। Vide Professor Goldstucker's Patanjali's Mahabhashya. Photo-Lithography Edition Vol. II. p. 1224

[২২] See "Indian Antiquary." Vol. I. p. 21-23.

[২৩] প্রস্তাবলেখক বিরচিত পাণিনি বিচারের ১১১-১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

[২৪] Ancient Geography of India. p., 237.

[২৫] Professer Wilson's Essays, Annalytical, &c., vol. vii. Ed. by Fitzedward Hall p. 157. note, 5.

অধ্যাপক উইলসন্ বলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে গণবর্ত্তী বলিয়া একটী জাতির নাম আছে। তিনি এই গণবর্ত্তীর সহিত মালবর্ত্তীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। হল সাহেব বলেন হস্তলিখিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে মালদ নামক একটী প্রাচ্য জাতির নির্দ্দেশ আছে (Wilson's Essays, vii 157 Fitzedward Hall's note.) মহাভারতের সভাপর্ব্বেও এই জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বিষয় স্থলান্তরে লিখিত হইল।

প্রায় ও সাধারণ ভূমি অপেক্ষা উন্নত বলিয়া কালিদাস উহা "মাল" এই আভিধানিক নামে বিশেষিত করিয়াছেন। মেঘদূতে এই কৃষিক্ষেত্রের এই রূপ উল্লেখ আছে:—

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসান ভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃপীয়মানঃ
সদ্যঃ সীরোৎকষণ সুরভি ক্ষেত্র মারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবো- ত্তরেণ॥"

"কৃষিফল তোমারই অধীন, এইজন্য ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ পল্লীবধূগণ তোমায় প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে দেখিতে থাকিবে। তুমি মালক্ষেত্রে বর্ষণ করিলেই হলকর্ষণে উহা হইতে সৌরভ বহির্গত হইবে। কিয়ৎ-ক্ষণের পর তুমি এই ক্ষেত্র হইতে পুনর্ব্বার উত্তর দিকে গমন করিও।"

এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, মেঘের গন্তব্য পথে একটি কৃষিভূমি পড়িযাছিল পর্ব্বত সান্নিধ্য হেতু এই ভূমি শৈলপ্রায় ও উন্নত বলিয়া উহা মাল-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ বলেন, রতনপুরের কিছু উত্তরে "মালদ" নামে একটি নগর আছে। এক্ষণে কেবল এই মালদে মালের চিহ্ন পাওয়া যায়। পরন্তু টলেমীর মানচিত্রে মালেত নামে একটি স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের "মাল" ও টলেমীর "মালেত" উভয়ই বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক দিকে অবস্থিত। এই "মালদ" ও 'মালেত' মেঘদূতোক্ত "মাল" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।(২৬) আমরা উইল্‌সনের এমতেও আস্থাবান্ হইতে পারি না। উইল্‌সন মেঘদূতের "মালকে" একটি জনপদ ভাবিয়াই মালদ ও মালতের সহিত উহার অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস সফল হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাচ্য জাতির মধ্যে মালদ নামক এক এক জাতির উল্লেখ আছে।(২৭) মহাভারতে ভীমসেনের পূর্ব্ব দিক্ বিজয় বর্ণনাতেও এই জাতির নির্দ্দেশ লক্ষিত হয়। ভীম দশার্ণ প্রভৃতি জয় করিয়া মালদ প্রভৃতিকে সমরে পরাজিত করেন।(২৮) আমাদের বিবেচনায় টলেমীর "মালেত" এই "মালদ" জাতির

[২৬] Wilson's Megha Duta, verse 99 note.

[২৭] Wilson's Essays, Annalytical &c., vol. vii. Edited by Fitzedward Hall, p. 157, Hall's note 3.

[২৮] এতস্মিন্নেব কালেতু ভীমসেনোঽপি বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মরাজ মনুজ্ঞাপ্য যযৌ প্রাচীং দিশং প্রতি॥
* * *
বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ।
তত্র দশার্ণ কা রাজা সুধর্ম্মালোমহর্ষণঃ।

অধিষ্ঠিত জনপদ। ইহার সহিত কালিদাসের মালক্ষেত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সিন্ধুদেশে "মাল" নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহা সিন্ধুনদের উপশাখা। পূর্ব্বে এই নদী বড় ছিল, কিন্তু এক্ষণে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই নদীর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কেবল ২৫ টন বোঝাই নৌকা যাইতে পারে।(২৯)

মালক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মেঘ আম্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হয়। কালিদাসের বর্ণনানুসারে এই পর্ব্বতের পার্শ্বভাগ আম্রকাননে পরিব্যাপ্ত।(৩০) এই জন্যই ইহা "আম্রকূট" নামে আখ্যাত হইয়াছে। মেঘ এই আম্রকূট পর্ব্বত দিয়া নর্ম্মদাতীরে উপনীত হয়। পূর্ব্বে মেঘের গমনপথ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান অমরকণ্টক পর্ব্বতই কালিদাসের আম্রকূট বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।(৩১) সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের অন্তঃপাতী ব্রিটীষাধিকৃত রামগড় বিভাগে রতনপুরের ২৮ মাইল উত্তরে অমরকণ্টক পর্ব্বত অবস্থিত। গোন্দ-যানার জঙ্গলময় উন্নত ভূমির মধ্যভাগে এই পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের ৪০ ফীট উর্দ্ধে একটি অট্টালিকা আছে। এই অট্টালিকায় অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। বিগ্রহের অধিকাংশই ভবানীর প্রতিমূর্ত্তি। এই দেবমন্দির হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্দিরের নিকটে প্রস্তরময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি জলাধার আছে। ইহা হইতে যে জল নির্গত হইয়াছে, স্থানীয় লোকে তাহা নর্ম্মদা নদীর মূল বলিয়া থাকে। অনেকের মতে এই জলাধার শোণ নদীরও উদ্ভবস্থান। কিন্তু টিফেন মালারের মতে ইহার অর্দ্ধ মাইল অন্তরে শোণ নদীর উৎপত্তি হই-

---

কৃতবান্ ভীমসেনেন মহদ্যুদ্ধং নিরায়ুধং।

যুধ্যমান বলাৎ সঙ্খ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
ততো মৎস্যান্ মহাতেজা মলদাশ্চ মহাবলান্॥

মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায় ২৮ ও ২৯।

Comp. Journ. As. Soc of Bengal, vol. xiv. part I. No. II. 1876. p. 373.

[২৯] Edward Thorton, A Gazetteer of the Countries adjacent to India on the N. West, vol. II. p. 75.

[৩০] ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যারূঢে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধ বেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমর মিথুন প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

পূর্ব্বমেঘ। ১৮।

[৩১] Wilson's Megha Duta. verse 104, note.

য়াছে। অমর কণ্টকের চতুর্দ্দিক্ নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত, গমনাগমনের প্রায় পথ নাই। একরূপ দুর্গম হইলেও এই পর্ব্বতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানের স্বত্ব লইয়া পূর্ব্বে অনেক গোলযোগ ছিল; পরে ১৮২৬ অব্দে নাগপুরবাস রঘুজী ভোঁসলার সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইহা ব্রিটীষ অধিকারভুক্ত হইয়াছে।(৩২) যদিও জব্বলপুর হইতে এই পর্ব্বত ১২০ মাইল অন্তরে অবস্থিত, তথাপি এপর্য্যন্ত সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। এই উচ্চতা এক গণনানুসারে [৩৩] ৫০০ ফীট অন্য গণনানুসারে [৩৪] ৩৫০ ফীট নিরূপিত হইয়াছে। থর্টনের মতে শেষোক্ত গণনাই অধিকতর সঙ্গত। বৎসরের যে সময় গ্রীষ্মের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময় অমরকণ্টকে তাপমানের পারদ কদাচিৎ ৯৫ ডিগ্রি অতিক্রম করিয়া থাকে।[৩৫]

সতীদাহ।

(প্রতিবাদ)

বিগত আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে সতীদাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহার সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। দুটি বিষয়ের জন্য লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রথম, তাঁহার লিপিচাতুর্য্য, দ্বিতীয়, অভাগিনী বিধবাদিগের দুঃখে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি। জলন্ত চিতায় জীবিত মনুষ্যের পুড়িয়া মরার পক্ষ যিনি সমর্থন করেন, লোকে তাঁহাকে আপাততঃ কঠিন-হৃদয় বলিয়া মনে করিলেও করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিনিবিষ্টচিত্তে প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, লেখক একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি। বিধবার দুঃখে যথার্থই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত। এমন কি, বোধ হয়, তাঁহার হৃদয়ই প্রধানতঃ তাঁহাকে এই ভয়ানক মতে আনিয়াছে যে, যাব-

[৩২] Aitcheson Acollection of Treaties. vol, III p, 112. Camp' Empire in India, p, 192-183.

[৩৩] Bengal and Agra Guide, 142 vol II part I p 823.

[৩৪] Spry Modern India, vol II p 145 note 2.

[৩৫] Thorton, Gazetteer of India vol I p 104-106. Comp As Res vol viii pp 89 96, 99 Hamiltons Hindustaa vol II p 16-17 Malcoln's Central India vol II p 507.

জীবন পুড়িয়া মরা অপেক্ষা একদিনে পুড়িয়া মরা ভাল।

প্রশংসার দিকে যাহা বলিবার ছিল বলিলাম। এক্ষণে প্রবন্ধটির মধ্যে যে সকল ভ্রম আছে, ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের বিষয় বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটি কথার সমালোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

লেখক পত্যনুগমনের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই স্থির করিয়াছেন যে, বিধবার দুর্গতি উহার প্রকৃত কারণ নহে। দুটি যুক্তি দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি এই "বৈধব্য দুঃখই যদি সহমরণের কারণ হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবা পতিবর্গ্গা হইত। তাহা হয় নাই।" এই যুক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। লেখকের বাক্যের মর্ম্ম এই যে, যদি বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে কোন সাধারণ দুঃখ থাকে, এবং সেই দুঃখের জন্য যদি তাহারা মরে, তবে অধিকাংশ কিম্বা অনেক লোক মরিবে। নিতান্ত অল্পাংশ লোক কখন মরিবে না। সুতরাং বৈধব্য যন্ত্রণার ভয়ে যদি বিধবারা সহমৃতা হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবাই সহমৃতা হইত, "ঊর্দ্ধ সংখ্যা হাজারে পাঁচ জন" কেন হইবে।

এই যুক্তির বল কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। স্পষ্ট করিয়া বলি, যুক্তিটি নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ইহা সকলেই জানেন যে, দারিদ্র্যদুঃখের ভয়ে কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যত লোক দারিদ্র্যনিবন্ধন কষ্টভোগ করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ বা বহুসংখ্যক লোক কি আত্মঘাতী হইয়া থাকে? কখনই না। নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকেই উক্ত ভয়ানক কার্য্য করিয়া থাকে। যত লোক কষ্টভোগ করে, তাহাদের দুর্দ্দশার সমতা থাকিলেও তন্মধ্যে যাহারা নিতান্ত অসহিষ্ণু তাহারাই আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তত দূর দুর্ব্বলমতি লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই যার পর নাই অল্প। দারিদ্র্যবিষয়ে যে প্রকার, বৈধব্য সম্বন্ধেও কেন তাহা না হইবে? দরিদ্রদিগের মধ্যে সাধারণ দারিদ্র্যদুঃখের ভয়ে যেমন নিতান্ত অল্পসংখ্যক দরিদ্র আত্মবিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিধবাদিগের মধ্যে সাধারণ বৈধব্যদুঃখের জন্য নিতান্ত অল্পসংখ্যক বিধবা—"ঊর্দ্ধসংখ্যা হাজারে পাঁচ জন" সহমৃতা হইত। একরূপ বলিলে কি অযুক্ত বাক্য বলা হয়?

স্বর্গলাভের জন্য বিধবারা সহমৃতা হইত কি না এই বিষয় বিবেচনা করিয়া, লেখক তৎপরে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহারা ভালবাসার জন্য মরিত না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি কথার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ

হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নারী-ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। হিন্দু-ললনার ধর্ম্ম, পতিভক্তি—পতিপ্রেম নহে।" লেখক আরও বলিয়াছেন, "যদি কিঞ্চিৎ প্রেমশিক্ষা আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে।" আমরা স্বীকার করি যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ অতি বাহুল্যরূপে পতিভক্তির উপদেশ চিরকাল দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে,হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম কোনকালে দাম্পত্যপ্রণয়ের শিক্ষা দান করেন নাই। সত্য ঠিক গোলাকার পদার্থের ন্যায়। একেবারে সকল দিক্ দেখা যায় না। যিনি যে দিক্ দেখেন, তিনি সেইদিকে-রই বিষয় জানিতে পারেন; অপরদিকের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না। যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখেন, তাঁহারই সকল দিকের জ্ঞানলাভ হয়। যদি সকল দিক্ দেখিতে পার, ভালই। কিন্তু যদি কেবল একদিক দেখিয়া থাক, তবে সেই এক দিকের কথা বল। আপনাকে সকল দিকেরই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করিও না। সতীদাহ-লেখক কেবল একদিক দেখিয়াছেন। দেখুন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিক্ দেখিয়া যে আপনাকে সকল দিকের বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করিয়াছেন,—সকল দিক্ সেই একদিকের ন্যায় ভাবিয়াছেন,—ইহাই অন্যায় হইয়াছে। তিনি একদিক্ দেখিয়াছেন,—তিনি দেখিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ বাহুল্যরূপে পতিভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অপর দিক্ দেখেন নাই,—তিনি দেখেন নাই যে, হিন্দু-সমাজ পতিপ্রেমেরও উপদেশ দেন।

লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ কখন হিন্দুরমণীগণকে শিক্ষা দেন না যে, স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে। তিনি এ কথার কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি বলিতে পারেন যে, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রমাণের ভার তাঁহার উপর নাই। ভাল; আমরা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিব যে তাঁহার কথা সত্য নহে।

যাঁহারা বিবাহের মন্ত্রগুলি কখন মন দিয়া শুনিয়াছেন তাঁহারাই বলিবেন যে, লেখকের কথা সত্য নহে। আমরা নিম্নে উক্ত মন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবা সমাপোহৃদয়ানিমৌ।

(ঋগ্বেদী বিবাহের মন্ত্র।)

সমস্ত দেবতারা তোমাদের হৃদয়কে সমান করুন।

উক্ত মন্ত্রসকল হইতে নিম্নে আর একটি অংশ উদ্ধৃত হইল।

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

(সামবেদী বিবাহের মন্ত্র।)

অর্থাৎ এই যে তোমার হৃদয়, তাহা আমার হউক; এই যে আমার হৃদয় তাহা তোমার হউক।

জিজ্ঞাসা করি এ গুলি কি প্রেমের কথা নহে? জিজ্ঞাসা করি এই কয়েকটি শব্দে প্রেমশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব যেমন সহজে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে, পাঠকবর্গ এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন? এই কয়েকটী শব্দে যিনি উচ্চতম দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব অনুভব করিতে না পারেন, তিনি প্রেমতত্ত্ববিষয়ে নিতান্তই মূর্খ। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি দেখিতে পান যে, এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সুন্দর প্রেমময় জগৎ অবস্থিতি করিতেছে।

নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে।
(শান্তিপর্ব্ব : ১৩৪।৫৫০৮।)

ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই, ইহলোকে ধর্ম্মসাধনে ভার্য্যার সমান আর সহায় নাই।

আমাদের স্ত্রীলোকেরা নিরক্ষর। সুতরাং এমন বলিতেছি না যে, এই সকল সংস্কৃত বচনে তাহাদের পতিপ্রেম শিক্ষা হয়। এই সকল বচনে কেবল লেখকের একটি কথার খণ্ডন হইতেছে তিনি বলিয়াছেন যে, "স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজকর্তৃক নারী ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই" এই কথা খণ্ডনের নিমিত্ত বচনগুলি দেওয়া গেল। অধিক বিচার করিতে হয় না, সামান্য বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, লেখকের কথা সত্য নহে। হিন্দুসমাজ চিরদিন আমাদের রমণীকুলের সম্মুখে দুইটি মনোহর আদর্শ ধারণ করিয়া আছেন। একটি সীতা, আর একটী সাবিত্রী। এই দুইটি আদর্শের প্রতি হিন্দুরমণীকুলের মনশ্চক্ষু বংশপরম্পরায় স্থির হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ নিরক্ষর। সংস্কৃত বচন তাহারা বুঝে না। কিন্তু কথকতা, প্রচলিত যাত্রা গান প্রভৃতির দ্বারা সীতা ও সাবিত্রীর কথা তাহাদের অস্থি মাংস মজ্জার মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। "সাবিত্রী সমানা হও" ইহাই প্রচলিত আশীর্ব্বাদ। জিজ্ঞাসা করি, এই সীতা ও সাবিত্রী চরিত্রে কি প্রেম নাই? কে না বলিবে যে, এই দুটি নারীচরিত্রে পতিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রেম অতি সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। যে সমাজ নারীকুলের সম্মুখে সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় পবিত্র আদর্শদ্বয় চিরকাল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন্ মুখে বলিব যে সে সমাজ তাহাদিগকে পতিপ্রেম শিক্ষা দেয় না?

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রেম ও ভক্তির পরস্পর এমনি সম্বন্ধ যে একটি সহজেই আর একটিতে পরিণত হয়। বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর যে প্রকার নিগূঢ় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে ভক্তি

প্রেমরূপে ও প্রেম ভক্তিরূপে পরিণত হওয়া এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, সমাজের সাহিত্যে সমাজের লোকের মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করি হিন্দুসাহিত্যে দাম্পত্য-প্রণয়ের বর্ণনার কি কিছু অসদ্ভাব আছে? কে সাহস করিয়া বলিবে যে সংস্কৃত সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের কোন বর্ণনা নাই। ভাল; সংস্কৃতসাহিত্য ত দূরের কথা। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে কি প্রকাশ পায়? ইংরেজিওয়ালাদের লিখিত বাঙ্গালাসাহিত্য ছাড়িয়া দিন; যে বাঙ্গালাসাহিত্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গন্ধ মাত্র নাই সেই সাহিত্য দেখুন। কে বলিবে যে, বেহুলা ও খুল্লনার চরিত্রে প্রেম নাই।

"দাম্পত্যপ্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে।" ইহা অতি অসার কথা। স্বীকার করিতে পারি যে নব্যদলে দাম্পত্যপ্রণয়ের ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু "কেবল নব্যদলে" এ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য। লেখকের নিজের কথারই পরস্পর সঙ্গতি নাই। "কেবল নব্য দলে" বলিয়া আবার বলিতেছেন "আমরা এমন বলিতেছি না যে, পূর্ব্বতন হিন্দুললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল না।" তাঁহার মতে নব্যদলে যে, দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব আছে, তাহাও "কিঞ্চিৎ" সুতরাং তাঁহার কথানুসারে ইহাই হইতেছে যে, পূর্ব্বতন রমণীকুলের হৃদয়ে যে প্রেম ছিল তাহা কিঞ্চিৎ হইতেও কিঞ্চিৎ, অর্থাৎ প্রায় কিছুই নহে।

সহমরণের প্রকৃত কারণ কি, নিরূপণ করিয়া, লেখক তৎপরে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মহত্যা মহা পাপ বলিয়া যাঁহারা সহমরণের বিরোধী, লেখক তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "আত্মহত্যা পাপ কিসে তাহা ঠিক বুঝা যায় না।" একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এ প্রকার কথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। পূর্ব্বেও আমরা দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এরূপ শুনিয়াছি। সে যাহা হউক আত্মহত্যা পাপ কেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে অধিক কথা বলিবার স্থান নাই। সংক্ষেপে একটি কথা বলিতেছি।

অপর মনুষ্যের প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য আছে। অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য নাই সংসারে এমন মনুষ্য নাই। পিতা মাতা, কন্যা পুত্র, প্রভৃতি সমুদয় পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য; প্রতিবেশীগণের প্রতি কর্ত্তব্য; বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি কর্ত্তব্য; সমগ্র জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য এই প্রকার লোকব্যাপী কর্ত্তব্যজালে প্রত্যেক মনুষ্য পরিবেষ্টিত। নর কি নারী, যুবা কি বৃদ্ধ, পণ্ডিত কি বর্ব্বর, ধনী কি দরিদ্র, সধবা কি বিধবা কাহারও

বলিবার যো নাই যে, তাঁহার অন্যের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই। এই কর্ত্তব্য পবিত্র পদার্থ। উহা কাহারও অবহেলা করিবার, লঙ্ঘন করিবার অধিকার নাই। কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন মহা পাপ। আত্মহত্যা দ্বারা সকল প্রকার কর্ত্তব্য-সাধন হইতে আপনাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হয়, সুতরাং আত্মহত্যা করিবার কাহারও অধিকার নাই, আত্মহত্যা মহা পাপ।

যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করেন তিনি মহাভ্রান্ত। নর কি নারী প্রত্যেক মনুষ্য জনসমাজরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রের একটি একটি অংশ মাত্র। প্রত্যেককে সেই অংশের কার্য্য করিতেই হইবে, না করিলে নিশ্চয় অপরাধ। জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুবিধবার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? যখন সে ব্যক্তি, জনসমাজের এক অংশ, তখন নিশ্চয়ই অন্য ব্যক্তির সহিত সেও কর্ত্তব্যের পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ। সুতরাং তাহার আত্মবিনাশের অধিকার নাই।

সকলেই বলিবেন যে, হত্যাকারীর দৃষ্টান্ত বড় মন্দ। তাহার দেখা দেখি অন্য লোকেও যদি হত্যা করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সমাজে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়। সেইরূপ বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মবিনাশ করে, সে অপরাপর দুঃখীকে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আর ইহসংসারে দুঃখ কাহার নাই? বাস্তবিক অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন আত্মহত্যা হইতে আরম্ভ হয় তখন চারিদিক্ হইতে আত্মহত্যার সংবাদ আসিতে থাকে। সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যার সংবাদ পাঠ করিতে হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে দৃষ্টান্ত যে, এ বিষয়ের একটি প্রধান কারণ তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই। যে বিধবা নারী সহমৃতা হইতেন, তাঁহারও তদবস্থাপন্ন অপর স্ত্রীলোকদিগকে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইত।

লেখক তৎপরে বলিয়াছেন যে, নিউটন, কেপ্লর, গালিলিও প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যখন "সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই তখন দুঃখিনী হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি?" নিউটন প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যে সংসারের বিশেষ ক্ষতি নাই, ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই,—নিউটন না জন্মিলেও মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইত, গালিলিও না জন্মিলেও পৃথিবীর বার্ষিক গতি আবিষ্কৃত হইত, হর্বি না জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত ইত্যাদি। তবে কিনা দশদিন অগ্র পশ্চাৎ। "সকলই সময়ে করে।" নিউটনের পূর্ব্বেও ইউরোপে বুদ্ধিমান্ তত্ত্বানুসন্ধায়ী লোক ছিল, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্ক্রিয়ার পক্ষে যে সকল সত্যের আবিষ্ক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যক, সে সকল তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, মাধ্যা-

কর্ষণও তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সময়ে ও সমাজের যে অবস্থায় নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ও সেই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইতই হইত। নিউটন যখন উক্ত নিয়ম আবিষ্ক্রিয়া করেন, ফ্রান্সে তখন আর এক ব্যক্তি উক্ত নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই জন্য লেখক বলেন যে নিউটনের ন্যায় লোকের মৃত্যুতেও সমাজের তাদৃশ ক্ষতি নাই।

এই কয়েকটি কথার উপর আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, বলিতেছি। মনে করুন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত করিবার পূর্ব্বেই নিউটনের মৃত্যু হইল। দেখুন, ইহাতে সমাজের কি ক্ষতি হইল। যদি নিউটনের সমতুল্য ব্যক্তি—আর একজন নিউটন,—তখন জগতে থাকেন তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু যদি তেমন লোক কেহ না থাকেন, (থাকিবেনই থাকিবেন এমন কোন নিয়ম নাই) অথবা আর যিনি আছেন তাঁহারও মৃত্যু ঘটিল, তাহা হইলে কি হইবে? নিশ্চয়ই উক্ত নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব হইবে। কতদিন বিলম্ব হইবে? যতদিন না আর একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আর একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করিতে কত বিলম্ব হইবে? তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। বলিবার কোন উপায় নাই। দশ কি পঁচিশ, পঞ্চাশ কি একশত বৎসর তাহা কোন প্রকার গণনায় স্থির হইতে পারে না। এই অনিশ্চিতকাল, হয় ত অনিশ্চিত অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্ক্রিয়া বন্ধ থাকিবে। কেবল তাহাই নহে। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্ক্রিয়ার উপর যে সকল সত্যের আবিষ্ক্রিয়া নির্ভর করে, সে সকলেরও আবিষ্ক্রিয়া এই অনিশ্চিত কালের জন্য বন্ধ রহিল;—বিজ্ঞানের উন্নতি, সুতরাং জনসমাজের উন্নতি বন্ধ রহিল। নাদের সা কর্তৃক দিল্লির হত্যাকাণ্ড, অন্ধকূপ হত্যা, কিম্বা বাখরগঞ্জের জলপ্লাবন কি ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুর্ঘটনা? নিউটনের মৃত্যুতে এই ভয়ানক ক্ষতি হইল। ইহাতেও কি বলিব যে, "সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই?"

এখনও আর একটি কথা বলিবার আছে। "যে সময়ে এবং সমাজের যে অবস্থায় তিনি (নিউটন) পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত"। "হইতই হইত" ইহা আমরা মানি না। আমরা বলি হইত যদি নিউটনতুল্য কোন ব্যক্তি তখন জীবিত থাকিতেন, নতুবা নহে। নিউটন ভিন্ন নিউটনের কার্য্য কোন সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। এমন কি বহুসংখ্যক সামান্যবুদ্ধিব্যক্তি সমবেত হইলেও কেবল সময়ের গুণে প্রতিভাশালীর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। একথা মিল সুস্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন।*

* সতীদাহ লেখক বকলের মত গ্রহণ করিয়াছেন। মন উক্ত মত গ্রহণ করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েক পংক্তি পরপৃষ্ঠায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তাদৃশ ক্ষতি নাই" এ কথার অর্থই বুঝিতে পারি না। সংসারে এমন দুর্ঘটনা কিছুই নাই যাহার সম্বন্ধে একভাবে ঐ কথাটি বলা না যাইতে পারে। মনে করুন কলিকাতা নগর মহামারীতে বিনষ্ট হইয়া গেল। যাক্। "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" নিউটনের মৃত্যুর ক্ষতির ন্যায় এ ক্ষতি অপূরণীয় নহে। সময়ে আবার উহার তুল্য কত নগর সৃষ্টি হইবে। মনে করুন, সমগ্র বঙ্গভূমি সাগরগর্ব্ভে মিশাইয়া গেল। যাক্। "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বঙ্গভূমি কতটুকু স্থান। মনে করুন, ভারতবর্ষ একেবারে বিলুপ্ত হইল। "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" সমস্ত ভূমণ্ডলের তুলনায় ভারতবর্ষ কিছুই নয়। মনে করুন সমগ্র পৃথিবী প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। মনে করুন, কোন অচিন্তনীয় কারণে সৌরজগৎ বিনষ্ট হইল। তাহাতেই বা কি? "তাদৃশ ক্ষতি নাই।" প্রকাণ্ড বালুভূমির মধ্যে একটি বালুকণা যেমন, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই প্রকাণ্ড সৌরজগৎও সেইরূপ।

প্রদর্শিত হইল যে লেখকের যুক্তির মূল নাই আর যদি বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে, বিধবার মৃত্যুতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও এমন প্রমাণ হয় না যে তাহার মরিবার অধিকার আছে।

লেখক তৎপরে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে যুক্তিটি এই,—সংসারে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই জীবিত চেষ্টার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং জীবিত চেষ্টার বৃদ্ধি হইলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে উন্নতিও তত অধিক হইতে থাকে। যে কোন প্রথা জনসংখ্যা হ্রাস করে, তাহাতেই অবশ্য উন্নতির ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সহমরণপ্রথা জনসমাজের পক্ষে অহিতকর।

লেখক উপরি উক্ত যুক্তিটির এই বলিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপের পক্ষে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের জীবিত চেষ্টা নাই। তাহারা অন্ন বস্ত্রের জন্য অন্যের উপর

"I believe that if Newton had not lived, the world must have waited for the Newtonian philosophy until there had been another Newton, or his equivalent. No ordinary man, and no succession of ordinary men, could have achieved it. * * * * Philosophy and religion are abundantly amenable to general causes; yet few will doubt, that had there been no Socrates, no Plato, and no Aristotle, there would have been no philosophy for the next two thousand years nor in all probability their; and that if there had been no Christ, and no St. Paul, there would have been no Christianity."

Mill's Logic Vol. II

নির্ভর করে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে জীবিত চেষ্টা অসম্ভব। তবে সধবা স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া জীবিত চেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া দেয়; কিন্তু বিধবাদিগের সে কার্য্যকারিতাও নাই। সুতরাং বিধবার মৃত্যুতে সমাজের কোন অনিষ্ট নাই।

এই উত্তরটিতে ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষে ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবিত চেষ্টা নাই বটে, কিন্তু ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জীবিত চেষ্টা বিলক্ষণ রহিয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, তাহারা নানাপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করে। ভদ্রমহিলার অপেক্ষা ইতরজাতীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক। আবার সতীদাহ-লেখক নিজেই বলিয়াছেন, যে, "সর তামস্ ষ্ট্রেঞ্জ বলেন, আর্য্যাবর্ত্তে না হউক, অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা নীচজাতির মধ্যেই অধিক।" সুতরাং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে জীবিত চেষ্টার যে ক্ষতি হইত তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। ভদ্রজাতীয়া বিধবাদিগের দ্বারা যে জীবিত চেষ্টার কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, ইহাও আমরা মনে করি না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক গৌণরূপে বিলক্ষণ সাহায্য হয়। তাঁহারা অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও না কাহারও অবশ্য গলগ্রহ হইয়া থাকেন; এবং যে ব্যক্তির গলগ্রহ হন, তাহার জীবিত চেষ্টা অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। লেখক বলেন জীবিত চেষ্টার যুক্তি ভারতবর্ষে খাটিল না। আমরা বলি বিলক্ষণ খাটিল।

এখন একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইতেছে। সতীদাহের বিষয় বিচার করিতে হইলে, বোধ হয়, এই কথাটির মীমাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কথাটি এই;—সতীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে স্বামীর চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিত, অথবা তাহাদের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইত। সতীদাহ লেখক বলেন, প্রায় সকল স্থলেই সতীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহমৃতা হইত। আমাদের বিশ্বাস সে প্রকার নহে। আমরা মনে করি যে, অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত;—এমন কি একপ্রকার সজ্ঞানে স্ত্রীহত্যা করা হইত।

যে সময় সতীদাহ প্রচলিত ছিল, সতীদাহ লেখক সে সময়ের লোক নহেন। আমরাও সে সময়ের লোক নহি। সুতরাং আমরা কেহই সতীদাহ স্বচক্ষে দেখি নাই। প্রাচীনদিগের সহিত উক্ত বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে তাহারা সহমৃতা হইবে। কিন্তু সঙ্কল্পের পর আর ফিরিবার যো ছিল না। ফিরিলে পরিবারের দুরপণেয় কলঙ্ক। সুতরাং সঙ্কল্পের পর মতপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে, অথবা মত পরিবর্ত্তন হইলে বিলক্ষণরূপেই তাহার

স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত। সতীদাহলেখক সহমরণের অনুষ্ঠানটি কবিত্বের চক্ষে দেখিয়াছেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত যেমন বর্ণনা করিয়াছেন যে, মেঘনাদপত্নী প্রমীলাসুন্দরী প্রাণপতির চিতারোহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বাধীনভাবে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সতীদাহলেখক হয় ত, কল্পনার চক্ষে দেখেন যে, যত হিন্দুরমণী সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রমীলার ন্যায় হাসিতে হাসিতে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি দান করিতেছেন।

যখন আমরা কেহ সতীদাহ স্বচক্ষে দেখি নাই, তখন সেই সময়ের লোকের সাক্ষ্যগ্রহণ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। লেখক, হেনরি জেফ্রিস্ বুস্বি নামক এক ইউরোপীয়ের কথায় বিশেষ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বিলাত আপিলে যেমন মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, সেইরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একজন ইউরোপীয়ের কথা পাইলে তাহাতে বিলাত আপিলের কাজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, ইহা লইয়া যখন ঘোরতর আন্দোলন চলিতে ছিল, তখন আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বিলাত হইতে মোক্ষমূলরের ব্যবস্থা আনাইয়া ভাবিলেন যে, লড়াই ফতে হইল।

দেখা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত হেনরি জেফ্রিস বুস্বির গ্রন্থ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বুস্বি সাহেব কি স্বচক্ষে সতীদাহ দেখিয়াছিলেন, না, কেবল শোনা কথা লিখিয়াছেন? যদি কেবল শোনা কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা যত কেন সুন্দর হউক না, তাঁহার সাক্ষ্যের কিছুই মূল্য নাই।

বুস্বি সাহেব স্বচক্ষে দেখুন আর নাই দেখুন, এ বিষয়টি নিঃসংশয়ে মীমাংসা করিতে হইলে অন্য মাতব্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক। আমরা ক্রমে ক্রমে যে প্রকার তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিব।

প্রথম ব্যক্তির নাম জে পেগস্ সাহেব। আমরাও বিলাত আপিল করিতে বাধ্য হইলাম। ইনি সতীদাহ নিবারণের পূর্ব্বে, ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ দিবসে "The Suttee's cry to Britain" নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে বলপূর্ব্বক সতীদাহের অনেক অনেক হৃদয়ভেদী বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ যদি কোন প্রকারে উক্ত পুস্তক খানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন, সকলই জানিতে পারিবেন। আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত উহা হইতে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যাহা হউক একটী স্থান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"In the burning of widows as practised at present in some parts of Hindostan, however voluntary

the widow may have been in her determination, force is employed in the act of immolation. After she has circumambuated and ascended the pile, several natives leap on it, and pressing her down on the wood, bind her with two or three ropes to the corpse ef her husband, and instantly throw over the two bodies, thus bound to each other, several large bamboos, which being firmly fixed to the ground on both sides of the pile, prevent the possibility of her extricating herself when the flames reach her. Logs of wood are also thrown on the pile, which is then in flames in an instant."

পেগস্ সাহেব এস্থলে সতীদাহ সম্বন্ধে একটী বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন সতী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নদীর জলে আসিয়া পড়ে। তাহার আত্মীয়েরা পরিবারের ভয়ানক কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য পুনরায় বলপূর্ব্বক চিতার উপর ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করে। সতী আত্মরক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পুলিস আসিয়া তাহাকে সেই হত্যাকারী আত্মীয়গণের হস্ত হইতে উদ্ধার করে। পেগস্ সাহেব ইহার পর বলিতেছেন;—

"The use of force by means of bamboos, is we believe, universal through Bengal; it is intended to prevent the possibility of the widow's escape from the flames, as such an act would be thought to reflect indelible disgrace on the family."

আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষী একজন ইউরোপীয় মহিলা। ইঁহার নাম ফ্যানি পার্কস্ (Fanny Parks) ইঁহার পুস্তকের নাম Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque, during four and twenty years in the east with Revelations of life in the Zeenana. এই পুস্তকখানি ১৮৫৩ সালের কলিকাতা রিভিউয়ে সমালোচিত ও বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে সতীদাহের অত্যাচার সম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনার কথা আছে। একটী ঘটনা এই যে, ১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর কানপুরনিবাসী এক ধনশালী বণিকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সতীদাহ দেখিবার জন্য কানপুরের গঙ্গাতীরে অতিশয় জনতা হইল। সতী উপযুক্তরূপ সজ্জিত হইয়া স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত করিল। সাহস ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া চিতার উপর বসিল। বসিয়া "রামনাম সত্য হায়" "রামনাম সত্য হায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ক্রমে যখন হুতাশন আপনার সহস্রদশন বিস্তার করিয়া দংশন করিতে লাগিলেন, তখন আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদ্যত হইল। যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং খোলা তলবার হস্তে একজন সিপাহিকে চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। সতী যখন চিতাহইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, নিকটস্থ সিপাহি তখন আপনার প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া, চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ব্বার চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সিপাহির প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে সেস্থান হইতে তফাৎ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সতী আবার অল্পক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। মৃতব্যক্তির ভ্রাতারা, আত্মীয় স্বজন, ও অপরাপর সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বলপূর্ব্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা হউক। সেইরূপই অবশ্য করা হইত। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার চিতায় আসিতে সম্মত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাল্কি করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ফ্যানি পার্কস্ কলিকাতার সন্নিহিত স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের তৃতীয় সাক্ষীর পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। পৃথিবীর সকল খণ্ডেই ইনি পরিচিত; এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম সংসারে পরিচিত থাকিবে। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতেছি। রাজা রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উহা নিবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তক এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"নিবর্ত্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য। ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান, সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বচনেতে এবং বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীতমতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওনকালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাক, অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়"।

"অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্তু বালককাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে, এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে, এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"

উপরি উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রথা প্রচলিত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কুসংস্কারের ভীষণ মন্দিরে কেবল বলিদান দেওয়া হইত। আবশ্যক বোধ হইলে আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারিতাম। কিন্তু ইউরোপীয় ও দেশীয়ের প্রকাশিত পুস্তক হইতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, উহাই যথেষ্ট। পুনর্ব্বার বলি সতীদাহ প্রচলিত থাকাতে যে,একপ্রকার সজ্ঞানে নারীহত্যা হইত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মনে কর তুমি আমাকে বলিলে যে, "আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মার।" আমি তোমার কথানুসারে তোমাকে চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলাম। তোমার শরীর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। তখন কষ্ট অসহ্য হওয়াতে তুমি আমাকে বলিলে "না, আমি মরিব না, আমাকে ছাড়িয়া দেও।" আমি যদি তখনও তোমাকে ছাড়িয়া না দি, তোমার উপর কাষ্ঠ চাপাই, ও বাঁশ দিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরি, তাহা হইলে কি তোমাকে হত্যা করা হইবে না? সহমরণে অধিকাংশ স্থলে এই প্রকার হত্যা হইত। সতীর আর্ত্তনাদ যাহাতে শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য অনেক স্থলে ঢাকিদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হইত "কসিয়া ঢাক বাজাও।"

আমাদের সতীদাহ-লেখক মহাত্মা বেণ্টিঙ্ককে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত করিতে চাহেন। করুন; তাহাতে তাঁহার কুরুচি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই ক্ষতি হইবে না।

সতীদাহ-লেখক হর্বর্ট স্পেন্সরের সমস্বাতন্ত্র্য বাদের দোহাই দিয়া সতীদিগের সহমৃতা হইবার অধিকার সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরাও ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতী। কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল আছে। চৌর, দস্যু প্রভৃতি যাহারা জনসমাজের নিকট অপরাধী, তাহাদের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে জনসমাজের অধিকার আছে। যাহারা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া বিচারশক্তি হারাইয়াছে, আত্মীয় স্বজন ও জনসমাজের এ অধিকার আছে যে, তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখেন। সেই প্রকার যে ব্যক্তি শোক

দুঃখে মুহ্যমান হইয়া স্বাভাবিক বিবেচনা-শক্তিবিরহিত হইয়াছে, তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার নিশ্চয়ই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সমাজের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। হিন্দুরমণীর ইহসংসারের সর্ব্বস্বধন স্বামী। যে মুহূর্ত্তে সেই স্বামী-রত্ন সে জন্মের মত হারাইল তখন কি তাহার বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে? যখন গৃহ তাহার নিকট শ্মশান; সংসার, মরুভূমি; দিবালোক, অন্ধকার; জীবন বিড়ম্বনা মাত্র তখন কি তাহার বিবেচনাশক্তি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? কথনই না; এবং সেই অবস্থায় কি তাহার কোন গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, না, তাহাকে কোন গুরুতর কার্য্য করিতে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? এ প্রকার চিত্তবিকলতার সময় গুরুতর কার্য্যানুষ্ঠানের স্বাধীনতা থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকাও বিধেয় নহে।

হিন্দু বিধবার নিজের দুঃখ, তাহার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনের দুঃখ বর্ণনা করিয়া, লেখক বলিয়াছেন, যে, "বিধবার মরাই ভাল।" বর্ণনা যথার্থই হৃদয়ভেদী হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না; পাষাণ বিগলিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং আবার বলিতেছি যে যতই কেন দুঃখ হউক না, দুঃখের জন্য কাহারও আত্মবিনাশের অধিকার নাই। এস্থলে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, দুঃখের জন্য আত্মহত্যার অধিকার থাকিলে তাহার সীমা কোথায় থাকিবে? দুঃখের জন্য মরিবার অধিকার থাকিলে যাহার দুঃখ অসহ্য বোধ হইবে, সেই মরিতে পারিবে। আমি পারিব, তুমি পারিবে, রাম পারিবে, শ্যাম পারিবে, হরি পারিবে, যদু পারিবে, কে পারিবে না? সকলেই পারিবে। এ সংসার ত দুঃখের সংসার। দারিদ্র্য, রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি বিবিধ দুঃখে সংসার পরিপূর্ণ। যদি বিধবাকে মরিতে অধিকার দেও, অন্য সকলকেও দিতে হইবে। ভাল, যেন তাহা দিলে, কিন্তু ঐ নিয়মটি কি বেন্থামের হিতবাদ দর্শনসঙ্গত হইল। যে কার্য্য ও নিয়মের গতি (tendency) সংসারের বিনাশের দিকে তাহা কি কখন হিতবাদদর্শনসঙ্গত হইতে পারে? সহস্র দুঃখযন্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়া জগতের হিতের জন্য জীবনধারণ করাই নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত। কষ্টের জন্য আত্মবিনাশ ত স্বার্থপরের কাজ।

সতীদাহ-লেখক বলেন, যে, সহমরণ সতীত্বের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত; এবং সে দৃষ্টান্তে জনসমাজের প্রভূত উপকার। আমরা বলি যে, শোকাবেগসম্বরণে অক্ষম হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শরীর ভস্মসাৎ করা অপেক্ষা, কি দীর্ঘজীবনের পরোপকার, ইন্দ্রিয় দমন, সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠতর নহে? একদিনের আত্মবিসর্জ্জন অপেক্ষা দৈনিক আত্মবিসর্জ্জন ("Martyrdom of daily life") কি

বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর তাহা সকলেই স্বীকার করিত —এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সম্বরণ করিলে পর, ভ্রমর বলিল, "বাবা,আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না —যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্ম্মভেদী দুঃখে মাধবীনাথের হৃদয় ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— যে, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?" ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয়,কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ, তখন রক্তোৎফুল্ল লোচনে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এখনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন,

"মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে,আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন, ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়, এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে!

মা। সারিবে মা—কি হইয়াছে? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই—কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব— তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, কেমন বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে? দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাহার কোন সম্বাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সম্বাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সম্বাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সম্বাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সম্বাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সম্বাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা, একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটী পোষ্ট আপিস ছিল—মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপর কতকগুলির চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির থাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটা নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর বাবু পান পনের টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে আমি পোষ্টমাষ্টার বাবুর অর্দ্ধেক দরের লোক—আট আনায় ষোল আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে আমি একটা ডিপুটী—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ—উহাতে আমাতে জমীন আশমান ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরিবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন—সেও আট আনার ওজনে উত্তর দিয়া

থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আশীআনার ওজনে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয় এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল, কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয় তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্য বদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ?"

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন "হাঁ—তু—তুমি—আপনি—"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম!"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন "বসুন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন;—পোষ্ট বাবু ত বলিলেন "বসুন" কিন্তু তিনি বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্টমাষ্টার বাবুর আট আনা, হরিদাস পিয়াদা—একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া, মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন।

"কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি এক ছিলিম তামাকু সাজো দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখন তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাইলে কোন না চারি গণ্ডা বক্‌শিষ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকার তল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্টমাষ্টার বাবুকে বলিলেন,

"আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে?"

পোষ্টমাষ্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন হনুমান হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন, যে বাবুটী কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন—

"কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে আপনি চিনেন ?

পোষ্ট। চিনি না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন বাঙ্গাল নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে ?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই ?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছেই আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি, অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন,

"ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোষ্টমাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে২ হাসিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন; "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব—এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোষ্ট বাবু, হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন্ ?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পোষ্ট। আসে।

মা। কত দিন অন্তর ?

পোষ্ট। যে কথাটী বলিয়া দিলাম তাহার টাকা এখনও পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টরকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—"বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখ্ছি—আমায় চেন কি ?"

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোষ্ট আপিষের খবর যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?"

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ?"

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়া ছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। বলিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, কি মিছা বল, তবে, তোমার ঘরে আগুন দিব; তোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে প্রমাণ করাইব যে তুমি নিজে লোক

দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন এখন বলিবে ?”

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিল—বলিল—“আপনি রাগ করেন কেন ? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না—বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।”

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে ?

পোষ্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিষ্টরি করা।

মা। কোন্ আপিস হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে ?

পোষ্ট। মনে নাই।

মাধবী। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রশীদ থাকে না ?

পোষ্ট মাষ্টর রশীদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, “প্রসাদপুর।”

“প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিষ্টি দেখ।”

পোষ্ট মাষ্টর কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, “যশোর।”

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রশীদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টর বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজীর হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে রোহিণী, গোবিন্দলাল একস্থানেই, গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী

কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চযতব করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সবইনস্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কনষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সব ইনস্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন—পত্র প্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কনষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন। মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দি মিন্দি কইও না—যা বলি তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছ তলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয়, আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ আপদ পড়িলে আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল—"বিপদ কি মহাশয়?"

মাধবীনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত বটে।"

ব্র। কি বিপদ্ মহাশয়?

মা। বিপদ সমূহ। পুলিষে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে আপনার কাছে এক খানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি! আমার কাছে চোরা নোট!"

মাধবী। তোমার জ্ঞানতঃ চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে—তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন, আওয়াজ ছোট করিয়া, বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিষেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিষের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ একজন পুলিষের কনষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী কুলধারী গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত, জলধরসন্নিভ কনষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থরহ কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল,

"আপনি রক্ষা করুন!"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্২ নম্বরের নোট পাইয়াছ বল দেখি। পুলিষের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয় তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কত ক্ষণ? এবার কার প্রসাদপুরের পত্র খানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে—কনষ্টেবল যে গাছ তলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত একজন দ্বারবান্ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতে ছিলেন সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কনষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ঊর্দ্ধ শ্বাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল—মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃকবিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীত বাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায়?

মা। জিলা—জশ্—শ্—শর—

নি। জশ্—শরে কেন?

মা। নীলকুঠি কিনব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই একদিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বথ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় একক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক

নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য, ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাঁহার আমীন তাগাদগীর নাএব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকমার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছিলেন। একজন বাঙ্গালি সেই জনশূন্য প্রায় সুবর্ণপুরস্থ নীল অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, পুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলিন রমণীয় চিত্র কিন্তু, সকলগুলি সুরুচি বিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটী তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন, এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে, যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান খ্যান ওস্তাদজির বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সেই তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল, এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনীসন্তাড়িত হইয়া, সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমলকণ্ঠ মিশাইয়া, গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সোনালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানেই যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি, সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথি জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীল কাচ প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজত স্ফটিকাদিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহ শোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণ, আর সেই বৃদ্ধের বিশুদ্ধস্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের

মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল। গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদ গৃহ দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—নিশাকর দাস।

ডাহিরসেনাপতি নাটক।*

নাটকে যে গল্পটি বিবৃত হইয়াছে তাহার চুম্বক এই:—আলোর দেশে ডাহির নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সে বড় বিপদাপন্ন হন। বসোরার অধিপতি খলিফা ওয়ালেদের সৈন্যেরা আসিয়া আলোর আক্রমণ করে, এই বিপদের সময় বৃদ্ধ ডাহির উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রকাশ করেন যে, যে তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে সে ব্যক্তিকে এক রাজকন্যা বিবাহ দিবেন। রাজার দুই কন্যা ছিল, সর্ব্বকনিষ্ঠা স্বরূপা বালিকা, সরলা ও অতি ভীরুস্বভাবা। জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলসুতা, সুন্দরী, যুবতী, নির্লজ্জা, দাম্ভিকস্বভাবা। যে ব্যক্তি যবন হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবে, তাহার সহিত শৈলসুতার বিবাহ হইবে, এই কথা রাষ্ট্র হইলে রাজার প্রধান সেনাপতি শৈলসুতার পাণিগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু প্রথমেই আহত হইয়া মরণাপন্ন অবস্থায় জনৈক যবনসেনাপতির শিবিরে পড়িয়া রহিলেন। বৃদ্ধ রাজা আর উপায় না দেখিয়া, শেষ আপনিই যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধ বড় করিতে হইল না, শীঘ্রই আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার মহিষী যুদ্ধে গেলেন, তিনিও হত হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, যবনেরা রাজপুরী অধিকার করিল। রাজকন্যারা উভয়েই পলাইয়া, এক বনে আশ্রয় লইলেন। তথায় এক ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় শৈলসুতার অন্তরে প্রতিহিংসা অঙ্কুরিত হইল। শেষ ডাকিনীর পরামর্শ অনুসারে রাজকন্যারা পুনরায় পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে ধৃত হইয়া খলিফার প্রতিনিধি মহম্মদ বেনকাসিমের সম্মুখে আনীত হইলেন। বেনকাসিম তাঁহাদের রূপ লাবণ্য দেখিয়া, খলিফার বেগম হইবার যোগ্য বিবেচনায় তাঁহাদিগকে বসোরায় প্রেরণ করিলেন।

* শ্রীঅঘোরনাথ বোর প্রণীত। ৯৭ কলেজ ষ্টীট মজুমদার এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

শৈলসুতাকে পাইয়া খলিফা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া যত্নে অন্তঃপুরে রাখিলেন। প্রথম যে রাত্রে খলিফা শৈলসুতার শয়নগৃহে আসিলেন, সেই রাত্রেই শৈলসুতার কৌশলে খলিফার মানসিক বেগ প্রেমের পথ ত্যাগ করিয়া প্রতিহিংসার দিকে ধাবিত হইল। শৈলসুতার সহচরী খলিফাকে প্রকারান্তরে জানাইলেন যে তাঁহার প্রতিনিধি বেন্‌কাসিম আপন উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে নজর পাঠাইয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র খলিফা রাগান্ধ হইয়া শৈলসুতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেন্‌কাসিমের শিরশ্ছেদ করিতে হুকুম দিলেন। বেন্‌কাসিমের মাথা শীঘ্রই কাটা গেল, শৈলসুতার প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত হইল। তিনি ভগিনী সমভিব্যাহারে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

গল্পটী, সম্যক্‌রূপে না হউক, কতকাংশে নাটকোপযোগী বটে। আমাদের দেশে যাঁহারা উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া নাটক নাম দিয়া পাঠকদিগকে ঠকান এবং নাটক লিখিয়াছি বলিয়া আপনারাও ঠকেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই জানেন না যে সকল গল্পই নাটকোপযোগী নহে। যিনি মনে করেন যে, যে কোন গল্প লইয়া নাটক লেখা যায়, তিনি নাটকের কিছুই বুঝেন না। উপন্যাস আকারে কোন গল্প অতি মনোহর হইয়াছে বলিয়া যে তাহা অবশ্যই নাটকোপযোগী হইবে এমত বিবেচনা করা ভ্রম। আমাদের অধিকাংশ নাটকলেখকদিগের মধ্যে এই সকল ভ্রম অতি বলবৎ থাকায় দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রায়ই নাটক লিখিতে গিয়া "জোর নবন্দি" লিখিয়া ফেলেন। তাঁহাদের লিখিত কথোপকথনকে তাঁহারা নাটক বলুন, কে বারণ করিবে? কিন্তু তাঁহাদের সমবয়স্ক "সমজদার" ভিন্ন আর কেহ উহাকে নাটক বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যদি অন্য কেহ করেন, করুন, তথাপি সে গ্রন্থ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।

ডাহির সেনাপতি নাটক সম্বন্ধে আমরা বলিতেছিলাম যে গল্পটী কতকাংশে নাটকোপযোগী। কিন্তু নাটকোপযোগী বলিয়া গ্রন্থকার যে এই গল্পটি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন, এমত বোধ হয় না; গল্পটি কেন নাটকোপযোগী, ইহার কোন্ অংশ নাটকোপযোগী আর কোন্ অংশ নহে, গ্রন্থকার তাহা বুঝিলে প্রথম তিন অঙ্কের অধিকাংশ তিনি লিখিতেন না। শৈলসুতার সহিত ডাকিনীর সাক্ষাৎ হইতে নাটকের আরম্ভ, তৎপূর্ব্বে যে পঞ্চাশ পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা দশ কি দ্বাদশ পত্রে লিখিত হইলে, নাটকের কোন ক্ষতি হইত না। যে ভাগ নাটকের কোন অংশই নহে বলিলে হয়, গ্রন্থকার সেই ভাগ লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যে ভাগ এই নাটকের মজ্জাস্বরূপ, গ্রন্থকার সে ভাগের প্রতি কোন যত্নই করেন নাই। বোধ

হয় সে ভাগ তিনি বড় চিনিতেও পাবেন নাই।

গল্পটী নাটকোপযোগী বটে, কিন্তু এরূপ গল্প লইয়া নাটক লেখা উচিত কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রতিহিংসা গল্পটির বীজ। এ বীজে বড় সুফল ফলে না, এখানেও ফলে নাই, প্রতিহিংসার ফল এ গল্পে নিবপবাধেব দণ্ড। একদিকে প্রতিহিংসা অপর দিকে নিরপরাধেব দণ্ড ভিন্ন আব কিছুই এ গল্পে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি আর কিছু থাকে তবে বোধ হয় প্রতিহিংসাব পার্শ্বে তাহা লুকাইয়া আছে তাহাতে কাহাবও দৃষ্টি পড়ে না। কেহ কেহ বলিতে পাবেন, শৈলসুতার প্রণয় এই নাটকের এক অংশ। তাহা হইলে, হইতে পাবে। শৈলসুতা ও সেনাপতি উভয়েই দুই একস্থানে "উঃ" "আঃ" কবিযাছেন, তাহা প্রেমেব পীডনে হইতে পাবে, কিন্তু সে প্রেমে কাহাবও দৃষ্টি পড়ে না, আমবাও তাহাতে কিছুই বিশেষ অসাধাবণত্ব দেখিতে পাই নাই।

নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ কবিলে পব তল্লিখিত বিষয় মনে বড় স্থায়ী হয় না। শৈলসুতাব অভাগ্য কি সৌভাগ্য অথবা বেনকাসিমেব দণ্ড এতৎ উভয়ের মধ্যে কিছুই এরূপ অন্তবস্পর্শ কবে না যে থাকিয়া থাকিয়া তাহা মনে পড়িবে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় নিরপরাধের দণ্ড হইলে সকলেই কাতর হয়। সেই প্রক্রিয়া আবার কবির নিকট শুনিলে একেবারে ব্যাকুল হইতে হয় কিন্তু বেন্‌কাসিমেব দণ্ড শুনিয়া ব্যাকুল হওয়া দূরে থাকুক সাধারণ লোকের মুখে শুনিলে যেরূপ 'আহা' বলা যায়, তাহাও বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন, যে আমাদেব কবির সে চেষ্টা কবা উদ্দেশ্য নহে; বেন্‌কাসিমের প্রতি সহৃদয়তা না জন্মে, এই তাঁহাব চেষ্টা ছিল। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, নিবপবাধেব প্রতি সহৃদয়তা জন্মিতে ধাবন, আব প্রতিহিংসাব দলে মিশাইতে অনুবোধ কবা হইয়াছে। কিন্তু সে অনুবোধ শুনিলেও যে শৈলসুতার সহিত কাহাবও সহৃদয়তা জন্মিবে এমত বলা যায় না। শৈলসুতাকে সেনাপতি ভাল বাসিযাছিলেন কিন্তু আমবা ভালবাসিতে পাবিলাম না। এই নাটকে বিশেষ কবিত্ব আছে বলিয়াও বোধ হয় না। ইহাতে এমত কোন কথাই নাই যে মনে রাখিতে ইচ্ছা করে। বোধহয় এরূপ কোন কথা বলিবাব বয়সও গ্রন্থকারের হয় নাই। গ্রন্থকাবের যে বহুদর্শন নাই তাহার অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদর্শন ব্যতীত নাটক লিখিবার অধিকার জন্মে না।

গ্রন্থকার হিন্দু মুসলমান এক করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে মহম্মদ বেন্‌কাসিম বলিতেছেন, "জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া মাত্র।" এই কথাগুলি হিন্দু ভিন্ন পূর্ব্বকালের মুসলমান দ্বারা কথিত হইবার কখন সম্ভাবনা নহে। হিন্দুরা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সর্ব্বদাই

হোম যাগ করিতেন, ঘৃতাহুতিতে অগ্নি কিরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা নিত্যই দেখিতে পাইতেন,কোন বিষয়ের হঠাৎ বৃদ্ধি দেখিলে, তাঁহাদের নিত্য-পরিচিত ঘৃতাহুতি মনে পড়িত। মুসলমানদিগের তাহা মনে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্য আমাদের মধ্যে ঘৃতাহুতির উপমা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, মুসলমানদিগের মধ্যে কখন তাহা হয় নাই।

শৈলসুতার সহিত যখন ডাকিনীর সাক্ষাৎ হইল, ডাকিনী শৈলসুতাকে সয়তানী বলিয়া সম্বোধন করিল। আমরা মনে করিলাম ডাকিনী বুঝি মুসলমান, পরে দেখিলাম, আমাদের ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুডাকিনী কেন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে নাম বাছিয়া শৈলসুতার প্রতি প্রয়োগ করিল, আমরা তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

আটশত বৎসর পূর্ব্বে মহম্মদীয় সৈনিকেরা কিরূপ বীর্য্যবান্ ছিলেন, গ্রন্থকার তাহা কিছুই অবগত নহেন। বেন্‌কাসিম ও রস্তমের কথাবার্ত্তা শুনিলে বোধ হয়, তাঁহারা অতি সামান্য বাঙ্গালি ছিলেন, অথবা বাঙ্গালির আদর্শ হইতে গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। বেন্‌কাসিমের বা রস্তমের মৌখিক দম্ভ ও আস্ফালন দেখিয়া আমাদের বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকেও মনে পড়ে না।

নাটকের মধ্যে বিশেষ অপকৃষ্ট অংশ চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। জয়ার চরিত্র উত্তম হইতেছিল, এই চতুর্থ অঙ্কে তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রস্তম ও বেন্‌কাসিম উভয়েই এ স্থলে বাঙ্গালি হইয়া গিয়াছেন। তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রস্তম তাৎকালিক মহাযোদ্ধাদিগের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কথাবার্ত্তার প্রতি মনোযোগ করা হউক। আর বেন্‌কাসিমের তেজঃপুঞ্জ কিরূপ রক্ষিত হইয়াছে এই উদ্ধৃত অংশে তাহাও দেখা হউক।

"বেনকাসিম। কথা কও,—নহিলে অপমান হবে।

শৈল। আর অপমানের বাঁকি কি? যে যবন, পদতলে থাকিবার যোগ্য, সেই রাজা ডাহিরের সিংহাসনে,—আমরা তাঁহার কন্যা হয়ে সিংহাসন সমীপে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছি—আর অপমানের বাঁকি কি!

বে, কা। এত স্বাধীনভাবে কথা কহিও না। জান, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ?

শৈল। অত্যাচারীর সম্মুখে।

বে, কা। কিসে অত্যাচারী দেখিলে?

শৈ। অন্যায় যুদ্ধে আমার পিতা মাতাকে হত্যা করিয়াছে।

বে, কা। অন্যায় যুদ্ধে। এত বড় স্পর্দ্ধার কথা—অন্যায় যুদ্ধে!!

শৈ। কি ভয় দেখাইতেছ! তাহিরের

কন্যা ভীত হইবার মেয়ে নয়,—আবার বলিতেছি,—অন্যায় যুদ্ধে।

বে, কা। তোমার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

শৈ। মরিব,—পিতৃমাতৃ হন্তার রক্তে স্নান করিয়া মরিব।

রস্ত। লক্ষণ ভাল নয়।*

বে, কা। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার সুকণ্ঠনিঃসৃত বিষপূর্ণ বাক্যাবলি এতক্ষণ সহ্য করিয়াছি,—আর পারি না।

শৈল। আবার ভয় দেখাইতেছ। রাজা ডাহিরের সিংহাসনে দুর্ব্বৃত্ত, পার্শ্বে তাঁহার মন্ত্রী,—দুর্ব্বৃত্তকে দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসা, আমরা তাঁহারই কন্যা বন্দিনী হোয়ে দুর্ব্বৃত্তের সম্মুখে।—ভৈরবি এ বিষদৃষ্টি আর সহ্য হয় না চক্ষু তুলিয়া ফেল, চক্ষে আগুন জ্বালিয়া দাও।

প্র, সে। খোদবন্দ্ এ ভাল লক্ষণ নয়। ক্ষত্রিয় শোণিত সামান্য জ্ঞান করিবেন না।

রস্ত। সত্য। কিন্তু মন্মথের শর ও কোমল অঙ্গে একবার বিদ্ধ হলে, এত তেজ সমুদয় জল হইয়া যাইবে।

জবা। আমার দিদিকে রাগাচ্চ কেন? বাবাকে মেরেছ—মাকে মেরেছ, এর প্রতিফল পাবে না বুঝি?

রস্ত। এটিকে দেখতে ত বালিকা বলে বোধ হয় না, কিন্তু কথা, হাব, ভাব সমুদয় বালিকার ন্যায়।‡

জবা। আমি বুঝি বালিকা,—অবিন্দম বলেছেন আমায় বিয়ে করিবেন।

বে কা। তোমার বিবাহ বসেরায় কালিফের সহিত হইবে।

শৈল। কি দুর্ব্বৃত্ত। জিহ্বা উপাড়িয়া ফেল,—যেন একথা মুখ হইতে আর বাহির না হয়।†

বে, কা। শয়তানি, তোর শমন নিকটবর্ত্তী।

শৈল। শমন নিকটবর্ত্তী না হলে তোমার নিকট আসিব কেন?

বে, কা। আমার নিকট দয়ার আশা কর না?

শৈল। করি না।

বে, কা। মরিতে চাও?

শৈল। মারিয়া মরিতে চাই।

বে, কা। তোমার ভগ্নীকে কে রক্ষা করিবে।

শৈল। আগে ওকে মারিব, প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থ করিব,—তবে আপনি মরিব।

বে, কা। আর এখনি যদি তোমার প্রাণ সংহার করি।

শৈল। তাহার উপায় আছে।

বে, কা। কি!

শৈ। (বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) এই।

বে, কা। উহা দ্বারা কি করিবে?

---

* চাচা,—আপনা বাঁচা। † বটেত, লাগে বাঁকাদ্বি!

শৈল। ইহা দ্বারাই অভীষ্ট সাধন করিব।*

রস্তম। খোদাবন্—ক্ষান্ত দেন। দেখিতেছেন না রমণীর সমুদায় অঙ্গ প্রতিভা বিশিষ্ট। চক্ষু দিয়া যেন ঝলকে ঝলকে অগ্নি নির্গত হইতেছে। আর কিছু বলার আবশ্যক নাই। বসোরায় পাঠাইবার উদ্যোগ করুন।

বে, কা। কেমন বসোরায় যাইতে স্বীকার আছ?

শৈল। না যাই ত কি করিবে?

বে, কা। কি করিব—শয়তানি! তোর সতীত্ব অপহরণ করিব।

শৈল। কি পামর! এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা!! কি আমি কি এখনও দাঁড়াইয়া আছি?† এখনও পৃথিবী দ্বিধা হলে না? এখনও আমার শিরে বজ্রাঘাত হলো না!! সর্ব্বনাশ। এই সর্ব্বনাশের কথা শুনাইতে এখানে আনিয়াছিল,—রাক্ষসি, তোর আরাধনা করে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো! আমার পিতা মাতাকে গ্রাস করেছিস্,—বাকী ছিলাম আমরা,—আমাদের দস্যুহস্তে সমর্পণ করে এই লাঞ্ছনা দিলি,—আর না। আর আমি তোর কথা শুনি না। আয় জয়া—(জয়ার গলদেশে হস্ত দান, দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা উত্থান) আয়,—আয় আগে তোকে বিনাশ করি—

জয়া। ওমা দিদি এমন হলো কেন!

সহ। (হস্ত ধরিয়া) ও কি কর—কি কর।

শৈল। না—আমার প্রতিবন্ধক দিস্ না। আমি এখনই ওর প্রাণসংহার করিব। দুর্ব্বৃত্তকে মারিব, না হয় এই ছোরা আপনার চক্ষে বসাইব।

বে, কা। ধর,—শয়তানীকে ধর,—রস্তম ঐ ছোরাখানা আগে কাড়িয়া লও।

রস্তম। (অগ্রসর হইয়া) না, এ অগ্নিমূর্ত্তির নিকট যাইতে কে সাহস করিবে।"‡

---

* সময়টা আঁবের সময় নয় ত?

† তাই ত। বিছানা করে দিব না কি?

‡ যাত্রার মটক কোথায় লাগে!

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

বৈজিকতত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জনকের ন্যায় পুত্র হয়, জননীর ন্যায় কন্যা হয় একথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। অনেক সময় সন্তানেরা কিয়দংশে পিতার ন্যায় কিয়দংশে মাতার ন্যায় হইয়া থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা এই সর্ব্বসাধারণপরিচিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিব না, বৈজিকতত্ত্বসম্বন্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করি এই আমাদের অভিপ্রায়।

বৈজিকতত্ত্ব প্রথমতঃ যত সামান্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক তত নহে। ইদানীং বিশেষ বিশেষ পাণ্ডিতেরা ইহার নিয়মানুসন্ধানে বহু যত্ন করিয়াছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বাঙ্গালায় গোমেষাদি যত চতুষ্পদ আমরা যত্নে পালন করি তাহাদের এক্ষণে নিতান্ত অবনতি না হউক কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় না। বৈজিকতত্ত্ব অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ কিয়দংশে পরিবর্ত্তন করান যাইতে পারে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে বৈজিকতত্ত্বের অনুশীলন হওয়া অবধি গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সংসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের প্রয়োজনানুরূপ তাহাদের গঠন হইতেছে। মেষসম্বন্ধে লর্ড সমরবিল লিখিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদিগের

কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা নির্দ্দোষ আকৃতি প্রথমে প্রাচীরে অঙ্কিত করিয়া পরে তাহার প্রাণদান করে"। বাস্তবিক বিলাতের মেষব্যবসায়ীরা যে রূপ আকার ইচ্ছা করে সেই রূপ মেষ উৎপাদন করিয়া লইতেছে। কপোত সম্বন্ধে সর জন সিব্রাইট সাহেব বলিতেন যে যেরূপ পক্ষযুক্ত পায়রা চাও তিনি তাহা তিন বৎসরের মধ্যে দিতে পারেন কিন্তু চঞ্চু বা মাথার গঠন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাঁহার ছয় বৎসর লাগে। এই সকল কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বৈজিক কৌশল দ্বারা জীবের গঠন যে কতকটা মনুষ্যের আয়ত্তমধ্যে আসিয়াছে এমত স্বীকার করিতে হয়। বেশবিন্যাসীরা তন্তুবায়কে যে রূপ বস্ত্র "ফরমাইস" দিয়া থাকেন জীবসম্বন্ধে এক্ষণে প্রায় সেই রূপ "ফরমাইস" চলিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হয় না। কি রূপে হইতে পারে তাহা পরে বলা যাইবে। কিন্তু প্রথমতঃ কতকগুলি বৈজিক নিয়ম না জানিলে তাহার উল্লেখ করা বৃথা হইবে বিবেচনা করিয়া আমরা তাহার নিয়মপরম্পরা বিবৃত করিতেছি।

বৈজিকতত্ত্বের প্রথম কথা এই যে সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশানুরূপ হয়, অর্থাৎ জাতি, অন্তর্জাতি এবং গোষ্ঠী, অনুরূপ হয়। সাধারণতঃ জানা আছে যে কখন গোজাতিতে ঘোটক জন্মে না অথবা ঘোটকজাতিতে গো জন্মে না। বিজাতীয় জন্ম যে অসম্ভব তাহা বালকেরাও অবগত আছে। তাহার পর অন্তর্জাতির মধ্যেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ বলবৎ, এক প্রকার মেষের বংশে অন্য প্রকার মেষ জন্মে না; চিতা ব্যাঘ্রের বংশে নাগেশ্বরী ব্যাঘ্র জন্মে না। গোষ্ঠী-সম্বন্ধেও ঐ রূপ নিয়ম. আমাদের দেশী ক্ষুদ্রকায় বেটো ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন ওয়েলার বা আরবা ঘোটক জন্মে না অথবা আরবা ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন আমাদের পক্ষিরাজেরা জন্মগ্রহণ করেন না। আবার অতি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি গোষ্ঠীতে কখন ইংরেজদিগের মত শ্বেতকায় সন্তান জন্মে না অথবা শ্বেতকায় ইংরেজদিগের গোষ্ঠীতে কখন কাফ্রিদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সন্তান জন্মে না। যদি কেহ কোন বংশে ইহার অন্যথা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে সে বংশ অমিশ্রিত নহে, তাহাতে শঙ্কর দোষ এক সময়ে না এক সময়ে ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সন্তানের গঠন

---

* "It would seem as if they had chalked out upon a wall a form perfect in itself, and then had given it existence." *Quoted by Darwin in his Origin of species page 23.*

† "That most skilful breeder Sir John Seabright used to say, with respect to pigeons, that "he would produce any given feather in three years, but it would take him six years to obtain head and beak." *Herbert Spencer, Biology vol ii page 242.*

জনক বা জননীর অনুরূপ হয়। কিন্তু অনেক সময় তাহা একেবারে হয় না এমন কি জনক জননীর অনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক বংশেরও অনুরূপ হয় না। আমরা সে বিষয় স্বতন্ত্র স্থানে বিবৃত করিব। সন্তান যে জনকজননীর অনুরূপ হইতে পারে আপাততঃ সেই বিষয়ের কতকগুলি পরিচয় দুই এক খানি ইংরেজি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পিতা পুত্রের সাদৃশ্য যে কতদূর পর্যান্ত সূক্ষ্ম হয় এবং তাহা যে কেবল বাহিক আকারে নহে, ইহা ঐ সকল পরিচয় দ্বারা অনুভূত হইবে। পরিচয় গুলি ছয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। অস্থিসম্বন্ধে সৌসাদৃশ্যের পরিচয়। জনক বা জননীর যে অংশে অস্থি দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র, লঘু বা গুরু, বিক্ত বা অতিবিক্ত থাকে সন্তানদেহের সেই অংশে অস্থির অবস্থা প্রায় তদ্রূপ হয় (১) অনেকের দেখা যায় অঙ্গুলির পার্শ্ব হইতে অস্থি বৃদ্ধি হইয়া আর একটি অতিরিক্ত অঙ্গুলি জন্মে: তাহাদের সন্তান দিগেরও সেইরূপ অতিরিক্ত অঙ্গুলি দেখা যায়*। (২) অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া পর্ব্ব থাকে, একজনের তাহা না হইয়া দুইটী করিয়া হইয়াছিল, পরে তাহার সন্তান হইলে দেখা গেল তাহাদিগের ও ঐরূপ দুইটি করিয়া পর্ব্ব হইয়াছে। পৌত্রদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।† (৩) যাহারা শ্রমজীবী তাহাদের হস্ত সর্ব্বদা চালনায় পুষ্টিলাভ করে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে শ্রমজীবি বংশোদ্ভব সন্তানদিগের হস্ত প্রায় অপর বালকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়।‡ পদসম্বন্ধে ঐ রূপ।(৪) এক সময় একটা কুক্কুরী ত্রিপদ জন্মিয়াছিল। তাহার শাবক গুলিও তাহার ন্যায় ত্রিপদ হইয়াছিল।§

---

* Dr. Struther quoted by Herbert Spencer

† Mr. Sedgwick quoted by Herbert Spencer, *Biology* ii 243.

‡ Some special modifications of organs caused by special changes in their functions may also be noted. That large hands are inherited by men and women whose ancestors led laborious lives; and that men and women whose descent for many generations has been from those unused to manual labour, commonly have small hands are established opinions. It seems very unlikely that in the absence of any such connection the size of the hand should thus have come to be generally regarded as some index of extraction That there exists a like relation between habitual use of the feet and largeness of the feet, we have strong evidence in the customs of the Chinese. The torturing practice of artificially arresting the growth of the feet, could never have become established among the ladies of China, had they not found abundant proof that a small foot was significant of superior rank—that is, of a luxurious life—that is, of a life without bodily labour.

Herbert Spencer, Biology.

§ Anderson quoted by Darwin.

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে যদি জনকজননীর অনুরূপ সন্তান জন্মে তবে কুক্কুরী আপনার জনকজননীর ন্যায় চতুষ্পদ না হইয়া ত্রিপদ কেন হইল? বর্ত্তমান অবস্থায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। জনক জননীর ন্যায় সন্তান জন্মে এইটি সাধারণ-নিযম সত্য, কিন্তু ইহার অনেক অনিয়ম ঘটে। মধ্যে মধ্যে অসাধারণ ও অদ্ভুত জন্ম হয় তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। লাম্বার্ট নামে এক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে সজারুর ন্যায় এক প্রকার চর্ম্মকীল জন্মিয়াছিল* অথচ তাহার পিতৃপুরুষের কাহারও ঐ রূপ ছিল না। যাহার অঙ্গুলিতে দুইটী করিয়া পর্ব্ব থাকার কথা বলা গিয়াছে তাহার পিতৃপুরুষের অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া পর্ব্ব ছিল, কেন এই ব্যক্তির তদ্বিপরীত দুইটী করিয়া পর্ব্ব হইল তাহা বলা যায় না। কিন্তু যে কারণেই এই রূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকুক ইহা একবার উপস্থিত হইলে পূর্ব্বকথিত নিয়মাধীন হইয়া কিয়দ্দিনের নিমিত্ত বা চিরকালের নিমিত্ত বংশপরম্পরায় চলিয়া আইসে। লাম্বার্ট সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে যে রূপ চর্ম্মকীল জন্মিয়াছিল তাহার পুত্র পৌত্রেরও সেই রূপ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ। কেশসম্বন্ধে সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্য। ইহুদিদিগের ভ্রূযুগ চির-বিখ্যাত; আকর্ণ পর্য্যন্ত না হউক ভ্রূ সুদীর্ঘ এবং পরিষ্কৃত যেন চিত্রকর দ্বারা সাবধানে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের বংশপরম্পরা এই রূপ ভ্রূ চলিয়া আসিতেছে; (১) কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় কোন এক জন প্রধান ইংরেজের ঐ রূপ ভ্রূ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ইংরেজটি ইহুদিকুলোদ্ভব, কয়েক পুরুষ হইল ইংরেজদিগের দেশে বাস করিয়া ইংরেজ হইয়াছেন। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার পুরুষানুক্রমে আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে কিন্তু তথাপি ইহুদির ভ্রূ তাঁহার বংশ হইতে এপর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। (২) কোন কোন ব্যক্তির ভ্রূমধ্যে দুই তিন গাছি করিয়া চুল কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের সন্তানদিগের মধ্যেও এই সামান্য ন্যূনাধিক্যটি দেখা যায়।† (৩) কোন কোন ব্যক্তির মস্তকে একটি করিয়া শ্বেত বা তাম্রবর্ণ কেশগুচ্ছ থাকে। তাহাদের সন্তানদিগের মস্তকে কোন ভাগে না কোন ভাগে ঐ রূপ স্বতন্ত্র বর্ণের কেশগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়।‡

তৃতীয়তঃ। জনক বা জননীর ন্যায় সন্তানের বলমাংস শিরা ইত্যাদি হইয়া

* Darwin on *Variation of Animals &c.*

† Darwin on the *Variation of Animals &c* vol. i chap xii page 452.

‡ Darwin on the *Variation of Animals &c* vol. i chap. xii page 449, and also Herbert Spencer on the *Principles of Biology.*

থাকে। (১) অনেক সময় দেখা যায় পিতা পুত্রের একই প্রকার হস্তাক্ষর, এমন কি শুনা যায় যে সন্তান জনকের হস্তাক্ষর কখন দেখেনাই তথাপি পিতার ন্যায় তাহার হস্তাক্ষর হইয়াছে; যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে ইহার একমাত্র কারণ অনুভব হইতে পারে: জনকের যে রূপ সূক্ষ্ম শিরা ও বলমাংস দ্বারা অঙ্গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল পুত্রেরও অবিকল সেই রূপ শিরা ও বলমাংসে অঙ্গুলি গঠিত হইয়াছে। জনকের ন্যায় সন্তানের যে হস্তাক্ষর হইয়া থাকে ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় কিন্তু জনকের হস্তাক্ষর না দেখিলেও সন্তান যে জনকের মত লিখিতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ আছে। মহাপণ্ডিত ডারউইন সাহেব হস্তলিপি সম্বন্ধে বলিয়াছেন* যে এবিষয়ে আরও বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। (২) অনেকের চলন ও ভঙ্গী জনকের ন্যায় অবিকল হইয়া থাকে। যে স্থলে এ প্রকার দেখা যায় সে স্থলে বুঝিতে হইবে শরীর-পরিচালক বলমাংস পিতাপুত্রের একই রূপ। (৩) কণ্ঠস্বর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। কণ্ঠরন্ধ্র যে রূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় তদনুরূপ স্বর বিনির্গত হইয়া থাকে। পিতাপুত্রের একরূপ স্বর শুনিলে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কণ্ঠের গঠন একই প্রকার। হস্তলিপি চলন ভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিবিশেষের উদাহরণ দেওয়া গেল না। এ সকল বিষয়ে সাদৃশ্য এত সচরাচর দেখা যায় যে উদাহরণের প্রয়োজন বোধ হয় না। সে যাহা হউক, সন্তানের বাহ্যিক আকৃতি জনকের ন্যায় হয় এই কথাই লোকের অনুভব আছে কিন্তু যাহা বলা গেল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে সন্তানের আভ্যন্তরিক গঠনও জনকের ন্যায় হইয়া থাকে।

চতুর্থ। এক্ষণে অভ্যাস, শিক্ষা, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। (১) একব্যক্তি অভ্যাসবশতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ বিন্যাস করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিত; তাহার কন্যাটি অতি শৈশব অবস্থায় পিতৃ অভ্যাসটি পাইয়াছিল। যখন জ্ঞান মাত্রই জন্মে নাই তখন কন্যাটি পিতার

---

* On what a curious combination of corporeal structure mental character and traning, hand-writing depends! yet every one must have noted the occasional close similarity of the hand-writing in father and son, although the father hand not taught his son. A great collector of autographs assured me that in his collection there were several signatures of father and son hardly distinguishable except by their dates. Hofacker, in Germany remarks on the inheritance of handwriting; and it has even been asserted that English boys when taught to write in France naturally cling to their English manner of writing; but for so extraordinary a statement more evidence is requisite. *Drawin on the Variation of Animals &c. vol. i 449.*

ন্যায় বাম উরুর উপর দক্ষিণ উরু স্থাপন করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিত*। (২) কুক্কুরকে নানা কৌশল শিখান হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একবার একটি কুক্কুরীকে ভিক্ষা করিতে শিখান হইয়াছিল। যখনই তাহার কিছু লইবার ইচ্ছা হইত, শিক্ষিত মত ভিক্ষা না করিলে তাহা পাইত না। কুক্কুরীর কয়েকটি শাবক জন্মে, তন্মধ্যে একটিকে দেড় মাস বয়সের সময় তাহার গর্ব্ভধারিণীর নিকট হইতে লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হয়। পরে শাবকটি সাতমাস কি আট মাস বয়সের সময় তাহার গর্ব্ভ ধারিণীর ন্যায় ভিক্ষা আরম্ভ করিল†। কেহ তাহাকে ভিক্ষা করিতে শিখায় নাই, কাহাকেও সে ভিক্ষা করিতে দেখে নাই অথচ শাবকটি ভিক্ষা শিখিয়াছিল। শাবকের এই জ্ঞানটি মাতৃশিক্ষাজনিত এবং মাতৃবীজ হইতে প্রাপ্ত। এই যে দুইটি পরিচয় দেওয়া গেল ইহা দ্বারা আমাদের একটি প্রাচীন প্রথার হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদিগের এই প্রথা ছিল যে, কোন উপজীবিকা অবলম্বন করিতে হইলে যুবারা পৈতৃক উপজীবিকা অবলম্বন করিত, পৈতৃক ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় গ্রহণ করিত না, সমাজও তাহা গ্রহণ করিতে দিত না। কেন না পিতৃব্যবসায় অতি সহজে শিক্ষা হয়। সমাজ দুই কারণে এই নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিল, প্রথম বৈজিক কারণ দ্বিতীয় সংসর্গ কারণ। বালকের জ্ঞানোদয় হইলে প্রথমেই পিতার ব্যবসায় দেখিতে পায়, দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিতে থাকে, পিতৃব্যবসায় লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, সে ক্রীড়া এক প্রকার শিক্ষা। বালক পিতৃব্যবসায় অনুকরণ করিবে, তাহা অভ্যাস করিবে এই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। পাল্কীবাহকদিগের সন্তানেরা একত্র হইয়া লগুড় স্কন্ধে করিয়া পিতৃব্যবসায় অনুকরণ করিয়া থাকে। বণিকের সন্তানেরা যে বয়সে তুল ধরিয়া ধূলা ওজন করিতে করিতে বলে "এই পাঁচ সের, এই সাত সের তিন ছটাক," তন্তুবায় কি অন্য ব্যবসায়ীদিগের সন্তানেরা সে বয়সে ওজন কাহারে বলে তাহা জানেও না। তন্তুবায়ের সন্তানেরা হয়ত সে বয়সে

---

* Several instances could be given of the inheritance of peculiar manners; as in the case, often quoted, of the father who generally slept on his back with his right leg crossed over the left, and whose daughter, whilst an infant in the cradle followed exactly the same habit though an attempt was made to cure her. *Darwin's Variation of animals vol. i 450.*

† Mr. Lewes "had a puppy taken from its mother at six weeks old, who, although never taught 'to beg' (an accomplishment his mother had been taught), spontaneously took to begging every thing he wanted when about seven or eight months old: he would beg for food, beg to be let out of the room, and one day was found at a rabbit hatch begging for rabbits." *Herbert Spencer on the Principles of Biology.*

নাটাই ঘুবায় অথবা ফেলিয়া তুলিয়া মাকু চালানর অনুকরণ করে। চিকিৎসকের সন্তানেরা দেখা যায় পাঠারম্ভের পূর্ব্বে বিনাচেষ্টায় যাহা শিখে অন্য ব্যবসায়ীর সন্তানেরা বহুশ্রম ও সময়ব্যয় না করিলে তাহা শিখিতে পারে না। অনেক দিন হইল একবার আমরা কোন চিকিৎসকের গৃহে উপস্থিত ছিলাম, তথায় একটি অপরিচিত দ্রব্য দেখিয়া উহার নাম চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে একটি বালক উত্তর করিল 'জটামাংসী' আমরা আর একটী দ্রব্য দেখাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করায় আবার বালকটী উত্তর করিল "কর্কল, এ তুমি জান না।" বালকটির বয়স তৎকালে চারিবৎসরের অধিক ছিল না এই অল্পবয়সে দ্রব্যনাম শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছিলাম, তাহাতে চিকিৎসক বলিলেন 'আমাদের সন্তানেরা অল্প বয়সেই এ সকল শিখিয়া থাকে, সর্ব্বদাই দেখে শুনে কাজেই না শিখাইলেও শিখে।' একথা সত্য, কিন্তু এক চিকিৎসকের পক্ষে নহে, সকল ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সমভাবে খাটে। পিতৃব্যবসায় অনায়াসে শিখিতে পাওয়া যায় এবং অনায়াসে শিখিতে পারা যায়। বলা হইয়াছে জ্ঞানারম্ভ হইতেই পিতৃব্যবসায়ে দৃষ্টি পড়ে, তাহা না শিখাইলেও শিখা যায়, আবার বৈজিক কারণ তাহাতে সহায়তা করে; এই দুই কারণে পিতৃব্যবসায় রীতি সহজে শিক্ষা হয়। সন্তান বুদ্ধিমান্ না হইলেও পিতৃব্যবসায় শিখিতে তাহার বড় কঠিন বোধ হয় না। সন্তান বুদ্ধিমান্ হইলে ত কথাই নাই। সে সন্তান পিতৃব্যবসায়ের উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বকালে আমাদের শিল্পীরা যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এই নিয়মাবলম্বন তাহার প্রধান কারণ। তাৎকালিক সমাজের ধারণা ছিল যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেশের ব্যবসায় ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিবে, কেহ অপর ব্যবসায়ে অপটু হইলেও আপন পিতৃব্যবসায়ে নিশ্চয় পটুতা লাভ করিবে, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে কি পটু কি অপটু সকলেই প্রয়োজনমত ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। বোধ হয় এই পদ্ধতির অনুরোধে জাতিবন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালে মুচির সন্তান কখন বস্ত্রবয়ন শিখিতে পাইত না। এই নিয়মের মন্দ ফল অবশ্য অনেক ছিল; মুচির সন্তান প্রতিভাশালী হইলেও তাহাকে জুতাগঠনে নিযুক্ত থাকিতে হইত; সে ব্যক্তি বিদ্যানুশীলনে বা অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে পাইলে যে উপকার করিতে পারিত, সমাজ তাহাতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু এ কথার বিপক্ষে উত্তর করা যাইতে পারে যে, সন্তানের বুদ্ধি ও প্রকৃতি বৈজিক নিয়মানুসারে জনক জননীর ন্যায় হইয়া থাকে, অতএব মুচির সন্তান প্রতিভাশালী হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। বিদেশী চর্ম্মকারের সন্তা-

নকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে শুনা গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় যেরূপ সমাজ ছিল, এবং অদ্যাপি যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে সুচির বংশে প্রতিভাশালী সন্তান বড় দেখা যায় না। যেস্থানে দেখা যাইতেছে সন্তানের শারীরিক গঠন অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশে জনকের ন্যায় হয়, সেস্থলে পৈতৃক প্রকৃতি বা পৈতৃকপটুতা সম্বন্ধে যে কোন সাদৃশ্য জন্মিবে না এমত সম্ভব নহে। বরং তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। হারবার্ট স্পেন্সর সাহেব* বিলাতের কতকগুলি বিখ্যাতনামা সংগীতবিৎদিগের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকের জনক সংগীতব্যবসায়ী ছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বৈজিক নিয়মানুসারে তাঁহারা পিতৃবিদ্যায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সংগীতবিদ্যায় এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে তানবাজ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য একজন প্রধান বলিয়া গণ্য, তাঁহার পিতা সেতারবাদ্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ গোস্বামী দেশীয়সংগীতবিদ্যার অধ্যাপক, তাঁহার পিতা ঐ বিদ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল 'খেয়ালি ও ধ্রুপদী" আমাদের দেশে আইসেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তানসন বা অন্য কোন না কোন "ওস্তাদ ঘরনা" বলিয়া পরিচয় দেন। বাস্তবিক তাহা সত্য হউক বা না হউক, তাঁহাদের পরিচয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'ওস্তাদের' বংশে "ভাল ওস্তাদ" জন্মে এ কথা

* Some of the best illustrations of funtional heredity, are furnished by the mental characteristics of human races. Certain powers which mankind have gained in the course of civilization, cannot, I think, be accounted for, without admitting the inheritance of acquired modifications. The musical faculty is one of these, * * Grant that among a people endowed with musical faculty to a certain degree, spontaneous variation will occasionally produce men possessing it in a higher degree ; it cannot be granted that spontaneous variation accounts for the frequent production, by such highly endowed men, of men still more highly endowed. On the average, the offspring of marriage with others not similarly endowed, will be less distinguished rather than more distinguished. The most that can be expected is, that this unusual amount of faculty shall reappear in the next generation undiminished. How then shall we explain cases like those of Bach, Mozart and Beethoven who were all sons of men having unusual musical powers, but who greatly excelled their fathers in their musical powers? what shall we say to the facts, that Hayan was the son of the organist, that Hummel was born to a music master, and that Weber's father was a distinguished violinist? The occurrence of so many cases in one nation, within a short period of time, cannot rationally be ascribed to the coincidence of spontaneons variations—*Herbert Spencer on Biology.*

কি বাঙ্গালা, কি হিন্দুস্থান সর্ব্বত্র চলিত আছে। কেবল সংগীতব্যবসায়ী কেন? যে ব্যবসায়ী হউক আপন ব্যবসায়ে পারদর্শী হইলে, সে পারদর্শিতার অংশ তাহার সন্তানেও লক্ষিত হয়। অল্প আয়াসে পিতৃবিদ্যা অধিক শিখিতে পারে, লোকে বলে বালকের তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ছিল, এক্ষণে বুঝা যাইতেছে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নহে, পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত। সকল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এই নিয়ম সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান মহারাজার সভাসৎ কবিরাজ ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ বাতব্যাধি চিকিৎসায় এদেশের মধ্যে প্রায় অদ্বিতীয়। তাঁহার পিতা আশ্চর্য্য চিকিৎসক ছিলেন, শুনা যায়, তাঁহার পিতামহ বাতব্যাধি চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসক, তাঁহার পিতা ঢাকা অঞ্চলে চিকিৎসাব্যবসায়ে বিশেষ যশস্বী ছিলেন। এই রূপে দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সন্তান। ইহার বৈজিক কারণ মানিতে হইবে। যাঁহারা সে নিয়মানভিজ্ঞ তাঁহারা হয় ত বলিতে পারেন, সুচিকিৎসকের পুত্র যে সুচিকিৎসক হয়, তাহা কেবল শিক্ষাগুণে, বীজগুণে নহে। এই কথার উত্তরে আমরা উল্লিখিত পরিচয় স্মরণ করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করি, কুকুরীশাবক যে ভিক্ষা করিত, তাহা কি শিক্ষা কৌশলে? তাহাকে ত কেহ ভিক্ষা শিখায় নাই। দুগ্ধপোষ্য শিশু উরুর উপর উরু রাখিয়া পিতার ন্যায় যে শয়ন করিয়া থাকিত, তাহা কি শিক্ষাজনিত? শিশুটির ত তখন শিক্ষার উপযোগী কোন জ্ঞান জন্মে নাই। "বুনিয়াদী" চিকিৎসক বা সংগীতবিৎদিগের নৈপুণ্য কতটা শিক্ষাজনিত আর কতটা বা পিতৃবীজগুণে তাহা পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায় না বলিয়াই যে বৈজিক গুণ অস্বীকার করিতে হইবে এমত নহে। যাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন, তাহাদের বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া লোকে কতপ্রকার বাণিজ্য করিয়া ধনবান্ হইয়েছে। এই সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্‌সার বলেন, যে, "Excluding those inductions that have been so fully verified as to rank with exact science, there are no inductions so trustworthy as those which have undergone the mercantile test. When we have thousands of men whose profit or loss depends on the truth of the inferences they draw from simple and perpetually repeated observations; and when we find that the inferences arrived at, and handed down from generation to generation of those deeply interested observers, has become

an unshakable conviction; we may accept it without hesitation. In breeders of animals we have such a class, led by such experiences, and entertaining such a conviction, the conviction that minor peculiarities of organization are inherited as well as major peculiarities. Hence the immense prices given for sucessful racers, bulls of superior forms, sheep that have certain desired peculiarities. Hence the careful record of pedigrees of high-bred horses and sporting dogs. Hence the care taken to avoid intermixture with inferior stocks."

যাহারা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া লইয়া বাণিজ্য করে, তাহারা কেবল এই নিয়মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সহস্র সহস্র টাকা নিত্য ব্যয় করিতেছে। ব্যবসায়ীরা সকলেই ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করে না, অনেকে ঘোটককে অতি শৈশব অবস্থায় ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করে। কেবল ক্রয়ের সময় বিশেষ করিয়া এইমাত্র অনুসন্ধান করে যে, শাবকের জনকজননীর মধ্যে কে কয়বার জয়ী হইয়াছিল, যদি সে পরিচয় বাঞ্ছানুরূপ হয়, তাহাহইলে ব্যবসায়ীরা আর কোন সন্দেহ করে না, ঘোড়া নিশ্চয়ই ভাল হইবে বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চমূল্য দিয়া ক্রয় করে। যাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে তাহারাও ঐ নিয়ম অবলম্বন করিয়া জয়ী ঘোটকের দ্বারা শাবক উৎপাদন করাইয়া বিক্রয় করে। নিত্য এইরূপ ক্রয় বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ আবশ্যক। মৃগয়াকৌশলী কুক্কুরের শাবক বিলাতে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ জানা আছে, অপর শাবক অপেক্ষা মৃগয়াকৌশলীর শাবক অতি সহজে শিখে, ও না শিখাইলেও কখন কখন কৌশলে নিপুণ দেখা যায়। যদি এই সকল বিশ্বাসের কারণ না থাকিত, তাহাহইলে এরূপ বাণিজ্য চলিত না, ব্যবসায়ীরা সতর্ক হইত। পিতৃপ্রকৃতি, পিতৃবুদ্ধি প্রভৃতি বৈজিক নিয়মানুসারে যে সন্তানে যায় ইহার প্রমাণ নিত্য পাওয়া যায়, তবে যে মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহার অন্যান্য অনেক কারণ থাকে। জনকজননীর মধ্যে পরস্পরের বৈপরীত্য অনেক স্থলে সেই ব্যতিক্রমের কারণ, অসাধারণ বুদ্ধিমানের সন্তান অতি নির্ব্বোধ দেখা যায়, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে হয় ত প্রকাশ পায় যে, সন্তানের জননী অতি নির্ব্বোধ। এস্থলে জননীর বৈজিক দোষে জনকের বৈজিক গুণ খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

পঞ্চম। বলা হইয়াছে সন্তানের জ্ঞা-

কৃতি প্রকৃতি জনকের ন্যায় হয়, আবার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বিঘ্ন না থাকিলে, সন্তানের আয়ু ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকজননীর ন্যায় হইয়া থাকে। বিলাতে এই কথা সপ্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এই কথায় বড় অবিশ্বাস নাই। উপস্থিত প্রস্তাব-লেখকের বংশে এই নিয়মটীর যথেষ্ট প্রমাণ আছে, লেখকের পিতা পঁচাশী বৎসর বয়স্ অতিক্রম করিয়াছেন, পিতা-মহের বয়স্ তিরাশী বৎসব হইয়াছিল, প্রপিতামহের বয়স্ কত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয় হওয়া এক্ষণে অতি কঠিন কিন্তু বৃদ্ধলোকেবা বলিয়া থাকেন, যে, তিনি পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া-ছিলেন। আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পঞ্চ সঙ্গীর বংশ-পরিচয় ঘটকেরা পুরুষানুক্রমে লিখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রতি কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পাবে বলা যায় না। যদি তাহা গ্রাহ্য কবা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সেই পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে কাহার বংশ ২৮ পুরুষ, কাহাব বংশ ৩৭ পুরুষ হইয়াছে। সমকালীন ব্যক্তি দিগের বংশসম্বন্ধে এরূপ ন্যূনাতিরেক দেখিলে প্রতীতি হয় যে কোন কোন বংশের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। দক্ষের বংশ ২৮ পুরুষ হইয়াছে। শ্রী-হর্ষের বংশ ৩৭ পুরুষ হইয়াছে। দক্ষের সন্তানেরা দীর্ঘজীবী। উপস্থিত প্র-স্তাব-লেখক হর্ষের বংশোদ্ভব। অতএব পূর্ব্বে যে নিজপরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন নহে।

ষষ্ঠ। জনকজননীর পীড়া সন্তানে যায়। শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, মৃগীরোগ, উন্মাদ বোগ সম্বন্ধে এই নিয়ম যে অনন্যজননীয় তাহা অনেকেই জানেন, তাহার বাহুল্য পরিচয় অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, জানিয়া শুনিয়াও অনেকে বিবাহের সময় এই নিয়মটি একবারে ভুলিয়া যান। যাঁহার বংশে এই সকল বোগ কস্মিনকালে হয় নাই, তিনি অনেক সময় অপর বোগী বংশের বীজ আনিয়া আপনার নিবোগী বংশে রোপণ করেন। যিনি পৈতৃক সম্পত্তি অখণ্ড রাখিতে পারাকে পুরুষার্থ বলেন, তিনি হয় ত পিতৃদত্ত পবিত্র রক্তকে কলুষিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। এক্ষণে সে সকল কথা থাকুক। পীড়া সম্বন্ধেব নিয়ম বলা যাইতেছিল। প্রায় চিরস্থায়ী রোগমাত্রই বীজানুগামী। জনকজননীর হইলে সন্তান সন্ততির হইয়া থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের বোগ, চক্ষেব বোগ, পাকস্থলীর রোগ, বায়ুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সন্তা-নের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চক্ষের রোগ বিশেষরূপে বীজানুবর্ত্তী। চক্ষেব যে প্রকার পীড়া হউক সন্তানের প্রায়ই তাহা জন্মে। দূরদৃষ্টি, নিকটদৃষ্টি, বক্র-দৃষ্টি এ সকল পুত্রে যায়। রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ, বর্ণান্ধ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ইহার

মধ্যে বর্ণান্ধতা পুত্রে যায় না প্রায় দৌহিত্রে যায়। যে প্রকার পীড়াগ্রস্তকে লোকে সচরাচর 'সূর্য্যকানা' বলে তাহাও সন্তানে যায়। নিকটদৃষ্টি অনেক প্রকার আছে; আমরা একজনের তাহার অতি প্রবল অবস্থা দেখিয়াছি, তিনি সম্মুখস্থ কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে তাহা চক্ষের নিকট লইয়া চক্ষু অতি সঙ্কুচিত না করিলে দেখিতে পান না। এক দিন বালিকা কালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত একটী দ্রব্য আপন চক্ষের নিকট ধরিয়া নানা ভঙ্গী করিতেছিল। অন্ধের মাতা এই উপহাস দেখিতে পাইয়া রাগতভাবে পুত্রবধূকে অভিসম্পাত করিলেন যে 'তুই যেমন আমার সন্তানকে উপহাস করিতেছিস, আমি বলিতেছি তোর সন্তানেরাও ঐ রূপ অন্ধ হইবে।' পুত্রবধূর ক্রমে দুই তিন সন্তান হইল, আমরা সন্তান গুলি দেখিযাছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় অন্ধ হইযাছে। প্রতিবেশীরা বলেন যে ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য্য ফলিয়াছে। কিন্তু যিনি বৈজিক নিয়ম জানেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাতের বড় আবশ্যকতা ছিল না। যাহারা জন্মান্ধ নহে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ যাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থায় চক্ষুর কোন দোষ ছিল না পরে কোন রূপ আঘাত লাগিয়া বা বিষাক্ত দ্রব্যাদি সংস্পর্শে বা অন্য কোন কারণে চক্ষু গিয়াছে তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় না। কেবল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন, শারীরিক যে কোন পীড়া বা পরিবর্ত্তন আপন হইতে হয় নাই, বাহ্যিক কোন কারণ বশতঃ হইযাছে, সে পীড়া বা পরিবর্ত্তন সন্তানে প্রায় যায় না। খঞ্জের সন্তান খঞ্জ হয় না। যাহার অস্থি আঘাতে বা পতনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার সন্তানেরা ভগ্নাস্থি হয় না। তথাপি কেহ কেহ বলেন যে সময়ে সময়ে এরূপও জন্মে। একজনের একটি অঙ্গুলি অস্ত্রাঘাতে সম্পূর্ণরূপে না কাটিয়া কতকাংশে কাটে, অঙ্গুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন হয় নাই কিন্তু বাঁকিয়া যায়। তাহার পর ঐ ব্যক্তির কয়েকটী সন্তান জন্মে। সন্তান গুলির সকলেরই সেই অঙ্গুলি বক্র হইয়াছিল। প্রোফেসর রোলেনষ্টান বলেন যে একজনের জানু কাটিয়া গিযাছিল তাহার সন্তানের জানুতে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। তিনি আর একজনের কথা বলেন যে তাহার চিবুকে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল সন্তানের চিবুকেও ঐরূপ ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। বসন্তরোগের ক্ষতচিহ্ন কখন সন্তানে যায় না। আমাদের দেশে পুরুষানুক্রমে স্ত্রীলোকদিগের নাসা ও কর্ণ বিদ্ধ করা রীতি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কখন তাহার চিহ্ন সন্তানে দেখা যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, যে শারীরিক পরিবর্ত্তন আপনা হইতে না জন্মে অথবা যে পরিবর্ত্তন শরীরের আভ্যন্তরিক নিয়ম সংস্পর্শ না করে সে

পরিবর্ত্তন সন্তানে যায় না। তদ্ভিন্ন সকল পরিবর্ত্তন, সকল পীড়া, সকল দোষ, সকল গুণ বীজাবলম্বন করিয়া সন্তানে যাইতে পারে। এমন কি দেখা যায় প্রসবিত্রীর প্রসবকষ্টটী পর্য্যন্ত কন্যাতে যায়, সেই কন্যা গর্ভবতী হইলে প্রসবের সময় কষ্ট পায়। অনেক প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ জন্মে না, শুনা যায় তাহার কন্যারও স্তনে দুগ্ধ হয় না। অনেক গর্ভধারিণী মৃতবৎসা, যদি তাঁহা-দের দুই একটি কন্যা রক্ষা পায় সে কন্যাও মৃত বৎস প্রসব করে। আবার অনেক স্ত্রীলোক অনপত্যা বা বাঁজা আছে যদি কখন তাঁহাদের গর্ভে কন্যা জন্মে সে কন্যাও মাতৃবৎ বাঁজা হয়। আমরা দেখিয়াছি একজন ধন-বান্ ব্যক্তি পুত্রকামনায় দ্বিতীয় সংসার করিয়া ছিলেন, কিন্তু বিবাহের সময় জানিতেন না যে তিনি স্বল্পপুত্রীর কন্যা বিবাহ করিলেন। সন্তান হইল না, অনেক দেবার্চ্চনা করিলেন, দেবতারা এ সকল বিষয়ে "নিমখহারাম"। তাঁহারা মনোযোগ করিলেন না দেখিয়া হতাশ হইয়া অদৃষ্টকে দোষের ভাগী করিলেন। দোষ অদৃষ্টের নহে দোষ ঘটকের। আমাদের ঘটকেরা অনর্থের মূল; তাঁহারা বৃথা কুলমর্য্যাদা অনুসন্ধান না করিয়া যদি অন্য কার্য্য করেন তাহা হইলে ভাল হয়। আমরাও যদি তাঁহাদের প্রতি নির্ভর না করিয়া আপনাদের সন্তানের নিমিত্ত বল্লালি কুল না খুঁজিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন পবিত্রবংশ অনুসন্ধান করি তাহা হইলে আপনাদেরই মঙ্গলসাধন হয়। ক্রমশঃ

শৈশবসহচরী।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণপুর।

হরিনাথ বাবু অনেক দিনের পর স-পরিবারে সুবর্ণপুর আসিলেন। আসিয়া বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য যত্নবান্ হইলেন। সমাজের ভদ্রলোকদিগের কাহাকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা, কাহাকে বা ধনদ্বারা, এবং কোনং ব্যক্তিকে বা কোন উপকারের দ্বারা হস্তগত করি-লেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবা-হের দিনস্থির হইল। সুবর্ণপুর সেইরূপ আছে,—সেইরূপ চাঁদের আলো, সেই রূপ শ্যামল বর্ণ নিবিড় পল্লবাচ্ছাদিত ঘন বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, পাপিয়ার আকাশভেদী চীৎকার, ক্রীড়া-শীল বালকদিগের আনন্দসূচকধ্বনি, যুবতীদিগের মৃদু মধুর হাস্য, সকলই সেই-রূপ আছে, কেবল কুমুদিনীর আর সে মন নাই—সুবর্ণপুর তাঁহার অগ্নি-কুণ্ডবৎ বোধ হইতে লাগিল। গ্রীষ্ম

গেল, বর্ষা আসিল; বর্ষা গেল, শরৎ আসিল; ক্রমে হেমন্ত আসিল; কুমুদিনী পদ্মপুষ্পের সহিত শুকাইতে লাগিলেন। সঙ্গে২ একটী অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম শুকাইতে ছিল; কি কারণে জানি না, সরলা বিনোদিনী দিন দিন ম্লান হইতে ছিল। শরৎকুমারও সুবর্ণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রতিকান্তকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তি দখল-করিলেন। জনরব যে হরিনাথ বাবু দরিদ্র-হস্তে কুমুদিনীকে সমর্পিত করিতে অসম্মত হওয়াতে শরৎকুমার তাঁহার পূর্ব্বকৃত দানপত্র অবর্ত্তমানে, তাঁহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। শরৎকুমার তাঁহার গৃহ সকল প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু কি কারণে কেহ জানিল না তাঁহার গঙ্গাতীরের রমণীয় বৃক্ষবাটিকাটি বিক্রয় করিলেন। কাহাকে বিক্রয় করিলেন তাহাও কেহ জানিতে পারিল না, কেহ কেহ বলিল যে সেই বাটীতে ভূতযোনি বিরাজ করে সেইজন্য বিক্রয় করিয়াছেন, এবং কোন ২ কল্পনা-শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্র করিল, যে এক এক দিন গভীর রাত্রে ঐ বৃক্ষবাটিকার পার্শ্বস্থ বড়২ দেবদারু বৃক্ষের তলায় অতি দীর্ঘাকার এক মনুষ্যমূর্ত্তি বেড়াইতে দেখিয়াছে। কুমুদিনীর প্রিয় পরিচারিকা শ্যামা জানিত যে সেই বাটীতে একজন বিখ্যাত ভূতের ওঝা আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহার কারণ, সে এক দিবস বৃক্ষবাটিকার একজন পরিচারককে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হাঁগা তোমরা কারা? তোমাদের কি সাহস? ভূতের বাড়ীতে আসিয়া বাসা লইয়াছ? পরিচারক উত্তর করিয়াছিল, আমাদের মুনিব এক জন পশ্চিম দেশীয় বিখ্যাত ভূতের ওঝা। সেই অবধি শ্যামা জানিত যে ভূতের ওঝা সেই বাটীতে বাস করিয়াছে। যাহা হউক সন্ধ্যার পর সেই বাটীর নিকটের পথ দিয়া আর কেহ যাতায়াত করিত না; দিবসে যাহারা যাইত তাহারা সেই বাটীতে নূতন প্রকার চাকর নফরের আবির্ভাব দেখিয়া অন্যপ্রকার সন্দিহান হইল।

এই সময়ে নিষ্কর্ম্মা নিন্দাপ্রিয় এবং মিথ্যাগল্পপ্রিয় সুবর্ণপুর গ্রামবাসীরা নানা প্রকার কথা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইল। কোথাও দোকানে বসিয়া, কোথাও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, কোথাও দেবমন্দিরে বসিয়া, এবং কখন কখন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বসিয়া, দলে দলে গ্রামবাসীরা ঐ সকল নূতন কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল,—প্রথমতঃ বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয়তঃ দান করিয়া ফিরে লওয়া, তৃতীয়তঃ গঙ্গাতীরের বাটীতে কে বাস করিল! স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই। ফলাহারে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গঙ্গাতীরে সারি দিয়া বসিয়া আহ্নিক করিতে করিতে, কুমুদিনীর, শরৎকুমারের, এবং গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকা-অধিষ্ঠাতা ভূতের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। এ ত বৃদ্ধা এবং

অর্দ্ধবয়সীদিগের সভা। মধ্যাহ্ণ সূর্য্য ম্লান কিরণ না হইতে হইতেই প্রৌঢ়া এবং যুবতীগণ কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ত্যাগ করিয়া, কেহ পীড়িত স্বামী ত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধ পিতা ত্যাগ করিয়া, দলে দলে হরিনাথ বাবুর বাটীর সন্নিকট নিভৃত এবং বৃহৎ একটি পুষ্করিণীতে গাত্রপ্রক্ষালন উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কোন যুবতী যদি অসামান্যা সুন্দরী হয় তবে তাহার প্রতিবেশী যুবতীগণ তাহাকে বিষনয়নে দেখিয়া থাকে, তাহার অতি সামান্য ছল পাইলে তাহাকে অতিশয় ঘৃণিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। কুমুদিনী অসামান্যা সুন্দরী,—সুবর্ণপুর গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, বিধবা হইলেও পুনর্বায় বিবাহ হইবে, তাহাতে আবার অতি বাঞ্ছনীয় পাত্রের সহিত, রূপ, গুণ, ধন, যৌবন, সকলি আছে এমন পাত্র শরৎকুমারের সহিত বিবাহ হইবে, প্রতিবেশিনীদিগের কি হিংসার শেষ আছে! সুতরাং সকলে ঘাটে একত্র মিলিত হইয়া কুমুদিনীর নিন্দার একশেষ করিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধ্যা হইয়াছে, পুষ্করিণী অধিষ্ঠাত্রী যুবতীদিগের রূপে লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেব একখানি বৃহৎ রূপার থালের ন্যায় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে উকি মারিতেছেন। দুই চারিটি মাত্র যুবতী ঘাটে কুমুদিনীর নানা প্রকার নিন্দা করিতেছে। এমত সময়ে তাঁহার ভগিনী বিনোদিনী একাকিনী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাঁহাকে দেখিবা মাত্র নিন্দাপ্রিয় স্ত্রীগণ, লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া একে একে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। এখন চন্দ্রদেব নিঃসঙ্কোচে বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে পূর্ণজ্যোতিতে নীলাকাশে প্রকাশ পাইলেন, দেখিয়া গাছ পালা, লতাপাতা, নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত গিরিগুহাসম্বলিত সমুদায় জগৎ হাসিয়া উঠিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সায়াহ্ণে।

নিভৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ, এবং চন্দ্রালোকবিধৃত পদ্মপুষ্করিণীর ঘাটে বিনোদিনী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন,—কখন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নয়নরঞ্জন চন্দ্রের প্রতি, কখন বা উজ্জ্বল সান্ধ্য তারার প্রতি চাহিয়া অনন্যমনে ভাবিতেছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন কে বলিবে? হেমন্তের অতি শীতল নীহারে শরীর আর্দ্র হইয়া কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়াতে বিনোদিনীর সংজ্ঞা হইল, আস্তে আস্তে জলে নামিলেন। স্থির সরসীবক্ষে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম দুলিতেছিল, একটি রাজহংস স্বচ্ছ বারিবক্ষে বিচরণ করাতে তাহার জলহিল্লোলে পদ্মটি হেলিতেছিল দুলিতেছিল। জলে নামিয়া বিনোদিনী তাহাই দেখিতেছিলেন। কখন কখন এমত ঘটে যে, চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করা যায়

না, কোন কার্য্যের ফলবিশেষ সুখপ্রদ নহে বরং অমঙ্গলজনক হইতে পারে অথচ সেই কার্য্যসাধনে চিত্ত দুর্দ্দমনীয় বেগে ধাবমান হয়। পদ্ম ফুলটি তুলিতে বিনোদিনীর বিশেষ স্পৃহা ছিল না বরং শীতপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ জলে নিমগ্ন থাকিতে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তথাচ সেই পুষ্পটি তুলিবার জন্য চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যেরূপ অলসচিত্তে অলসশরীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, সেইরূপ চিত্তে সেইরূপ শরীরে জলে নিমজ্জন করিয়া সেই পুষ্প-উদ্দেশে চলিলেন। বাল্য কাল হইতে বিনোদিনী সন্তরণে পটু ছিলেন, নিঃশব্দে স্থিরঅঙ্গে রাজহংসীর ন্যায় যাইয়া পুষ্পটি চয়ন করিলেন, প্রত্যাগমন কালে হঠাৎ অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, ভাবিলেন শীতবশতঃ শরীর অবশ হইতেছে। অতি কষ্টে কূলে পৌছিলেন, কিন্তু পৌছিবা মাত্র অচেতনপ্রায় ভূপতিত হইলেন।

তীরোপরি একটী অম্র বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি উঁকি মারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিতে ছিল; এক্ষণে তাঁহার মূর্চ্ছাবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইল। বিনোদিনী অজ্ঞান হন নাই কেবলমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য ভূপতিত হইয়াছিলেন। যখন নৃশংস তাঁহাকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাঁহার চীৎকার শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে কে এক ব্যক্তি সেইরূপ স্বরে অভয় দিল, নৃশংস সেই স্বর শুনিবামাত্র বিনোদিনীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। বিনোদিনী আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি যুবাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল। বিনোদিনী হঠাৎ ভয় পাইয়া চমকিতা হইলেন, তৎপরে যুবার মুখপ্রতি চাহিবামাত্র সেই ভয় অন্তর্হিত হইল, লজ্জায় শিরোবসন টানিয়া মুখ আবৃত করিলেন, এবং কোন কারণে শরীর চঞ্চল হইল, তদুপরে যুবক, যে ফুলটি তুলিতে গিয়া বিনোদিনী প্রাণ হারাইতেছিলেন, সেই ফুলটি তাঁহার হস্তে দিলেন। দিবার সময় কি কথা বলিতে লাগিলেন, সে একটি কি দুইটি কথা নহে অনেক গুলি কথা বলিতে লাগিলেন। বিনোদিনী মুখ আবৃত করিয়া নত মস্তকে দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে তাহা শুনিতে ছিলেন, কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিমধ্যে পরিচারিকা শ্যামার সহিত বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে দেখিয়া শ্যামা বলিয়া উঠিল "হাঁ্যা গা গৃহস্থের মেয়ে এত রাত পর্য্যন্ত কি জলে পড়ে থাক্‌তে হয়।" বিনোদিনী কোন উত্তর না করাতে শ্যামা নিকটে আসিয়া তাঁহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল; দেখিল গতি অন্য-

মনার ন্যায়, মস্তক কুলবধূদিগের ন্যায় আবরিত। শ্যামা তৎপরে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "হুঁ! এই যে হয়েছে দেখ্‌ছি, না হবে কেন, ভরসন্ধ্যে বেলা, একলা গাছ তলায় পুকুর পাড়ে বেড়াবেন, এঁকে পাবে না ত কাকে পাবে? ভাগ্যিস একজন ভাল ভূতের বোজা এ গাঁয়ে এয়েচে, নহিলে কি হত!" তৎপরে অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিতে গিয়া, হঠাৎ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিল দীর্ঘাকার মল্লবেশী এক ব্যক্তি তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। শ্যামা কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া চীৎকার করিল "কেবা?" দীর্ঘাকার ব্যক্তি তাহা শুনিবামাত্র নিকটস্থ এক জঙ্গলমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তখন বিনোদিনীর চমক হইল এবং অতিদ্রুত পদে উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে।

গভীর যামিনীতে একটি বিজনকক্ষে কুমুদিনী তাঁহার ভগিনী বিনোদিনীর মস্তক ঊরূপরে রাখিয়া একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন। বিনোদিনী বিষম জ্বরে অচেতনপ্রায়, মধ্যে মধ্যে এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিতেছেন আবার অচেতনপ্রায় হইতেছেন। কুমুদিনীর চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ নাই, ঘন ঘন ভগিনীর গাত্রে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন, সন্ধ্যা রাত্রে কে এবং কি অভিপ্রায়ে বিনোদিনীর পশ্চাৎ২ অনুসরণ করিয়াছিল। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হইল, আস্তে আস্তে বিনোদিনীর মস্তক আপনার ঊরু হইতে উপাধানে রাখিয়া, পশ্চিমদিকের একটী গবাক্ষ খুলিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইলেন। গবাক্ষের নিকট একটী নিম বৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে স্থিরভাবে বসিয়া দুই একটী পক্ষী নিদ্রিত ছিল, গবাক্ষোদ্ঘাটন শব্দে বৃক্ষ হইতে তাহারা এক একবার পক্ষ সাপট দিল, বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্লবের অন্তরালে স্তিমিতপ্রায় চন্দ্রদেবকে অনেক গুলি বৃহৎ২ উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় দেখা যাইতে ছিল। কুমুদিনী অনেক ক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, শীতল নৈশ বায়ু সেবন করিয়া পুনরায় ভগিনীর নিকট আসিয়া, আবার গাত্রোত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। দুই একবার "বিনোদ বিনোদ" বলিয়া ডাকিলেন; উত্তর নাই। বিনোদিনী জ্বরে অঘোর হইয়া রহিয়াছেন। চিন্তিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। গবাক্ষ প্রতি দৃষ্টি পড়িল, অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, গবাক্ষদ্বারদেশে এক বৃহদাকার মনুষ্য দাঁড়াইয়া কক্ষমধ্যে উঁকি মারিতেছে। কুমুদিনী সামান্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা সাহসবিশিষ্টা হইলেও অতিশয় ভীতা হইলেন। "শ্যামা শ্যামা" বলিয়া চীৎকার করিলেন। শ্যামা

কক্ষবাহিরে রায়েশ্বর নিদ্রিত ছিল, তাহার উত্তর পাইলেন না। ইতিমধ্যে সেই দীর্ঘাকার ব্যক্তি গবাক্ষ হইতে অবরোহণ করিল। তাহার লম্ফনশব্দ কুমুদিনী শুনিতে পাইয়া অতিদ্রুত গিয়া গবাক্ষ বন্ধ করিলেন। পুনরায় শয্যোপরি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরিচারিকাদিগকে অনেকবার ডাকিলেন, কাহারও উত্তর পাইলেন না, স্বয়ং ভগিনীকে একাকিনী রাখিয়া তাহাদিগের অন্বেষণে যাইতে পারেন না—অতিশয় ভীতা হইয়া বসিয়া রহিলেন, মনে মনে নানাপ্রকার ভয়-সঞ্চার হইতে লাগিল। নিস্তেজ ক্ষীণ দীপশিখা কক্ষ মধ্যে কাঁপিতে ছিল। কক্ষপ্রাচীরে একটি করালমূর্ত্তি দেবী কালী অঙ্কিত ছিল। আলুলায়িতকেশী, লোল-জিহ্বা, বিবসনা, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি মহাকাল হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছিল। ক্ষীণ দীপালোক নানা রঙ্গে সেই ভয়ঙ্করী প্রতিমা উপরে খেলিতে ছিল, কুমুদিনী এক দৃষ্টে সেই মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়া ছিলেন। দেখিতে দেখিতে নিস্তেজ দীপালোক নির্ব্বাণ হইল. কক্ষ মসীময় হইল, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদিনী সেই অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দ, বাহিরে কদাচিৎ কখন অতি মৃদু কখন অতি ভীষণ রব শুনিতেছিলেন, ইতিমধ্যে কক্ষবাহিরে বারেণ্ডায় হঠাৎ খস্ খস্ শব্দ শুনিলেন। শরীর রোমাঞ্চ হইল, শব্দ মনুষ্য পদধ্বনি বলিয়া বোধ হইল। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "কেও?" শব্দ থামিল, কিন্তু কোন উত্তর নাই। কুমুদিনী স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলেন; আবার সেইরূপ খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে?" শব্দ থামিল, তৎ-পরেই পুনরায় শব্দ হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে কক্ষদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল না, পাছে সে ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সেই ভয়ে কুমুদিনীর শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনিলেন যেন কে দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতরে অতি সাবধানে প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণেই সেই পূর্ব্ববৎ পদশব্দ কক্ষমধ্যে শুনিতে পাইলেন। কুমুদিনী মুমূর্ষুবৎ বসিয়া অন্ধকারে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই খস্ খস্ শব্দ ক্রমে ক্রমে অতি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অন্ধকারে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া অস্পষ্ট মৃদু চন্দ্রজ্যোতি প্রবেশ করাতে কক্ষমধ্যে কুমুদিনী দেখিতে পাইলেন যেন কে দ্বারের নিকট নড়িতেছে। ক্রমে অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন। কুমুদিনী পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মনুষ্যাবয়বকে ক্রমে একটি স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রীলোকও নিঃ-শঙ্কোচে তাঁহার দিকে আসিতেছে। কুমু-দিনী তাহাকে দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি, কথা কও না কেন?" স্ত্রীলোকটী উত্তর না দিয়া কুমুদিনীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পালঙ্কের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কুমু-

দিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পরে নিশাচরী যেন কুমুদিনীর গায় স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে যখন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিল. তখন কুমুদিনী অচেতনপ্রায় হইয়া ভগিনীর পার্শ্বে পতিত হইলেন।

তর্ক সংগ্রহ।

তৃতীয় তর্ক—জগদুপাদান* নিরূপণ—

আমবা পূর্ব্বে ইহা উপপন্ন করিয়াছি যে, এই বিচিত্র কৌশলপূর্ণ জগন্মণ্ডলেব একটি সৃষ্ট পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কর্ত্তা আছেন। তিনি নিত্য, তাঁহাব জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন ও শক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলও নিত্য ও অনন্ত। তিনি সনাতন পবমাণু সকলকে উপাদান কবিয়া এই বিতত বিশ্বমণ্ডলেব নির্ম্মাণ কবিয়াছেন।

এক্ষণে জগতের উপাদান রূপ সেই পবমাণুসমূহের অস্তিত্বাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে অভিহিত হইতেছে।

কিন্তু প্রস্তুত বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবিবাব পূর্ব্বে আমরা. পূর্ব্ব তর্কগত একটি কথার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা উচিত বোধ করিতেছি, বোধ হয় সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।

আমরা "ঈশ্বরাস্তিত্ব" বিষয়ক তর্কেব এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছি যে, "ঈশ্বরেব বিষয় অধিক আন্দোলন কবিলে হয় ত শিষ্টজনবিগর্হিত নাস্তিকতা আসিয়া পড়িবে।" ইহাতে পাঠকদিগেব মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন ইহার তাৎপর্য্য কি? ঈশ্বরের বিষয় অধিক আন্দোলন করিলে কেন নাস্তিকতা আসিয়া পড়িবে? সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এতৎসম্বন্ধে আমাদেব অভিপ্রায়টি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত অনুচিত নহে বরং তাহাতে কিছু উপকাব হইতে পাবে।

মনে কর আমি নৈয়ায়িক, আমি ঈশ্বরত্ব দান কবিতে সঙ্কল্প কবিয়া যিনি ঈশ্বর বলিয়া চিরপরিচিত তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। তিনি আসিতে না আসিতে পরমাণু সকল উচ্চৈঃস্বরে বলিবে "ছি! ছি! এমন পক্ষপাতেব কর্ম্ম কবো-না। আমবাও নিত্য. আমবাও জগন্নির্ম্মাণেব কাবণ, আমবা না থাকিলে তোমার ঈশ্বর কখনই জগন্নির্ম্মাণ করিতে পাবেন না, তবে তুমি কি বলিয়া উঁহাকে সর্ব্বেশ্বর কহিতেছ?" কাজে বলিবেন, "আমাকে তুমি নিত্য বলিয়াছ; জগতের

* যাহা হইতে কোন বস্তুর অবয়ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, গঠিত হয়, তাহার নাম উপাদান। যেমন ঘটের মৃত্তিকা প্রভৃতি।

আধার বলিয়াছ, এবং অন্য বস্তুর জনক বলিয়াছ, আমি থাকিতে কেহই সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন না।” অদৃষ্টও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া বলিবেন “যত দিন আমি তত দিনই এই সৃষ্টি, আমা ভিন্ন একটি কীটাণুরও সৃষ্টি করিতে কাহার সামর্থ্য নাই, অতএব আমি বর্ত্তমানে সর্ব্বেশ্বর হন এমন কাহাকে ত দেখি না। যদি বল, আমরা জড়, তিনি সচেতন, এই তারতম্য হেতু তাঁহাকে ঈশ্বরত্ব পদে অভিষিক্ত করা হইতেছে। একথা তাদৃশ সঙ্গত নহে, কেন না তিনি যখন আমাদের উপর প্রভুতা করিতে অক্ষম তখন তিনি কখনই সর্ব্বেশ্বর নহেন।”

একথা শুনিয়া আমি কি করিব? গুণানুসারে অবশ্যই ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিয়া দিতে বাধ্য হইব। পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করুন, মিল যে ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিয়া দিয়াই খৃষ্টান সমাজের মধ্যে অনেকের নিকট নাস্তিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, সেই ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিলে হিন্দুসমাজে আমাদের কি কেহ আস্তিক বলিয়া সম্মান করিবে?

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক। কেহ বলিয়াছিল একজন নিত্যজ্ঞানাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর, নিত্য পরমাণু সমূহকে উপাদান করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, এত আড়ম্বর অপেক্ষা জগতের উৎপত্তিকে অনিমিত্ত অর্থাৎ আকস্মিক বলিলে হয়। যেমন—

“অনিমিত্ততোভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদি দর্শনাৎ।” ৪অ ১আ ২২ সূ

আমরা দেখিতেছি কণ্টকাদির তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি কোন নিমিত্ত বা উপাদান কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি হইয়া থাকে, এই রূপ এই জগৎও কোন উপাদান বা নিমিত্ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

ইহার উত্তরে কেহ বলিয়াছিল, অনিমিত্ত হইতে যদি জগতের উৎপত্তি হয় তবে অনিমিত্তই নিমিত্ত হইল। গৌতম বলেন—

“নিমিত্তানিমিত্তয়োরর্থান্তর ভাবাদপ্রতিষেধঃ।” ৪অ, ১আ ২৪সূ

এই সূত্রের নবীনেরা এই রূপ ব্যাখ্যা করেন। নিমিত্ত আর অনিমিত্ত এই দুইটি কথা ভিন্নার্থক সুতরাং ভিন্ন প্রতীতির কারণ। প্রথমে কোন বস্তুর নিমিত্তের জ্ঞান না হইলে তাহার অনিমিত্তের জ্ঞান হয় না। যদি সকল বস্তুই অকস্মাৎ উৎপন্ন হইত তবে চিরপ্রসিদ্ধ নিমিত্ত আর অনিমিত্তের প্রতীতিই থাকিত না। তাঁহারা আরও বলেন কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিও অনিমিত্ত নহে ইহারা অদৃষ্টবিশেষসহকৃত পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়।

অপরে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এই জগতের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রত্যেক কার্য্যকে পূর্ব্ববর্ত্তি-কার্য্যবিশেষকে বিনাশ করিয়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন পুষ্পের অনন্তর ফল, ফলের অনন্তর বীজ, বীজের

অনন্তর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার কত অবস্থান্তর হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়। এবং একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে হইলে তুলরাশির কত প্রকার অবস্থান্তর করিতে হয়।

এইরূপ জগতের সমুদয় কার্য্যকেই কোন না কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অভাবান্তর উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে। অতএব অভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি বলিলে হয়।

"অভাবাদ্ভাবোৎপত্তি র্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ৭৮ অ, ১আ ১৪ সূ।

ভাবানাং কার্য্যাগমভাবাদেবোৎপত্তির্যতোবীজাদিকমনুপমৃদ্য অঙ্কুরাদেঃ প্রাদুর্ভাবাভাবাৎ। তথাচ বীজাদি বিনাশোঽঙ্কুরাদ্যুপাদান মিতি। সূত্রবৃত্তিঃ।

গৌতম ইহার এইরূপ উত্তর করিয়াছেন যে তুমি বলিতেছ সমস্ত কার্য্যই স্বপূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যবিশেষকে বিনাশ করিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে এ কথা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয়। আচ্ছা বল দেখি উৎপন্ন পদার্থ পূর্ব্ব পদার্থের বিনাশের পূর্ব্বে অবর্ত্তমান বা বর্ত্তমান থাকে? যদি অবর্ত্তমান থাকে তবে পূর্ব্বকার্য্যের বিনাশের কারণ হইতে পারে না, আর যদি বর্ত্তমান থাকে তবে পূর্ব্ব বস্তুর অভাব ইহার উৎপত্তির প্রতি কিরূপে কারণ হইবে? আরও কোন একটি পুষ্পকে হস্তাদি দ্বারা একবারে বিমর্দিত করিলে তাহা হইতে কি আর অঙ্কুরোৎপত্তি হয়? কোন ব্যক্তি কখন কি সম্পূর্ণ বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি দেখিয়াছেন? কখনই না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এই চরাচর জগন্মণ্ডলের উপাদান অভাব কখনই হইতে পারে না।

প্রতিবাদীরা এখানে অভাব শব্দদ্বারা ধ্বংসরূপ অভাবের গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তদনুরূপ দোষারোপ করিয়া মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্তরূপ অভাব জগতের উপাদানীয় বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পদার্থের যে সকল অবয়ব ও ধর্ম্ম উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব উত্তর কার্য্যের একটি নিমিত্ত কারণ আর পূর্ব্ব পদার্থের অবয়ববিশেষ উত্তর পদার্থের উপাদান। অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত পদার্থের যে সকল অবয়ব উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব হইলে অবশিষ্ট অবয়ব হইতে উত্তরপদার্থের উৎপত্তি হয়। ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে প্রথমে অঙ্কুরোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক বীজাবয়ব বিশেষের নাশ হয়, পরে বীজের অবশিষ্ট অবয়ব জলাভিষিক্ত ভূমির অবয়বের সহযোগে অঙ্কুরকে উৎপন্ন করে। তথাচ

"ব্যাহতব্যূহানা মবয়বানাং পূর্ব্বব্যূহ নিবৃত্তৌ ব্যূহান্তরাদঙ্কুর নিষ্পত্তি র্নাভাবাৎ।"

ভাষ্যম্।

বীজে বিনষ্টেহি তদবয়বে জলাভিষিক্ত ভূম্যবয়বসহিতৈরঙ্কুর আরভ্যতে।

অভাবমাত্রস্য কারণত্বে চূর্ণীকৃতাদপি বীজাদঙ্কুরোৎপত্তিঃ স্যাৎ অভাবস্য নির্বিশেষত্বাদিতি ভাবঃ।

ইতি সূত্রবৃত্তিঃ।

এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকেরা কেন পরমাণুকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন। তথাচ আমরা এ বিষয় কিছু উল্লেখ করিতেছি।

পরম (অতিশয়) ও অণু (সূক্ষ্ম পদার্থ) এই দুইটি শব্দের সংযোগে, পরমাণু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ,ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে পরমাণুর স্বরূপ এইরূপে কথিত হইয়াছে।

"লোষ্ট্রস্য খলু বিভজ্যমানস্যাল্পতর মল্পতম মুত্তর মুত্তরং ভবতি + + + যতশ্চ নাল্পীয়োঽস্তি তং পরমাণুং প্রচক্ষ্মহে।

একখানি ইট ক্রমশঃ ভঙ্গ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অর্থাৎ যাহা হইতে আর সূক্ষ্ম হইতে পারে না এমন অংশকে পরমাণু বলা যায়। এই পরমাণুর অবয়ব নাই। ইহা নিত্য। এই জন্যই গৌতম মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই তিনি বলেন—

"ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ। ৪র্থঅ ২আ ১৬

একটি বস্তুর অবয়বের ক্রমশঃ বিভাগ হইতে হইতে পরমাণুতে উপস্থিত হয়। পরমাণুর অবয়ব নাই, তাহার বিভাগও নাই কাযে কাযেই একবারে সর্ব্বপ্রলয় হয় না।

পরমাণু হইতে যে কিরূপে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তর্কসংগ্রহের টীকা নীলকণ্ঠীতে অতি সরলরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা

"ঈশ্বরস্য চিকীর্ষাবশাৎ পরমাণুষু ক্রিয়া জায়তে। ততঃ পরমাণুদ্বয় সংযোগে সতি দ্ব্যণুক মুৎপদ্যতে, ত্রিভির্দ্ব্যণুকৈ স্ত্র্যণুক মুৎপদ্যতে। এবং চতুরণুকাদি ক্রমেণ মহাপৃথিবী, মহত্যাপঃ মহত্তেজো মহান্ বায়ু রুৎপদ্যতে।"

ঈশ্বরের সিসৃক্ষা হইলে পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণুদ্বয় মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুকরূপে পরিণত হয়; তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়; এইরূপে ক্রমেতে বিবিধ নদ নদী, সমুদ্র এবং পর্ব্বতাদি-সমাকীর্ণ ভূলোক ও তেজোময় সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ভাল এইরূপে সৃষ্টি হউক কিন্তু পরমাণুর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ যেরূপে পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"জালসূর্য্যমরীচিস্থং সূক্ষ্মতমং যদ্রজ উপলভ্যতে তৎ সাবয়বং। চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ। পটবৎ। ত্র্যণুকাবয়বোঽপি সাবয়বঃ মহদারম্ভকত্বাৎ। যোদ্ব্যণুকাবয়বঃ সএব পরমাণুঃ।"

দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি পরিমাণমহত্ত্বের কারণ; যে সকল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইবে তাহাদের পরিমাণ মহৎ হওয়া চাই, অর্থাৎ তাহাদের অবয়ব থাকা চাই।

এক্ষণে দেখ আমরা গবাক্ষগত সূর্য্যকিরণস্থিত যে সকল অতি সূক্ষ্ম রজঃকণা দেখিতে পাই তাহাদের অবশ্যই অবয়ব আছে নতুবা তাহারা চাক্ষুষ হইত না। তাহাদের এক একটি ছয়টি ত্র্যণুক দ্বারা উৎপন্ন। আরও দেখ যাহারা সাবয়ব তাহারাই মহদারম্ভক অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদান হয়; অতএব ত্র্যণুকের ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদান হইতেছে অতএব উহারাও সাবয়ব, উহাদের অবয়ব আছে। ত্র্যণুকের অবয়ব যে পরমাণু ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পরমাণুর আর অবয়ব নাই তাহা হইলে অনবস্থা হয়। পরমাণুর যদি অবয়ব থাকে, সেই অবয়বের অবয়বও মানিতে হয়, আবার সেই অবয়বাবয়বের অবয়বও মানিতে হয় এইরূপ মানিতে মানিতে এক স্থানে অবশ্যই বিশ্রাম করিতে হইবে। যেখানে বিশ্রাম করিতে হইবে সেই পরমাণু।

কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব।

প্রথম প্রস্তাব।

(মেঘদূত।)

আম্রকূট পর্ব্বতের পর বিন্ধ্যপাদশোভিনী নর্ম্মদা নদী মেঘের নয়নপথে পতিত হয়। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর বিবরণ আধুনিক ভূগোলে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বর্ণিত আছে। পুরাণাদিতেও এই পর্ব্বত ও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুরাণের নির্দ্দেশানুসারে বিন্ধ্য পর্ব্বত সপ্তকুলাচলের অন্যতম।(১) মেজর উইলফোর্ড প্রাচীন ভূগোলানুসারে ইহা তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ভাগত্রয়ের মধ্যে প্রথম অথবা পূর্ব্বভাগ বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা ও শোণের উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঋক্ষ পর্ব্বত এই অংশের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অথবা পশ্চিমভাগ নর্ম্মদা ও শোণের উদ্ভবক্ষেত্র হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই দক্ষিণাংশ পারিপাত্র অথবা পারিযাত্র নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ ভাগ দিল্লী হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই

(১) মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষ পর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতা॥
বিষ্ণু পুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

ভাগ রৈবতক নামে অভিহিত হইয়া থাকে (২)। যাহা হউক, অধুনিক ভূগোলের মতে বিন্ধ্যাচল গুজরাট হইতে গঙ্গার তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা ১,০০০ (কোন কোন মতে ২৫০০) হইতে ৩০০০ ফীট। দৈর্ঘ্য প্রায় সার্দ্ধৈক শত মাইল। বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই ভাগদ্বয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক্‌গণ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে বিন্ধিয়ান (Vindian) নামে নির্দ্দেশ করিতেন।(৩)

মেঘদূতোক্ত রেবাই নর্ম্মদা নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কোষকার অমরসিংহ রেবা ও নর্ম্মদা উভয়কেই এক পর্য্যায়ে নিবেশিত করিয়াছেন (৩)। বিষ্ণুপুরাণে বিন্ধ্যপর্ব্বতসম্ভূত নদীসমূহের মধ্যে নর্ম্মদা নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৪)। বায়ুপুরাণের মতে এই নদী ঋক্ষ পর্ব্বত সম্ভূত।* বস্তুতঃ নর্ম্মদা বিন্ধ্যপর্ব্বত সংলগ্ন অমর কণ্টকের মালক্ষেত্র হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।† এক্ষণেও অমর কণ্টকে নর্ম্মদা নদীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। লোকে ভবানী বলিয়া এই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। মূর্ত্তির নিকটে একটি দাসী ও বৈবাহিক ভোজের অনুষ্ঠানকারী কতকগুলি লোকের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। এই দাসীর নাম জোহিল্লা। নর্ম্মদা এরূপভাবে অবস্থাপিত রহিয়াছেন যে দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন কোন গুরুতর অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ অপরাধিনী জোহিল্লার প্রতি বারম্বার রোষকষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে; প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে এই স্থলে তাহা যথাবৎ লিখিত হইল:—একদা শোণ নদ নর্ম্মদার অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন; এবং এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে নর্ম্মদার নিকট আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। নর্ম্মদা শোণের বেশভূষা ও বৈবাহিক যাত্রার বিবরণ জানিবার নিমিত্ত জোহিল্লাকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন। জোহিল্লার প্রতি এরূপও আদেশ হয় যে, যদি শোণ মহার্হমণিমণ্ডিত, কমনীয় দেহ ও উন্নত চরিত্র হয়েন, তাহা হইলে যেন তাঁহাকে

(২) As. Res. Vol xiv p. 382—Wilford, Ancient Geography of India.

[৩) Works of Sir W. Jones. Vol i p. 23.

(৩) "রেবাতু নর্ম্মদা সোমোদ্ভবা মেখলকন্যকা।" অমরকোষ।

(৪) "নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

* Wilson's Vishnu Purana. Ed. by Hall. Vol ii p 131, note 1.

† Malcolm's Central India, Vol. ii. p. 507. Com. Thornton, Gazetteer of India Vol iii p 724.

আদরপূর্ব্বক অমরকণ্টকে আনা হয়। জোহিল্লা স্বামিনী কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া শোণের নিকট গমন করে। এ দিকে শোণ মহদাড়ম্বর সহকারে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ করেন। জোহিল্লা নির্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইয়া শোণের তদানীন্তন বেশপারিপাট্য, অনুপম সৌন্দর্য্য ও কমনীয় দেহমহিমায় এরূপ আকৃষ্ট হয় যে, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া স্বয়ংই নর্ম্মদার রূপ ধারণ পূর্ব্বক শোণকে পতিত্বে বরণ করে। অনন্তর শোণ ও জোহিল্লা অমরকণ্টকে সমাগত হইলে নর্ম্মদা দাসীর এই কুব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মুখ বিকৃত করেন। এই জন্য জোহিল্লার প্রতিমূর্ত্তি বিকৃতমুখ হইয়া রহিয়াছে। পরিশেষে তিনি শোণকে অধিত্যকা প্রদেশ হইতে পর্ব্বতপাদদেশে নিক্ষেপ করেন। এই পাদভূমি হইতে শোণের উদ্ভব হইয়াছে। এই রূপে উভয় পক্ষের শাস্তিবিধান করিয়া নর্ম্মদা অন্তর্হিত হয়েন। এই অন্তর্দ্ধান স্থান হইতেই নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এ দিকে জোহিল্লার নয়নবারি একটি ক্ষুদ্র নদী রূপে পরিণত হয়। এই নদীও জোহিল্লা নামে প্রসিদ্ধ। অমরকণ্টক পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে (৫)।

আমাদের পিতৃপুরুষগণ সিন্ধু সরস্বতীর ন্যায় নর্ম্মদাকেও দেবীভাবে অর্চ্চনা করিতেন, নর্ম্মদার প্রতিও তাঁহাদের দেবীজনোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এতন্নিবন্ধন পুরাণাদিতে নর্ম্মদার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণে এবিষয়ে একটী সুন্দর স্তোত্র দৃষ্ট হয়। এই স্থলে উহার কিয়দংশ গৃহীত হইলঃ—

"সূর্য্য এবং চন্দ্র তোমার উজ্জ্বল চক্ষুঃ তোমার ললাট-নেত্র অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। * * তোমার সমক্ষেই অন্ধকাসুরের শোণিত বিশুষ্ক হইয়াছে। তোমার তুষারচূর্ণ মানবজাতির ভীতি নিবারণ করিতেছে। ব্রহ্মা ও শিব তোমার স্তুতিগান করেন, মর্ত্ত্যগণ তোমার অর্চ্চনা করে, এবং ঋষিগণ তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ তোমার সন্তান। সূর্য্য হইতে তোমার উৎপত্তি তুমি মহাসাগরে সম্মিলিত হইয়াছ। তোমার দ্বারাই মর্ত্ত্যগণ পবিত্র রহিয়াছে। তুমি সমস্ত অভাব মোচনকারিণী। যাহারা তদ্গত চিত্তে তোমার অর্চ্চনা করে, তুমি তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কুশল বর্দ্ধন কর। তোমা দ্বারাই মর্ত্ত্যগণ দুঃখের আগার পরিহার করিয়া সুখময় প্রদেশে পরিচালিত হইতেছে।"

সমুদ্রতল হইতে নর্ম্মদার উদ্ভব ক্ষেত্রের উচ্চতা সম্ভবতঃ ৩,০০০ ও ৪০০০ ফীটের মাঝামাঝি। এই উদ্ভব-স্থান ব্রিটিষাধিকৃত রামগড় বিভাগের অন্তর্গত। নর্ম্মদা গোন্দয়ানা হইতে মালব

(৫) As. Res. Vol. vii. p. 102-103.

ও খান্দেশ প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক গুজরাট দিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০১ (কোন কোন মতে ৭৫৬) মাইল।* ইহা অতি সরল পথে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। নর্ম্মদার ন্যায় সরলগামিনী নদী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ গতির সারল্য বিষয়ে এই নদী সর্ব্বাগ্রগণ্য। নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৯ মিনিট, দ্রাঘিমা ৮১ ডিগ্রি, ৪৯ মিনিট এবং সাগরসঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭২ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট।†

যদিও নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান ব্রিটিষ সীমার অন্তর্গত, তথাপি ইহার বিষয় অদ্যাপি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই। টিফেনথলার ও কাপ্তেন ব্লাণ্ট যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদনুসারে নর্ম্মদা একটি অক্ষয়বারিপূর্ণ কুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।‡ এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিক কারুকার্য্যখচিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে রেবা-নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রেবার নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যগত স্থান হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই নর্ম্মদার আর একটি নাম রেবা। (৬) মিসর দেশীয় ভূগোলবেত্তা টলেমী নর্ম্মদাকে "নমদাস"(Namadas) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।(৭)

নর্ম্মদার অন্যতম নাম মেখল (মেকল) কন্যকা। জনপ্রবাদ অনুসারে মেখল নামে একজন ঋষি নর্ম্মদার পিতা ছিলেন, এই জন্য নর্ম্মদা মেখলকন্যকা নামে অভিহিত হইয়াছে। বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণীর যে অংশস্থ মালক্ষেত্র (Fable land) হইতে নর্ম্মদার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও মেখলাদ্রিনামে প্রসিদ্ধ।(৮) বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটে নর্ম্মদার পার্শ্বভাগে মেখল নামে একটি জনপদ আছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশসমূহের বিবরণের প্রসঙ্গে বিন্ধ্য, নর্ম্মদা প্রভৃতির পর মেখল জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৯)। মেজর উইলফোর্ডের তালিকায় বিন্ধ্য পর্ব্বতের

* Thornton, Gazetteer of India. Vol. iii p. 728.

† Ibid., Ibid., p p. 725, 728.

‡ As. Res. Vol. vii. p. 100—Captain J. T. Blunt, Narrt of a route from Chunarghar to Yartnagoodum.

(৬) As. Res. Vol vii p. 102.

(৭) Vide Professor Wilson's Vishna Purana. Ed. by Fitzedward Hall. Vol ii p. 131, note 1.

(৮) Ibid. p 160. note 4.

(৯) সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাক্রমলতাযুতম্।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগ নিষেবিতাম্॥
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেখলামুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি॥
রামায়ণ। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ৪১ সর্গ ৮ ৯।

উত্তরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে মেখল জনপদ সমাবেশিত হইয়াছে।* ইহাতে বোধ হয় এই মেখল জনপদ হইতেই মেখলাদ্রি ও মেখলকন্যকা নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর পর মেঘদূতে দশার্ণ জনপদের নাম দৃষ্ট হয়। মেঘসমাগমে দশার্ণের যেরূপ দৃশ্য হইবে, কালিদাসের রসময়ী লেখনী হইতে তাহার এইরূপ বর্ণনা বহির্গত হইয়াছে।

"পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ
সূচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রাম-
চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণত ফলশ্যামজম্বু-
বনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয় দিনস্থায়ী হংসা
দশার্ণাঃ॥"

(হে মেঘ!) তুমি সন্নিকৃষ্ট হইলে অগ্রস্ফুট কেতকীকুসুমসমূহে দশার্ণের উপবন বৃতি পাণ্ডুবর্ণ হইবে। গৃহবলি ভোজী পক্ষিগণ (আপনাদের) কুলায নির্মাণে (ব্যতিব্যস্ত হইয়া) গ্রামের রথ্যা বৃক্ষসমূহকে আকুল করিবে। জম্বুবন পরিপক্ক ফলে শ্যামবর্ণ হওয়াতে দশার্ণের রমণীয় দৃশ্য হইবে (এবং) হংসগণ কিয়ৎকাল (তথায়) অবস্থান করিবে।

এই দশার্ণ জনপদের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাদৃশ পরিষ্কৃত ও সহজবোধ্য নয়। রামায়ণে সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে দক্ষিণবর্ত্তী স্থানাদির বিবরণমধ্যে এবং মহাভারতে ভীমসেনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে গঙ্গানদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহের মধ্যে দশার্ণের উল্লেখ আছে (১০)। টলেমী 'দশরেণ' (Dosarene) নামে একটি স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১১)। মেজর উইল ফোর্ডের মতে এই দশরেণ ও দশার্ণ উভয়ই অভিন্ন স্থান। উইলফোর্ড পৌরাণিক স্থানসমূহের যে তালিকা করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে (১২)। অধ্যাপক উইলসন্ দশ (দশ সংখ্যক) ঋণ [দুর্গ] এই ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দশার্ণ জনপদ ছত্রিশ

* As. Res. Vol viii. p 337—Wilford, Essay on the sacred Isles in the west.

(১০) ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেখলানুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি॥"
রামায়ণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। (পূর্ব্বের নোট দেখ।
"ততঃ স গণ্ডকান্ শূরো বিদেহান্ ভরতর্ষভঃ।
বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ॥"
মহাভারত। সভাপর্ব্ব। দিগ্ বিজয় পর্ব্বাধ্যায় ২৮।
Comp Journ As Soc Beng 1876 No iii p 373.

(১১) Wilson's Meghaduta. verse 154, note.

(১২) As. Res. Vol viii p 337.

গড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন। কারণ,ছত্রিশ গড [ছত্রিশ ষড়ধিক ত্রিংশৎ গড় দুর্গ] ও দশার্ণ একবিধ ব্যুৎপত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।[১৩] ডাক্তার হলের মতে দশার্ণ চান্দেরি বিভাগের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।[১৪] পুরাণে দশার্ণ নামে একটি নদীর উল্লেখ আছে।[১৫] ইহার বর্ত্তমান নাম দশান। অধ্যাপক লাসেন ও মেজর উইলফোর্ডও এই দশানকে দশার্ণ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নদী ভূপাল হইতে প্রবাহিত হইয়া বেত্তোয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।[১৬] আমাদের বিবেচনায় দশার্ণ জনপদ এই দশান নদীর নিকটবর্ত্তী। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারেও দশাননদীর সমীপবর্ত্তী প্রদেশ দশার্ণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।[১৭] চিরাগত জনশ্রুতি নিরবচ্ছিন্ন অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। এতদ্দ্বারা হল সাহেবের সিদ্ধান্তই ভ্রমশূন্য বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ চন্দেরীর পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী এবং বেত্তোয়া দশান ও ভিলশার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগকেই দশার্ণ নামে নির্দ্দেশ করা অধিকতর সঙ্গত।

মেঘদূতের বর্ণনানুসারে দশার্ণ জনপদের রাজধানী বিদিশা।[১৮] বেত্তোয়া নদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান ভিল্‌শা নগরই কালিদাসের দশার্ণ রাজধানী বিদিশা বলিয়া বোধ হয়।[১৯] রামগিরি হইতে সহজ পথে কৈলাসে যাইতে হইলে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী অতিবাহনের পর ভিল্‌শা নগরই সম্মুখে পতিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। এইজন্য আমরা অধ্যাপক উইল্‌সনের মতানুসারে ভিল্‌শাকেই বিদিশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

ডাক্তার হল ভিল্‌শার দুর্গে একখানি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হয়েন; এই ফলকে যে সকল কবিতা খোদিত ছিল, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ খণ্ডিত। হল সাহেব কবিতার অপরাংশের এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন:—

"+ + + প্রিয়ময়মপি নম্রাশ্রিতা নাহশ্রিতাংসা
গেহং মে বেত্রবত্যা নিবসিতজনতাক্ষোভমপ্রাপ্যজস্রম্।

(১৩) Wilson's Meghaduta, verse 154, note.

(১৪) Journ. As. Oc. Soc. vi, p 521, Comp. Wilson's Vishna Purana. Vol ii, p 160. F. E. Hall's note.

(১৫) Wilford, Ancient Geography of India in As. Res. Vol xiv pp. 405, 408.

(১৬) Wilson's Vishna Purana, Vol ii p 155. F. E. Hall's note Comp. As. Res. Vol xiv p 408.

(১৭) Wilson's Vishna Purana, Vol ii p 160. F. E. Hall's note.

(১৮) "তেষাং দিক্ষু প্রথিত বিদিশালক্ষণাং রাজধানীং" ইত্যাদি।
মেঘদূত। ২৫।

(১৯) Vide Wilson's Meghaduta, verse 161, note.

তেজোময়্যত্র চোচ্চৈর্বিততমিতি বিদিত্বাহং
দবেণাস্ত্বতুল্যং
ভাইল্ল স্বামিনামা ববিরবতু ভুবঃ স্বামিনং
কৃষ্ণরাজম্॥
চেদীশং সমরে বিজিত্য শবরং সংহৃত্য
সিংহাহ্বয়ং
রাণামণ্ডল রোদপাদ্য বলিপো ভুম্যাং
প্রতিষ্ঠাপ্যচ।
দেবং দ্রষ্টু মিহাগতো বচিতবাংস্তোত্রং
পবিত্রং পরং
শ্রীমৎ কৃষ্ণনৃপৈক মন্ত্রিপদভাক্কৌণ্ডিল্য
বাচস্পতিঃ।"

এই কবিতা দুটীর ভাবার্থ এই, "কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি নামক জনৈক ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাব বাসস্থান বেত্রবতী নদীর তটে অবস্থিত ছিল। তিনি একদা সমরে চেদীশ্বরকে পরাজয় ও তদীয় জনৈক সেনাপতিকে নিহত করিয়া রাণা ও রোদপাদি জনপদে আধিপত্য কবেন। ইহাব পব কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি বাজা কৃষ্ণকে দেখিবাব নিমিত্ত তাঁহাব রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি এই স্থানে আসিয়া স্বীয় প্রভু কৃষ্ণের রক্ষা বিধান জন্য ভাইল্ল স্বামী নামধেয় সূর্য্যের স্তব করিয়াছেন।" সংস্কৃত বিদিশা এই ভাইল্ল স্বামী হইতে ভিল্শা নামে পবিণত হইয়াছে। হল সাহেব বলেন এক সময়ে এই স্থানের লোকে সূর্য্যকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ মনে করিত। স্থানীয় নির্দ্দেশানুসারে এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম "ভাইল্ল" [২০]। এই ভাইল্ল শব্দেব উত্তর স্বামি-বোধক ঈশ শব্দ যোগ করিলে ভাইল্লেশ পদ সিদ্ধ হয়। 'ভাইল্লেশ' কালক্রমে সংহত ও অল্পাক্ষরগ্রথিত হইয়া 'ভেল্শ' অথবা "ভিল্শা" নামে প্রচারিত হইয়াছে [২১]।

ভিলশা নগব গোয়ালিয়ব রাজ্যে বেতোয়া নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে উজ্জয়িনী হইতে ১৩৪ মাইল এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র, হইতে ১৯০ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ সহস্র। এই স্থানে একটী দুর্গ আছে, ইহাব চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় প্রাচীরে পবিবেষ্টিত। প্রাচীরের স্থানে স্থানে চতুষ্কোণ গুম্বজ আছে। একটী খাত এই দুর্গকে পবিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে [২২]। এই নগরে সাড়ে নয় ফীট দীর্ঘ একটী উৎকৃষ্ট পিত্তলের কামান আছে। কামানের মুখ দশ ইঞ্চ প্রশস্ত। ইহা অতি সুগঠিত ও নানাবিধ কারুকার্য্যে পবিপূর্ণ। অনেকে

(২০) হল সাহেবের মতে ভা (দীপ্তি) ও প্রাকৃত ইল্ল (নিক্ষেপ করা) হইতে 'ভাইল্ল' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। F. E. Hall, Three Sanskrit Insinptions, in Journ. As. Soc. Beng. No. ii 1862, p 112 note. Comp. Wilson' Vishna Purana, ii 150.

(২১) Journ. As. Soc. Beng. 1862, p 112, note.

(২২) As. Res. vol vi p 30.—Hunter, Narr of Journ, from Agra to Oujein.

বলেন, এই কামান মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল (২৩)। নগরের বহির্ভাগে কতিপয় প্রশস্ত রাস্তা ও সুন্দর গৃহ আছে। প্রাচীনকালে ভিল্‌শা একটী বৃহদায়তন রাজ্য ছিল। ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অজয়পালের প্রধান মন্ত্রী সোমেশ্বর ভিল্‌শা রাজ্যের দ্বাদশটি বিভাগে আধিপত্য করেন (২৪)। যাহা হউক ১২৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ভিল্‌শা হিন্দু রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল, পরে দিল্লীর সম্রাট সমসউদ্দীন আলতমাস উহা আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (২৫)। কালক্রমে এই স্থান দিল্লীর শাসনভ্রষ্ট হইলে ১২৯৩ অব্দে জেলাল উদ্দীন ফিরোজের জনৈক সেনাপতি আবার উহা অধিকার করেন (২৬)। ইহার পরে ভিল্‌শা পুনর্ব্বার হিন্দুদিগের করতলগত হয়। হিন্দুগণ ভারতে মোগল রাজ্য সংস্থাপয়িতা বাবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে আধিপত্য করেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইহা বাবরের পুত্র হোমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হয়। হোমায়ুনের পর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সের সাহ এই স্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পর ভিল্‌শা ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের রাজ্যান্তর্গত হয় (২৭)।

বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে ভিল্‌শাতে উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। অস্মদ্দেশে ভ্যাল্‌শা তামাক বলিয়া যে উৎকৃষ্ট তামাক প্রচলিত আছে, তাহা এই ভিল্‌শাতে জন্মিয়া থাকে। ভিল্‌শা নগরোৎপন্ন বলিয়া ইহা ভ্যাল্‌শা তামাক নামে প্রসিদ্ধ (২৮)। ভিলশার অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি, ৩০ মিনিট এবং দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি, ৫০ মিনিট।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভিল্‌শা বেতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত; মেঘদূতে বিদিশার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বেত্রবতী নদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এই বেতোয়া নদী। মেজর উইলফোর্ডের পৌরাণিক নদীসমূহের তালিকানুসারে বেদস্মৃতি, বেত্রবতী প্রভৃতি পারিপাত্র

(২৩) Or. Mag. Vol viii p clxxxviii.

(২৪) "সংবৎ ১২২৯ বর্ষে বৈশাখসুদি ৩ সোমে। অদ্যেহ আমদণহিলপত্তনে সমস্ত রাজাবলিবিরাজিত মহরাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর শ্রীঅজয়পাল দেব কল্যাণ বিজয়রাজ্যে তৎপাদপদ্মোপজীবি মহামাত্য শ্রীসোমেশ্বরে শ্রীশ্রীকরণাদৌ সমস্ত মুদ্রা ব্যাপারান্ পরিপন্থয়তীত্যেবংকালে প্রবর্ত্তমানে নিজ প্রতাপোপার্জ্জিত শ্রীভাইল্ল স্বামি মহা দ্বাদশক মণ্ডল প্রভুজ্য মানে" ইত্যাদি। প্রস্তর ফলকাঙ্কিত লিপি) Vide Journ. As. Soc. Bengal No. ii 1862. p 125—126—F. E. Hall, Three Sanskrit Inscriptions.

[২৫] Ferishta. i. 211

[২৬] Ibid. i 303

[২৭] Ibid. iv 239

[২৮] Hunter, et supra, 30 Rennell, Hindustan, 233. Comp. Thornton, Gazetteer i 399-400, Hamilton, Hindustan, i 757-758

পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (২৯)। বিষ্ণুপুরাণেও পারিপাত্রসম্ভূত নদীসমূহের মধ্যে বেদস্মৃতি প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয় (৩০)। রাজনির্ঘণ্টতে বেত্রাবতী (পৌরাণিক বেত্রবতী, আধুনিক বেতোয়া) (৩১) নদীর জল সুমধুর, কান্তিপ্রদ পুষ্টিদ প্রভৃতি বিশেষণান্বিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩২)। বরাহ পুরাণে লিখিত আছে, বেত্রাসুর মানুষরূপিণী বেত্রবতী নদীর উদরে জন্মগ্রহণ করে। উক্ত পুরাণে বেত্রাসুরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই নদীর উল্লেখ আছে।*

এই বেত্রাবতী বা বেতোয়া ভূপাল রাজ্যে—ভূপাল নগরস্থ প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকার দেড় মাইল দক্ষিণবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি ১৪ মিনিট এবং দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি ২২ মিনিট। উৎপত্তি স্থান হইতে এই নদী ভূপাল হইতে হোসেঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া সুতাপুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সুতাপুর হইতে ইহা উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩৫ মাইল গিয়াছে। ইহার পর ভিল্‌শার নিকট গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রায় ১১৫ মাইল যাইয়া বুন্দেল খণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে, এবং বুন্দেল খণ্ড হইতে ১৯০ মাইল অতিবাহন করিয়া হামিরপুরের নিকট যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট এবং দ্রাঘিমা ৮০ ডিগ্রি ১৭ মিনিট। বেতোয়ার দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। ইহার অধিকভাগই উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বুন্দেল খণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদীর

---

* অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মহাভারতোক্ত নদীসমূহের তালিকায় বিদিশা নামে একটি নদীর নাম দৃষ্ট হয়। ভিল্‌শার নিকটে "বেস্" নামে একটী নদী বেতোয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। উইলসনের মতে এই নদীই মহাভারতের "বিদিশা।" Vide Wilson's Vishna Purana ii p 150 note 6.

[২৯] As Res viii p 335—Wilford, Essay on the sacred Isles in the west.

[৩০] "বেদস্মৃতি মুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে।"

বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

[৩১] শব্দকল্পদ্রুমে বেত্রাবতী শব্দ দেখ। Comp Wilson's Vishna Purana ii p 147 F E Hall's note.

[৩২] "বেত্রান্যা দধতে জলং সুমধুরং কান্তিপ্রদং পুষ্টিদম্।
বৃষ্যং দীপনপাচনং বলকরং বেত্রাবতী তাপনী॥"

"ততঃ কালেন মহতা নদী বেত্রাবতী শুভা॥
মানুষং রূপমাস্থায় সালঙ্কারা মনোরমম্।"
আজগাম ষতো রাজা তেপে পরমকং তপঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বরাহ পুরাণ বচন।

দৃশ্য আলেখ্যবৎ রমণীয়তায় সুশোভিত। এই রমণীয় দৃশ্য দর্শকমাত্রের হৃদয়েই অনুপম আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। দশার্ণ প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র নদী বেতোয়াতে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বেতোয়ার বিস্তার এক হইতে দুই মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (৩৩)।

বিদিশা ও বেত্রবতী নদী অতিক্রম করিয়া মেঘ নীচৈঃ পর্ব্বতে উপনীত হয়। কালিদাসের বর্ণনানুসারে এই পর্ব্বত কদম্ববনে সমাকীর্ণ। মেঘসমাগমে এই কদম্ব কুসুম বিকশিত হইয়া পর্ব্বতের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কালিদাস কোন্ পর্ব্বতকে নীচৈঃ নামে বিশেষিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ মালব প্রদেশের কোন অনুচ্চ পর্ব্বতই মেঘদূতে নীচৈঃ নামে আখ্যাত হইয়াছে। পুরাণাদিতে নীচৈঃ পর্ব্বতের কোন নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয় না। অধ্যাপক উইল্‌সনের মতে অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ ও অনুচ্চ পর্ব্বতই মেঘদূতের এই নীচৈঃ গিরি (৩৪)। নীচৈঃ (নিম্ন) এই সংজ্ঞাতেও পর্ব্বতের নিম্নত্ব ও ক্ষুদ্রাবয়বত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যক্ষদূত মেঘ নীচৈঃ গিরিতে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক নবজলকণা দ্বারা নগনদী তীরজাত মাগধী কুসুম মুকুল সমূহ আর্দ্র করিয়া পুনর্ব্বার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হয়। যথা,

"বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ নগনদীতীরজাতা-
নি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্য্-
থিকা জালকানি।'

মেঘদূতের এই "নগনদী" পাঠের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ নগনদীর অস্তিত্ব বিলোপ পূর্ব্বক "বননদী" কেহ কেহ আবার বননদীরও অস্তিত্ব বিলোপ পূর্ব্বক নদ নদী অথবা নবনদী পাঠ করেন। পাঠের এই রূপ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন অর্থেরও বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটিত হয়। "বননদী" পাঠে "বনস্থিত নদী সমূহ" এই মাত্র অর্থ বোধগম্য হইয়া থাকে, সুতরাং এতদ্দ্বারা কোন বিশেষ নদীর নির্দ্দেশ হয় না। "নদনদী" অথবা "নবনদী" পাঠ অনেকে তাদৃশ সমীচীন বলিয়া গণনা করেন না। বস্তুতঃ এই পাঠে প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি ও স্ফুটত্ব সম্বন্ধে অনেকটা ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, যে মেঘের গতি এক্ষণে মালব প্রদেশ দিয়া হইতেছে। এই প্রদেশ বিবিধ স্রোতস্বতীতে পরিব্যাপ্ত। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, "মা-

[৩৩] Atkinson, Statistical Descriptive and Historical Account of the N Western Provinces of India, vol i p 391 Comp Thornton, Gazetteer of India, vol i p 378 379 Hamilton, Hindustan vol i p 732.

[৩৪] Wilson's Meghaduta verse 167, note

সব প্রদেশে দুই তিন ক্রোশ গেলেই স্রোতস্বতীসমূহ নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত নদীর জল অতি নির্ম্মল, তটদেশ বিবিধ বন্যবৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল এবং সুরমা ও সুগন্ধ পুষ্পসমূহে সুশোভিত"। (৩৫) আবুল ফজিল মালববাহিনী নদী সমূহের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত কালিদাস কৃত বর্ণনার সম্পূর্ণ একতা লক্ষিত হইতেছে। কালিদাস যেরূপ মালবস্থ নদীর তীরজাত মাগধী কুসুম সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরে আবুলফজিলও সেইরূপ মালবের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার নদীসমূহের তটভূমি মনোহর পুষ্পরাজিতে সমলঙ্কৃত বলিয়াছেন। কালিদাস যে বর্ণনীয় স্থানাদির বিবরণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন এই রূপ সামঞ্জস্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিসর্গপটের ঈদৃশী সূক্ষ্ম বর্ণনায় কালিদাসের গ্রন্থ জগতে অতুল্য।

"নগনদী" পাঠ প্রশস্ত হইলে উহা কোন্ বিশেষ নদীর দ্যোতক এক্ষণে তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। নগনদীর সাধারণ অর্থ পর্ব্বতসম্ভবা নদী। এই অর্থের অনুসরণ পূর্ব্বক সন্নিবেশ স্থান নিরূপণ করিলে পার্ব্বতী নদীর সহিত নগনদীর অভিন্নতা কল্পিত হইতে পারে। (৩৬) পার্ব্বতী ও পর্ব্বতসম্ভবা উভয়ই একার্থবোধক শব্দ, সুতরাং উভয়কেই এক পর্য্যায়ে নিবিষ্ট করিয়া একতরের অবস্থানসন্নিবেশ নির্দ্ধারণ করিলেই অন্যের অবস্থানপরিজ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পারে। পরন্তু কৈলাসযাত্রী মেঘ এক্ষণে যে স্থান অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পার্ব্বতী নদীও ঠিক্ সেইস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল কারণে নগনদীকেই পার্ব্বতীনদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় আমাদিগকে তাদৃশ অসঙ্গত ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না।

(পার্ব্বতী) এই নদী মালব প্রদেশের অন্তর্গত। ইহা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরাংশে উৎপন্ন হইয়া চম্বল নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২২০ মাইল। এই নদী প্রথমে উত্তর পূর্ব্বদিকে ৮০ মাইল যাইয়া পরে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৫ ডিগ্রি ৩৩ মিনিট এবং সঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫০ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট (৩৭)।

গোয়ালিয়র রাজ্যেও পার্ব্বতী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহা সিপ্রিনগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর দিকে ৪০ মাইল গিয়াছে, পরে পূর্ব্বদিকে ৫০ মাইল যাইয়া সিন্ধুনদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৩১

[৩৫] Gladwin's Ayin Akbari, vol ii p 43
[৩৬] Vide Wilson's Meghaduta, verse 171 note
[৩৭] Thornton. Gazetteer of India vol iv p 84

মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি ৪৬ মিনিট। এই পার্ব্বতী নদী মালববাহিনী পার্ব্বতীর পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে (৩৮)। যাহাহউক, এই নদীর সহিত মেঘদূতের নগনদীর কোনও সংশ্রব নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই নদীর উৎপত্তি স্থান সিপ্রিনগরের নিকটবর্ত্তী। সিপ্রি গোয়ালিয়র নগরের ৬৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং ইহা মেঘ এক্ষণে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বহুদূরে পড়িতেছে। যদি পার্ব্বতীর সহিতই নগনদীর অভিন্নতা কল্পিত হয়, তাহা হইলে গোয়ালিয়রস্থ পার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে মালবস্থ পার্ব্বতীকেই নগনদী বলা অধিকতর সঙ্গত।

পুরাণাদিতে পারা নামে একটি ক্ষুদ্রনদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩৯) মেজর উইলফোর্ড সিন্ধুসম্মিলিত পার্ব্বতীকেই পারা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(৪০) অধ্যাপক উইলসনের মতে আবার মালবের পার্ব্বতীই পুরাণে 'পারা' নামে আখ্যাত হইয়াছে।(৪১) এইরূপ উভয় পার্ব্বতীকেই 'পারা' নামে নির্দ্দেশ করা কতদূর সঙ্গত, বলিতে পারি না। মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যানে পারা নদীর উল্লেখ আছে। এই পারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদের প্রান্তবাহিনী। পূর্ব্বে এই নদী কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে পারা নামে অভিহিত হয়।(৪২) হিমালয়ের প্রস্থে বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হইলে মেনকা সদ্যোজাত কন্যারত্নকে মালিনী নদীর তীরে রাখিয়া স্বস্থানে গমন করে। শকুন্তলা এই মালিনীতটবর্ত্তী মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিতা হয়েন। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে হিমালয় প্রদেশে কণ্বের আশ্রম ছিল।* সুতরাং মেনকার বিলাসক্ষেত্র পারা-তীরবর্ত্তী

[৩৮] Ibid Ibid
[৩৯] As Res vol viii p 335
[৪০] As Res vol xiv p 408
(৪১) Wilson's Aishna Purana Ed by Hall vol ii p 147 note 5
[৪২] শৌচার্থং যো নদীং চক্রে দুর্গমাং বহুভির্জলৈঃ।
যাং তাং পুণ্যতমাং লোকে কৌশকীতি বিদুর্জনাঃ॥
বভার যত্রাস্য পুরাকালে দুর্গে মহাত্মনঃ।
দারান্মতঙ্গো ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি র্ব্যাধতাং গতঃ॥
অতীতকালে দুর্ভিক্ষে অভ্যেত্য পুনরাশ্রমম্।
মুনিঃ পারেতি নদ্যা বৈ নাম চক্রে তদা প্রভুঃ॥
মহাভারত। আদিপর্ব্ব। সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়। ২৯২৩।২৯২৫।২৯২৬।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কেহ কেহ গঙ্গার অন্যতম করদা কুশী নদীকে "কৌশিকী" নামে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু মহাভারতের সহিত এইরূপ নির্দ্দেশের একতা লক্ষিত হয় না।

* সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ হৈমবত প্রদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম যে ইহারই সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এই উপাখ্যানানুসারে একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী লাডক প্রদেশে পারা নামে একটী নদী আছে। এই নদী পারাটি নামেও উক্ত হইয়া থাকে। ইহা পশ্চিম হিমালয়ের পর গিরিসঙ্কটের উত্তর পূর্ব্বাংশে উৎপন্ন হইয়া ১৩০ মাইল গমন পূর্ব্বক শতদ্রুর কবদ স্পিটি নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।(৪৩) আমাদের মতে মহাভারত ও পুরাণাদির 'পারা' লাডক বাহিনী এই 'পারা' অথবা 'পারাটী' নদী। মহাভারতের বর্ণনানুসারে মহাভারতীয 'পারা' নদী নিরূপণ করিতে হইলে লাডকের পারাকেই নির্দ্দেশ করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। এই নদীর সন্নিবেশস্থানের সহিত মহাভারতীয উপাখ্যানের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে,দাক্ষিণাত্যেও 'পারা' নামে একটি নদী আছে। ইহা পশ্চিম ঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া আহম্মদ নগর দিয়া গোদাবরীর সহিত সম্মিলিত হইযাছে।

ইতালীতে একটি প্রবাদ আছে, "যে রোম দেখে নাই,সে কিছুই দেখে নাই।" মেঘদূতের কবিও এই প্রবাদের অনুরূপ ধারণাবিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া মেঘকে নগনদীর তট হইতে উজ্জয়িনীপথে পরিচালিত করিযাছেন। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে উজ্জয়িনী কবির আবাস ভূমি, উজ্জয়িনীর গৌরব, উজ্জয়িনীর বৈভব ভারতীয় ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ঈদৃশ সৌভাগ্য সম্পত্তির বিলাস-ক্ষেত্র সন্দর্শন না করিলে কিছুই দেখা হয় না ভাবিয়া কবি যক্ষ-মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসারিত করাইযাছেন :—

"বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যো ত্তরাশাং

(বর্ত্তমান সুঘ) জনপদ হইতে মতিপুলো নগরে উপস্থিত হয়েন। মসুর ভি ভি এন্ ডি সেণ্টমার্টিনের মতে হুহেন্থ সাঙ্গের এই মতিপুলো পশ্চিম রোহিলখণ্ডের মডাবর নগর। এই বিষয় প্রসঙ্গে জেনারেল কানিংহাম লিখিয়াছেন :—"সেণ্টমার্টিন যে মডাবরের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারই অধিবাসিগণ মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত ইরিনিসেস্ (Erineses) নদীর তীরবাসী মাথে (Mathæ) জাতি হইতে পারে। যদি ইহাই হয় তাহা হইলে এই ইরিনিসেস্ নিঃসন্দেহ মালিনী নদী। ইহারই তীরবর্ত্তী পবিত্র নিকুঞ্জে শকুন্তলা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মডাবর পশ্চিম রোহিলখণ্ডে অবস্থিত। ইরিনিসেস্ ইহার প্রান্ত বাহিনী হইলে উক্ত নদী নিঃসন্দেহ হিমালয়ের গর্ভ হইতে এই নগরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। যদি কানিংহামের অনুমান সমূলক হয়, তাহা হইলেও এই ধারণানুসারে মালিনীতটশোভী কণ্বের আশ্রম হৈমবত প্রদেশবর্ত্তী হইতেছে। Vide Cunningham's Ancient Geography of India, p 348 350

[৪৩] Cunningham, Ladak and Sourrounding Countries p 131 Domp Thornton, Gazetteer of India p 83

সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরু-
জ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈ স্তত্র পৌরা
ঙ্গনানাং,
লোলাপাঙ্গৈ র্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চি-
তোঽসি ॥"

তুমি উত্তরদিক্ যাত্রী। সুতরাং উজ্জয়িনীর পথ যদিও তোমার পক্ষে বক্র হইবে, তথাপি উক্ত নগরীর অট্টালিকাসমূহের উপবিভাগে কিয়ৎক্ষণ না থাকিয়া যাইও না। যদি তুমি উজ্জয়িনীর অঙ্গনাগণের বিদ্যুল্লতার স্ফুরণহেতু চমকিত ও চঞ্চল কটাক্ষলোচন দেখিয়া প্রীত না হও, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণ বৃথা।

ভারতমানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, উজ্জয়িনী মালববাহিনী পার্ব্বতীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং এই নদী হইতে কৈলাসপর্ব্বতে যাইতে হইলে উজ্জয়িনী গন্তব্যপথে পড়ে না। এই জন্যই উহার পথ এ স্থলে বক্র বলিয়া সূচিত হইয়াছে। যাহা হউক এইরূপে মেঘের গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইল, যাহাকে ক্রমাগত উত্তরবর্ত্তী পথ অতিবাহন করিতে হইত, তাহাকে এক্ষণে উজ্জয়িনীতে যাইবার জন্য পশ্চিমাভিমুখ হইতে হইল। নগনদী হইতে উজ্জয়িনীতে যাইতে হইলে যে স্থান দিয়া, যাইতে হইবে, কবি পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ
সন্নিপত্য"
+ + বেণীভূত প্রতনুসলিলা সাবতী
তস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।"

পথিমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা হইতে জলগ্রহণ করিও। + + ঐ সিন্ধুনামক নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর জলধারা বেণীর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং তটসঞ্জাত বৃক্ষহইতে জীর্ণ পত্র পতিত হওয়াতে পাণ্ডুবর্ণ।

মল্লিনাথ এই নির্ব্বিন্ধ্যাকে বিন্ধ্যপর্ব্বতনির্গত নির্ব্বিন্ধ্যানামক নদী বলিয়া পরবর্ত্তী 'সিন্ধু' কে উহার নদীত্ববোধক সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ নির্ব্বিন্ধ্যা নামক সিন্ধু (নদী)। (৪৪) অধ্যাপক উইলসন্ এতদুভয়কে পৃথক্ করিয়া প্রথমটিকে বিন্ধ্যপর্ব্বতনির্গতা কোন অপরিচিত নদী এবং দ্বিতীয়টিকে সম্ভবতঃ সাগরমতী নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(৪৫) এই মতদ্বয় কতদূর সঙ্গত একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পুরাণে নির্ব্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু এই উভয় নদীরই উল্লেখ আছে। প্রথমটি বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত, দ্বিতীয়টি পারিপাত্রোদ্ভূত।(৪৬) ভারতবর্ষের

---

[৪৪] "অসৌ পূর্ব্বোক্তা সিন্ধুঃ নদী নির্ব্বিন্ধ্যা [স্ত্রী নদ্যাং না নদে সিন্ধু'র্দেশভেদেঽম্বুধৌ গজে ইতি বৈজয়ন্তী।]" মল্লিনাথের ব্যাখ্যা।

[৪৫] Wilson's Meghaduta verse 191, note

[৪৬] As Res vol viii p 335

আধুনিক ভূবৃত্তান্তে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে কোনও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সিন্ধু নামে একটি নদী মালবপ্রদেশের ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া ২৬০ মাইল গতির পর যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই সিন্ধু নদীকে অনায়াসে পৌরাণিক সিন্ধু বলা যাইতে পারে। যাহাহউক, এই নদী পার্ব্বতী নদীর পূর্ব্বে মেঘের গন্তব্য পথের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। সুতরাং ইহার সহিত মেঘদূতোক্ত সিন্ধুর কোনও সংশ্রব নাই। পার্ব্বতীর পশ্চিমবর্ত্তিনী নদীর মধ্যে কালীসিন্ধু নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। এই নদী বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া চম্বল নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা পার্ব্বতীর পশ্চিম ও উজ্জয়িনীর পূর্ব্ববাহিনী। সুতরাং পার্ব্বতী হইতে উজ্জয়িনীতে যাইতে হইলে এই নদী অতিক্রম করিতে হয়। আমাদের মতে এই কালীসিন্ধুই মেঘদূতের সিন্ধু নদী। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া ইহা নির্ব্বিন্ধ্যা এই বিশেষ সংজ্ঞায় বিশেষিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে মল্লিনাথের মতের সহিত এই বিশেষ সংজ্ঞায় আমাদের মতের একতা লক্ষিত হইতেছে না। মল্লিনাথ প্রচলিত অভিধানের অনুসরণপূর্ব্বক সিন্ধু শব্দের অর্থ নদী করিয়া ঐ নদী নির্ব্বিন্ধ্যা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান কালীসিন্ধুকেই সিন্ধু নামক নদী বলিয়া নির্ব্বিন্ধ্যাকে (বিন্ধ্য পর্ব্বত নির্গতা) উহার বিশেষ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতেছি। এক্ষণে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে কোন বিশেষ নদী বর্ত্তমান না থাকাতে আমরা মল্লিনাথের ব্যাখ্যা বিপর্য্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অধ্যাপক উইলসন অনুমানবলে সাগরমতীকেই সিন্ধু নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ আমাদের মতে সমীচীন বোধ হইতেছে না। সিন্ধু হইতে সাগরমতী নাম উদ্ধার করা নিরবচ্ছিন্ন কষ্টকল্পনামূলক। বিশেষতঃ যথাস্থানে 'সিন্ধু' নামক নদী বর্ত্তমান থাকাতেও দূরতরসম্বন্ধবিশিষ্ট নদ্যন্তরের সহিত তাহার অভেদ কল্পনা করা সর্ব্বথা অসঙ্গত।* পরন্তু পুরাণাদিতে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে যে নদীর উল্লেখ আছে, তাহাকে বর্ত্তমান কালীসিন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নয়। পুরাণবর্ণিত স্থানাদির মধ্যে পরস্পরের সহিত পর-

বিষ্ণুপুরাণের মতে নির্ব্বিন্ধ্যা ঋক্ষপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ।
বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্যায়।

* সাগরমতী নদী কোথায় আছে, জানি না। আধুনিক ভূগোল ও মানচিত্রাদিতে শবরমতী নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। এই নদী রাজপুতানা হইতে উৎপন্ন হইয়া গুজরাট দিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

স্পরের সামঞ্জস্য নাই। যে নদী (মন্দাকিনী) বায়ুপুরাণে ঋক্ষপর্ব্বতোদ্ভব বলিয়া নিরূপিত আছে, মহাভারতে তাহাই চিত্রকূটোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।(৪৭) আমরা যে নদীর বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারও উদ্ভবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক পুরাণ ইহা ঋক্ষসমুদ্ভূত বলিয়াছেন, অন্য পুরাণ আবার বিন্ধ্যাদ্রিনির্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উৎপত্তিস্থানের ন্যায় নদীর নাম সম্বন্ধেও এইরূপ গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে নদীর নাম এক পুস্তকে চর্ম্মণ্বতী লিখিত আছে, অন্য পুস্তকে তাহা চৈত্রবতী আবার পুস্তকান্তরে বেত্রবতী লিখিত হইয়াছে। এক পারানদীও বিভিন্ন স্থলে 'বাণী' এবং 'বেণা' নামে উক্ত হইয়াছে।(৪৮) লিপিকরপ্রমাদ বশতঃই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, পৌরাণিক ভূগোল যখন এইরূপ গোলযোগে পরিপূর্ণ, তখন পুরাণের মতানুসারে নির্ব্বিন্ধ্যা নামে একটি বিশেষ নদীর অস্তিত্ব নিরূপণ করা একরূপ অসাধ্য। এই জন্যই আমরা মধ্যভারতের নদীসমূহ হইতে নির্ব্বিন্ধ্যা নাম উঠাইয়া লইয়া কালিদাসপ্রোক্ত সিন্ধুকেই (বর্ত্তমান কালী সিন্ধু) বিন্ধ্যপর্ব্বতনির্গতা বলিয়া 'নির্ব্বিন্ধ্যা' আখ্যায় বিশেষিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সিন্ধু (বর্ত্তমান কালী সিন্ধু)—এই নদী বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদিকে ২২৫ মাইল গমন পূর্ব্বক চম্বল নদে পতিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৬ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি, ২৬ মিনিট, এবং পতন স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি, ৩০ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি ২৩ মিনিট। এই নদীর গতি মধ্যভারতের গিরিসঙ্কট দিয়া হইয়াছে। এই গিরিসঙ্কট মধ্যবর্ত্তিনী কালী সিন্ধুর দৃশ্য অতি মনোহর। কর্ণেল টড স্ব প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে এই নয়নরঞ্জন দৃশ্যের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।(৪৯) লডকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী কালী সিন্ধুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী অতি গভীর ও খরস্রোতঃ হইয়া থাকে।(৫০)

ছোট কালীসিন্ধু নামে আর একটি ক্ষুদ্র নদী চম্বল নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর সম্মিলন স্থান সিপ্রার সঙ্গমস্থলের ৮ মাইল উত্তরবর্ত্তী। পূর্ব্বোক্ত কালীসিন্ধু হইতে প্রভেদ করিবার জন্য সাধারণে এই ক্ষুদ্র নদীকে ছোটকালী সিন্ধু বলিয়া থাকে।(৫১)

---

[৪৭] Wilson's Vishna Purana Ed by Hall voi ii p 153 note 6
[৪৮] Ibid, p 147, note 5
[৪৯] Tod's Rajsthan, vol ii p 736-737
[৫০] Thornton, Gazetteer of India vol iii p 21-22
[৫১] Ibid, vol i p 778

কৃষ্ণকান্তের উইল।

দ্বিতীয় বৎসর।*

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ পরদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজন-মধ্যে প্রায় কেহই কখন গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—সুতরাং সেখানে বহির্ব্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সম্বাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুইজনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছিলেন। সেরূপ লোক কখন সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওই করিতে লাগিল।

সোণা জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি কাকে খুঁজেন?"

নি। তোমাদেরই। বাবুকে সম্বাদ দাও, যে একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? একটী ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত, যে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সম্বাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনাসম্বাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁফরে পড়িল। বলিল "না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সম্বাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

---

* গত সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যে সকল ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় বৎসরের ঘটনা। কাপিতে "দ্বিতীয় বৎসরই" লিখিত ছিল। কিন্তু মুদ্রাকরের প্রেতগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে "প্রথম বৎসর" আদেশ করিয়াছেন। আমি চরিতার্থ হইয়াছি—পাঠকগণও হইয়া থাকিবেন।

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো ছিলেব মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া, উপরে সম্বাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে,তাহা অতি মনোরম। নিশাকব সোণাকে বলিলেন, "আমি এই ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি কবিও না—যখন সম্বাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকব সোণাব হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুব কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসব ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকবের সম্বাদ কিছুই বলিতে পাবিল না। এদিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে কবিতে নিশাকব একবাব উর্দ্ধদৃষ্টি কবিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

বোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে এ দেশেব লোক নয়। বেশভূষা বকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে, যে বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ্ ফরশা —কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ্—আ ম'র। কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয় —সেখানকার সবাইকে চিনি। ওব সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি— আমি ত তখন গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে উর্দ্ধদৃষ্টি কবাতে চাবি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না,তাহা আমবা জানিনা—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা কবি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এমত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

এমত সময়ে রূপো, বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে একটি ভদ্র লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা কবিয়া খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধিব সাহায্যে বলিল,

"তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।"

বাবু বলিলেন,"তবে বল গিয়া সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ কবিলেন, যে বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ কবিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি কেন আপনিই উপবে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই,নিশাকব, গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী, এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো, তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল, যে এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল, বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি কে?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহ নগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিবা ছিলেন যে গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমক চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয় গুলি পত্তনী বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতে ছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুরাব শুণ্‌চো না কি?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমি কো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবু সাহেব, তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয় গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভি-

প্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।”

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর। প্রায় দুই বৎসর হইল।

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন।—পুনরপি বলিলেন, “আপনার যদি মত হয় তবে একখণ্ড লিখিয়া দিন যে আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।”

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথা গুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন।

“আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর—আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমার কাছে হইতে লিখন লওয়া অনাবশ্যক—আমিও কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।”

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, “কিছু গাও।”

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি গায়িব?

“যা খুসি।” বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না। সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, “আজ আমি কিছু ক্লান্ত হইয়াছি।” তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গত সকল ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থ বোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণাচাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল, সোণাকে বলিলেন, “আমি এখন একটু ঘুমাইব—আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।”

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।—তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই!

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হ'লে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে পরদার পাশ হইতে একটী বড় পটল চেরা চোখ তাঁকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল, যে নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই, রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইষারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল,

"যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিস দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ ত দেখ্‌ছি টাকা রোজগারের দিন। গরীব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল,

"যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সম্বাদ আমি কখন পাই না—তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা কর্‌বো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখ্‌তে পান। আর কেহ না দেখ্‌তে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পে'লেই যাব। যদি না বস্‌তে চায়, তবে দুটো কাকুতি মিনতি করিস্।

রূপো বখ্‌শিসের গন্ধ পাইয়াছে—যে আজ্ঞা বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কপাট, খিল, কবজা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি ?"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি ?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন। রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মুনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়াছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে ?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখন আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মাঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন কোথায় গেল দেখি ? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মাঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা হবে কি বল দেখি ?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন,

"এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে।—অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মাঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না। আমি চলিলাম।"

রূপা দেখিল, পাঁচ টাকা হাত ছাড়া হয়। বলিল, আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না।

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের

কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার ঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সম্বাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুর মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর, রোহিণীর কাছে গিয়া, নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষে নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে রোহিণীর মনের ভাব এই। রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত, যে তাহার সম্বাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যা হইবে এমত সম্বাদ আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচা আঁচী, হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্—পটল চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল যে আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাস হানী এক কথা—আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ, ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়।—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ, এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃতা হইল, যে প্রদোষকালে অবকাশ হইলেই, গোপনে গিয়া চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্যতাতের সম্বাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া, হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন,

"তোমরা বাবুর কাছে কত দিন আছ?"

সোণা। এই—যতদিন এখানে এসেছেন ততদিন আছি।

নিশা। তবে অল্প দিনই? পাও কি?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা। খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে।"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়বে?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাকরুন্ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত?

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কায; পারবে কি?

সোণা। ভাল কায হয় ত পারবনা কেন।

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কায নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাকরুনটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে তোমার মুনিবের চোক্ ফুটায়ে দিই, তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার?

সোণা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখবে ঠাকরুনটী ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে, তার পরে আমার সঙ্গে যুটো।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগাল কুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে, কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তরমধ্যে কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে, ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস। একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুকন্যার জীবন রক্ষার্থ একার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই

বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপপুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত, তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে, রোহিণী আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল "তুমি কে?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল "আমি রোহিণী"।

নিশা। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারিনে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখ্‌তে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে ক আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে রে?"

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিলেন যে গোবিন্দলাল।

তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিকম্পিতস্বরে বলিল,

"ছাড়। ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি এই বাবুকেই না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!"

গোবিন্দলাল বলিল, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।"

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদ্‌জি বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, "রোহিণি!"

রোহিণী বলিল, "কেন!"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি ?

গো। তুমি আমার কে ?

রো। কেহ নহি, যত দিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম ? তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম ?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, " রোহিণি, দাঁড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতরস্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাইব কেন ? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন,

"কেমন, মরিতে পারিবে ?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন সে অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল " মরিব কেন ? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন। ইঁহাকে কখন ভুলিব না কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন ? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন ?"

রোহিণী বলিল।

"মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।"

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না মারিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না,আর তোমার পথে আসিব না। এখনি যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলাল পিস্তলের ঘোঁড়া টানিলেন। শব্দ হইল, গোলা ছুটিল, রোহিণীর মস্তক ভেদ করিল। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহহইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ, রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

কমলাকান্তের পত্র।

পূজ্যপাদ.

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺ নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশনবীশ, জুয়াচোর লোক আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটী তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই কিন্তু আমি জানি ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এতদিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটী যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথতৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধুজনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে ইহা বঙ্গীয়

লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে কাগজ খানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন ?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্যবন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে শকারের উপর যে রেফটি আছে বোধ হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম ; শব্দটা "বঙ্গ দশন," অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "ইহার অর্থ পূর্ব্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি, অর্থাৎ A Guide to Eastern Bengal" এইরূপ বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে, পারিলাম যে বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তর গুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে ?

অতএব হে বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়। অবগত হউন যে আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন "শ্রীশ্রী৺ নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসি বাবু শ্রীশ্রীঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে তিনি সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদ পদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন পথে হইয়াছে তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আর আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দবস্ত করিতে পারেন ? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোসনবিস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিং পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী,) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দর কার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রশক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্বরসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন না মন দরে দিবেন? আর যদি গুরুবিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন তাহার কি প্রকার অলঙ্কারসমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যান ভাল বাসেন, না ফুট নোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশান সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যান, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরুবিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরুবিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোসনবিশ মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,* তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁশ গলায় দিয়াছেন। গুরুবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনিমেগেজিন হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ড স্মিথকৃত এনিমেটেড নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপন পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে শুনিয়া, লোকে ধন্য২ করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন চরিত দশপনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালাসাহিত্যসমালোচন-

* ইউ—টিল —ইটি—আই।

বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন (বলেন কিনা, তাহা ঈশ্বর জানেন) যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতী-মাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি গুরুবিষয় ছাড়িয়া লঘু-বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোষনবিশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরস্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহঃ এবং শেষ অঙ্কে শশিরস্তা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাযিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোষনবিশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে বাজে নবেল না লিখিয়া ডন কুইক্সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এপর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি?

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোষনবিশের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোষনবিশি রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি

ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না।

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন না হউন, আমি রাজি। তবে আর একবার লেখ দেখি লেখনি! চল দেখি, পাখীর পাখা। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্! আর কি সে তান মনে আছে? না তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুনেধরা বাঁশী—আমি ঘুনেধরা—আমি ঘুনেধরা কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থ চিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেই রূপ আবার মনের লুকান কথা গুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স্ ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গাবাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুকুব রাগিনী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না! ছি!—কেবল লোকহাসান।

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসিবাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন গোয়ালিনী নাই—তাহার সে মঙ্গলা গাভী নাই। সত্য বটে আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় একমাত্র। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি—যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধন গুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবেনা কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন?

ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম—কাঁদিয়া মরিব। কি লিখিব, সম্পাদক মহাশয় আজ্ঞা করিবেন। সে রস আর নাই—কিন্তু আজিও আছি

নিতান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের

জীবনী সমালোচনা।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব—মিলপ্রদত্ত শিক্ষা।

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, প্রথম প্রস্তাবে আমরা বুঝাইয়াছিলাম, যে আমাদের মানসিক বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল—সুতরাং মিলের জীবনচরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, যে মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাবিষ্কৃত চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। কিন্তু আমার তৎপক্ষে শক্তি ও সময়ের অভাব। ভরসা করি, কোন অধিকতর ক্ষমতাশালী লেখক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি এক্ষণে কেবল যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক ও লেখক, উভয়ের তুষ্টিবিধান করিব।

প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি মনোবৃত্তিগুলি দ্বিবিধ—জ্ঞানার্জ্জিনী এবং কার্য্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যলোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ

* জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রণীত। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনিঙ লাইব্রেরি। ১৮৭৭

অর্দ্ধেক পাইয়াছে—অর্দ্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক,জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন—এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্বসাধক হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটি উদ্দেশ্য ও ফল —প্রথম, জ্ঞানের অর্জ্জন, দ্বিতীয় বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তিবৃদ্ধি। বিদ্যালয়াদিতে যে শিক্ষা হয়, সচরাচর তাহাতে কেবল জ্ঞানার্জ্জনই হইয়া থাকে। বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষার তাদৃশ উদ্দেশ্য নহে। জন্ মিলের পিতা জেম্‌স্ মিল সেই জন্য পুত্রকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ জেম্‌স্ মিল স্বয়ং জ্ঞানী, মার্জ্জিতবুদ্ধি, চিন্তাশীল পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য পুত্র, তাঁহার শিক্ষায় অতি অল্পবয়সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাশীল এবং সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ—যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের জীবনবৃত্ত হইতে তাহা অধ্যয়ন করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মিল গুরুদত্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সেই শিক্ষা সম্বন্ধে মিল স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাই যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিব। মিল বলেন,

"পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমার দ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে,—তাহা আমার গুণে নহে —পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আ-

মার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল—পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন—তাহারই ফল।

“শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটি মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনী না হইয়া বরং ম্লানভাব ধারণ করে। নিজের মত, ও নিজের চিন্তার পরিবর্ত্তে—পরের মত, ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণশক্তির সংমার্জ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তাশক্তি অচিরকাল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

“আত্মগরিমা বাল পাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহচর্য্যে অনেকের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষসূচক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি আমা অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না, যে আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এইমাত্র বোধ হইত যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক

বশতঃই সেই বালকই কেবল রীতি মত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন চিন্তাতেও আপনমনে বলি নাই যে আমি এত বড লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিযা ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র—যে আমি পাঠনা দ্বারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না—সুতরাং আমি পডা শুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম।"

তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরু দত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র—আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ—কাণ্ড ও শাখাপল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হই। মিলের জীবনীতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট—জেম্‌সমিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রোবক কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা, তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষ পত্নী, সেই অদ্বিতীয়া রমণীপ্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অতিশয় মনোহর।—আমার ইচ্ছা করে এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তাকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালির গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ সে আরও ভাল।

জ্ঞানার্জ্জিনী বৃত্তি গুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্য্য কারিণীবৃত্তি গুলির অনুশীলনের কথা সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার।—জ্ঞানার্জ্জিনীবৃত্তি সম্বন্ধে মিলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কার্য্যকারিণীবৃত্তি গুলি সম্বন্ধে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সেই অসম্পূর্ণতা হেতু মিলের ন্যায় মার্জ্জিতবুদ্ধি মহদাশয় পণ্ডিতের যে মানসিক শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাদৃশ অধ্যয়নীয় তত্ত্ব আর কিছুই দেখি না।

বৃত্তি গুলির কার্য্যকারিণী বৃত্তি নাম দিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই। যাহাকে ইংরেজেরা "Active faculties" বলেন, অনেকে কার্য্যকারিণী অর্থে তাহাই বুঝিবেন। তাহাতে সকলটুকু বুঝায় না। এই জন্য অনেকে এই গুলিকে ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি বলেন। অন্তর্জগতের সঙ্গে বৃত্তি গুলির যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ করিতে গেলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাম মন্দ হয় না।—কিন্তু বহির্জ্জগতের সঙ্গে উহাদের যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ করিলে মনোবৃত্তি গুলি বিভাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জিনী এবং কার্য্যকারিণী এই দুই নাম দিতে হয়। এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন্ বৃত্তি গুলির কথা বলিতেছি। যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকে এই সকল "কোমলতর" বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—নামটী বিশেষ দূষণীয়। বৃত্তিগুলি সুখদায়িনী বলিয়া কোমল নাম পাইয়াছে—নহিলে উহাদিগের আর কিছু কোমলতা নাই।

মিল নীতিশাস্ত্রে অশিক্ষিত হয়েন নাই। তিনি পৃথিবীতলে একজন প্রধান নীতিবেত্তা এবং তাঁহার জীবনে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু নীতিজ্ঞানের উপার্জ্জন কার্য্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলন নহে—সেও জ্ঞানার্জ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন মাত্র। "পিতামাতাকে ভক্তি করিও" এই নৈতিকতত্ত্ব যে শিখিয়াছে, সে, নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে অত টুকু জ্ঞান উপার্জ্জিত করিয়াছে। যে সেই নৈতিকসূত্রকে কার্য্যে পরিণত করিয়া পিতামাতাকে ভক্তি করে, সে একটী পুণ্য কর্ম্ম অভ্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু সে মানসিকবৃত্তির অনুশীলন কিছুই করে নাই। কার্য্যের অভ্যাস, এবং কার্য্যকারিণীবৃত্তির পরিমার্জ্জন স্বতন্ত্র।

কার্য্যকারিণীবৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনের একটী শ্রেষ্ঠ উপায় কাব্যাদির অনুশীলন। যদি মনের এই ভাগের পরিপুষ্টি শিক্ষার মধ্যে ন্যস্ত করিতে হয়, তবে শিক্ষার মধ্যে কাব্যের একটী প্রধান স্থান পাওয়া আবশ্যক। মিলের শিক্ষামধ্যে কাব্য স্থান পায় নাই। জেমস্ মিল কবিত্ব বুঝিতেন না—কাব্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সম্প্রদায়ের ইংরেজের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালিগণ কাব্যকে "লঘুসাহিত্য" বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন জেমস্ মিল সেই সম্প্রদায়ের ইংরেজ ছিলেন—অর্দ্ধমাত্রার মনুষ্য। সুতরাং জন্ মিল সে শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শিক্ষার সেই অসম্পূর্ণতানিবন্ধন চিন্তাশীল এবং উৎকর্ষাভিলাষী জনষ্টুয়ার্ট মিলের ঘোরতর মানসিক শঙ্কট উপস্থিত হইল। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রলেখকের সেরূপ শঙ্কটের অতি অল্প সম্ভাবনা কিন্তু মিলের ন্যায় মনুষ্যের তাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই বৃত্তান্ত আমরা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সংশ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তাসকল অতিশয় পরিপক্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসরকালে তাঁহার

চিন্তাসকল বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল বেন্থামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। এতদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গলসাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা—তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ—এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশে এক খান চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখ সূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, "মনে কর তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল, তুমি যে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্ত্তেই সংসাধিত হইল, ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?" সহসা অনিবার্য্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল "না!" এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য,—তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্যসংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরি কর্ণধার শূন্য হইল। মিল ভাবিলেন এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্য্যে যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভনপরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূহিত গভীর বেদনাকে বিস্মৃতিজলে ভাসাইতে পারিল না। এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তকরাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাঁহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একবারে পর্য্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত

করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, অপরের নিকট তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন না। কোন নিবার্য্য বিপদ পড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু একপ অনিবার্য্য কাল্পনিক বিপৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা নিতান্ত উপহাসাকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল; পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সে শিক্ষার পরিণাম একপ বিষময় হইবে। মিল এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাঁহার রোগ একপ্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃচিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

"মিল্ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল; আমাদের যে কোন বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোন বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে সুখ এবং কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে এই এই কার্য্য করিলে আমরা সুখী এবং এই এই কার্য্য করিলে আমরা অসুখী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্য্যের সহিত দুঃখ ও কতকগুলি কার্য্যের সহিত সুখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের একপ শিক্ষাজনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেমস্ মিল সর্ব্বদা বলিতেন যে, যে কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ, এবং যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সম্বদ্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য। মিল পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেমস্—প্রশংসা ও নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিস্বরূপ যে পূর্ব্বপরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল

করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে এই রূপ বলপূর্ব্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্য্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটীই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক, সুতরাং মনুষ্যের কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ ও দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনাবিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসম্বন্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ দুঃখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল গ্রন্থির ছেদসাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বশবর্ত্তী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের অবতারণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি সকল তদীয় বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্য্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন জীবন নূতন ভাবে পুনরারম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

"১৮২৬—৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠনা তাঁহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাদিগের

তর্কসভার জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত,মনের স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, মিলের কার্য্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার নিকট দিন দিন ভার বোধ হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল "যখন জীবন এরূপ দুর্ভর বোধ হইতে লাগিল তখন আর আমি ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব?" তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল "তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক বৎসর কাল অতীত না হইতেই আশাসূর্য্যের একটি সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্ম্মনটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে—বাল্যাবস্থায় মার্ম্মনটেলের পিতৃবিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপ শ্রবণে ও দুরবস্থা দর্শনে মার্ম্মনটেলের হৃদয়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্ত্তৃক পরিবার বর্গের সান্ত্বনা—এই সকল ঘটনা লিখিত ছিল সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিযুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অনুভূতি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য নহে—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্য্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে চিন্তামেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েক বার তাঁহার অন্তর এই চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ের ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতর দুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই।

"এই সকল ঘটনায় মিলের মতে দুইটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বে এই মত ছিল যে আত্মসুখই মানবজীবনের সমস্ত কার্য্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান মতে আত্মসুখ—কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মকার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্মসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে না; পরের দুঃখ বিমোচনে, পরের সুখ বর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাক, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। পরের দুঃখবিমোচন ও পরের সুখবর্দ্ধন তোমার গন্তব্য স্থান হউক; পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত সুখ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কখন আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ সুখ,—ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে 'আমি কি সুখী?' তখনই সুখ অপসৃত হইবে। ফলতঃ আত্ম-বহির্ভূত কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ হইল। মিলের মতবিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা এই;—এত দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধানে উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা করে না বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও

বাইরন পাঠ করেন। মিল্ স্বয়ং যে দুঃখপ্রবণতা (Melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চাইল্ড হেরল্ড ও ম্যান্‌ফ্রেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং বাইরন পাঠে তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা বিশেষ রূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাববর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; স্বভাবসৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে প্রকৃতি পর্য্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। ওয়ার্ডসওয়ার্থই তাঁহার কবিত্ব-শূন্য হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন। এবং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা কবি সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।"

আমরা এইখানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ দোষ সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব —উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্ল্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অতি বিরল। তার পর, তাহার সঙ্কলন ও গ্রন্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্রবাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি। এবং ইহা হইতে যুবকগণ মহতী শিক্ষালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় বৎসর।

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সেস্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃত দেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া, গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন আর প্রবেশ করেন নাই। একরাত্রি একদিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কতদূরে গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্‌দিকে পলাইয়াছেন কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখন নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন তাহা ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত জানিত না। দারগা কিছু দিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিব ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠি পত্র তিনি বাড়ী তল্লাসিতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে নিশাকর দাস সে করাল কাল সমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, এক্ষণে

নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন "কায ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনী হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন, ভয় গোবিন্দলালের জন্য, কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন দারগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া তথাচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় বৎসর।

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন তিনি তাহা আপনপত্নীর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমর জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর সঙ্গে সেই সকল কথার আন্দোলন করিতেছিল। যামিনী বলিতেছিল, "এখন, তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তাহ'লে বোধ হয় কোন আপদ থাকিবে না।"

ভ্র। আপদ থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্র। শুন নাই কি যে হলুদগাঁয়েও পুলিষের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জনে না কি প্রকারে?

যামিনী। তাই না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন পুলিষ টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে সে পরামর্শ দিব? বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন নাকি?"

যামিনী। পুলিষের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া

যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন। কিন্তু আমার বোধ হয় গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের বাবু,এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্যই বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন,এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদিই আসেন।

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয় তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন,ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায় ভগিনি তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি তিনি কোন দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমাদের অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি না হয় আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন?"

যা। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে—আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর, মানসচক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম বৎসর।

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না। কোন সম্বাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল গোবিন্দলালও আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানী কাশী-রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে—একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিষ ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সম্বাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমারও বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয় এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও,আমি পত্র লিখিয়াছি এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সম্বাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিবাই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা এখন যা করিতে হয় কর।--দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা। নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি আজিই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে তোমার আট চল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইনস্পেকটর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপা-সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত

অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপা কোন দেশে গিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া, নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন—আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলী বিলাতী—সুশাসন জন্য সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন, তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশানের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌঁছিলেন তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতে ছিলেন। মাধবীনাথ পৌঁছিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগের বলিলেন, "বাপু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ ২ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাফ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মার পিট করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যাসাক্ষ দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দ্দশ পুরুষমধ্যে কখন হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

শেস্যানে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি এই গোবিন্দলাল, ওরফে চুনিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই—না—মনে ত হয় না।

উকীল। কখন দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখন প্রসাদপুরের কুঠিতে যায় নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, সাক্ষী, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন তুমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হাঁ বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না তবে কেন বলিয়াছিলে?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল, তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। সে পিঠে বাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আদেশ করিলেন।

বিচারকালীন সাক্ষীদিগের এইরূপ সাপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন,

"জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চার পাঁচ দিন, তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ বৎসর।

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সম্বাদ দিলেন গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া

গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন সে অট্টালিকায়, তাঁহার যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচজনে লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট চৌকাট পর্য্যন্ত বারভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই একদিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইটকাট জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব,—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

'ভ্রমর!

ছয়বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয়, পড়িও, না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার একস্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি

হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

"তাই, আমি মনে করিয়াছি আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদার-নিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া, সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্রধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিল তাহাদিগকে বলিল, আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না। ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রি আপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আর এই পাঁচবৎসরে আমি কয় লক্ষ টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটী বাড়ী

প্রস্তুত করিব; বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই।

আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল—কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর।

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয় এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর লিখিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটী নিবেদন—বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলেই ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন সেই ভাল।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সপ্তম বৎসরে।

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের রাজ্যতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া, নিকটে থাকিয়া নিষ্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষমাস ঐরূপে গেল। মাঘমাসে ভ্রমর ঔষধব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধ সেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন; "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি—সম্মুখে ফাগুন মাস,—ফাগুনমাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্র পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্র পার হই—তবে আমায় একটা

অম্বরটিপনি দিতে ভুলিস না। রোগে হউক, অম্বরটিপনীতে হৌক—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এতদিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিমকাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য, এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণাতেও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন,

"আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল,

"দিদি—আজ শেষদিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা;—আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়টা কথা কহিতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।—

ভ্রমর বলিতে লাগিল—"আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।'

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন "দিদি রাত্র কি জ্যোৎস্না?"

যামিনী, জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজ সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া, বলিল, "কই এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। সে মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না আজ আবার আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি একটী বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে ২ দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, একদিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম আমি যদি সতী হই তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম। একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।"

যামিনী বলিল, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল—"কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সম্বাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন।—তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি। এই সময়ে আর একবার দেখা।"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজশয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুইজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল।—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে

পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল—অনেকক্ষণ রহিল—ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

বেদ ও বেদব্যাখ্যা।

বেদপ্রকাশিকা, ঋগ্বেদ সংহিতা ভাষা সংক্ষিপ্ত টীকা বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনীর সহিত শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম এ কর্ত্তৃক বিশদীকৃত, ব্যাখ্যাত। ভাষান্তরীকৃত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালা টীকা বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বেদের প্রকাশ এক নূতন জিনিস। বাঙ্গালা তন্ত্রময়, বাঙ্গালা পুরাণময়, বাঙ্গালা অনার্য্যজাতিপরিপূর্ণ বাঙ্গালা হইতে প্রায় পাঁচ শত বৎসর "বেদের" চাস উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গালায় যিনি আর্য্যজাতির গর্ব্বহেতু বেদের প্রকাশ, বেদের চর্চ্চা, বেদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্য্যদিগের একজন প্রধান বন্ধু তাঁহার নিকট আমরা আপনাদিগকে বাস্তবিকই ঋণী বলিয়া বোধ করি। রমানাথ সরস্বতী এই দুরূহ কার্য্যের ভার লইয়াছেন এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আজি আমরা রমানাথ সরস্বতীর বেদপ্রকাশিকা উপলক্ষ করিয়া বেদের বিষয় কিছু লিখিব বাসনা করিয়াছি। বেদ জিনিস টা কি, বেদের কিরূপে অর্থ করিতে হয়, বেদের উপর কত ব্যাকরণ, কত অভিধান, কত ছন্দোবোধ, কত দর্শন লেখা হইয়াছে, বেদের উপর দেশীয় লোকের ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের কিরূপ আদর, এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় একটা পড়েন না। তাঁহারা যদি বেদ ও বেদ ব্যাখ্যার উপর দুই ফর্ম্মা আর্টিকেল দেখেন অমনি বঙ্গদর্শনের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া লইবেন এইজন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব যত অল্পে পারি গোটাকত মোটা কথা বলিয়া বেদপ্রকাশিকা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিব।

বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যে বেদব্যাখ্যা করিল সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল সে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন

করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মূষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম দিল্লীতে আমার শত্রুনিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্দ্ধনের ধন হয়। লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলেই "বেদের বচন" বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয় কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন।

প্যালগ্রেভস গোল্ডন ট্রেজরি অফ সংসএণ্ড লিরিস (Palgrave's Golden Treasury of Songs and Leaves.) হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষিপ্রণীত সূক্ত বেদে গ্রন্থিত আছে। যদি গোল্ডন ট্রেজরির সহিত তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভিয় সাগা সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আদ্যি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরীমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত রহিল, কালি মার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগা হইল, এইরূপ সাগা একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ।

কিন্তু সাগা সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীতসংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্ম্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা ব্যথা কেন?

প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয় সময়তালিকাকারগণকৃত সময় নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক, আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদসংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই, উঁহারা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদিই তুরাণীয় বা অন্য জাতির

অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে তবে তাহা অপেক্ষাও আর্য্যজাতির বেদ যে সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই যে, সেকালে বেদরচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই,অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে কর ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল কেবল গোল্ডন ট্রেজরি রহিল। তখন গোল্ডন ট্রেজরিরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহা ভিন্ন ইংরেজজাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যমাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য মত নহে কিন্তু বেদের এক একটী সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশবকাল, বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা; অগ্নির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নি নহে, অগ্নিই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন—সকলই উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান যে পরিশ্রম অন্তর্জ্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীরভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কি রূপে করিয়াছেন। সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয়মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল, ও মহীয়ান্ ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান, অলঙ্কারের দোষপরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সংপ্রসারণ হয় প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় কল্পনার আমোদ কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার উৎকর্ষ হয়।

সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্ব্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই তাঁহারা সামান্য পর্ব্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধনভয়ে আমরা মনের অনেক ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না তাঁহারা সেই ভাব শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময়, কবিহৃদয়ের সর্ব্বব্যাপী ভাব তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন, আধুনিক কবিরা তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্ম্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই জন্য বেদ পড়েন যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্ম্ম গ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে "সেকেলে লোক নির্ব্বোধ ছিল" বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকেরা ঈশ্বরাপ্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি আমি অকবি দুই জনেই একত্র থাকি একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা বলে জগৎ সংসার কত সুন্দর দেখ আমি অকবি মাটীকে মাটীই দেখি আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ আমরা জানি যে আমাদের দুই জনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্ব্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল আমরা যাহা পারি না এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা ইহাকেই সাহেবেরা *inspiration* বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন যিনি মন্ত্র দেখিলেন তিনিই ঋষি। ঋষ ধাতুর অর্থ দর্শন।

এই জন্যই কালিদাসের "মন্ত্রকৃতাং" লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন মন্ত্রকৃতাং নহে মন্ত্রদৃশাং। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের বচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান মত দাঁড়াইল দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই, উহা সত্যময়, ধর্ম্মময়, জ্ঞানময়, এই রূপে কতকগুলি গান ধর্ম্মপুস্তকরূপে পরিণত হইল।

বেদ কি জিনিস কেন উহার এত সম্মান এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু আমরা এখন বেদ বলিতে ঋক্‌বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদই যে কেবল বুঝি তাহা নহে। প্রথম বুদ্ধি বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত, প্রকৃতি উপাসনা ও যজ্ঞবাহুল্য। প্রকৃতি উপাসনা ঋগাদি বেদত্রয়ে বর্ত্তমান, যজ্ঞকার্য্য প্রণালী ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উক্ত। এই দুই সময়ের সাহিত্য সংসারের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা সেই সমস্তকেই বেদ এই সাধারণ আখ্যা দিয়া থাকি। বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষৎ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া যায়।

বেদ হইল, এখন বেদব্যাখ্যার কথা কিছু বলা চাহি। কারণ রমানাথ সরস্বতীর বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত কথা কহাইতেছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। প্রকৃতি উপাসনা যে সময়ে হয় তাহার অনেক পরে ভারতভূমি যজ্ঞপ্রধান হইয়া উঠে। বেদের অনেক পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয় ভাষাই তাহার প্রধান সূচিকা। পাণিনি ছান্দস প্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি উপাসনা সময়ে যে যজ্ঞ ছিল না তাহা নহে দেবতার উদ্দেশে খাদ্য পুষ্প চন্দনাদি দান সকল সময়েই ছিল। কিন্তু তখন এত বাড়াবাড়ি ছিল না। যখন যজ্ঞবাহুল্য হইল তখন কি বলিয়া দেবতা-উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে এই লইয়া গোল বাঁধিল। পূর্ব্বে ঋষিরা আপন আপন মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন ইহারা এখন কি বলিয়া দিবেন কাজেই বেদের মন্ত্রই ইহাদের অবলম্বন হইল। বাস্তবিকও আমি যখন ভক্তিভাবে গদ গদ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার ভাষা যদি বাহির হয় কেমন শুনায়, যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্তু যদি এক জন মহৎ কবির বচন ধরি "Father of life and light" অথবা "these are Thy glorious work Father of Light বলিয়া ধরি কত যেন অধিক ভাব প্রকাশ হয়। যে কবির বচন উদ্ধার করিলাম তাঁহারা পার্থিব কবি যদি আবার সেই কবি ঈশ্বরপ্রেরিত হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের

বচন হয় আরও অধিক ভাব প্রকাশ হইল বোধ হয়। এই অনুমানে ব্রাহ্মণসমায়ের লোক যজ্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা চাহি, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ভূরিভূরি ঋকমন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যাই বেদের প্রথম ব্যাখ্যা। বেদ রচনার অল্প পরেই ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অনেক কথার অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বিদ্যাপতির গ্রন্থের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারি না, ইংরেজেরা যেমন এখন চসরের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা অনেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। অনেকস্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন, আজগবি ধাতু প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের সময় হয়। এই সময় বেদের উপর ব্যাকরণাদি লিখিত হয়। স্বরপ্রক্রিয়া, ধাতুপ্রক্রিয়া, আদি অভিধান ছন্দোবোধাদি পুস্তক লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রয়োজন মত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ যে প্রণালী আরম্ভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার পরিশিষ্ট হইল। নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণই এই ব্যাখ্যা।

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তি। পৌরাণিক ধর্ম্ম দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নাশে, পৌরাণিক ধর্ম্ম নাশের জন্য শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অদ্বৈতধর্ম্ম প্রচারে, প্রায় ১৫০০ শত বৎসর গত হইল। বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচারকগণ বেদব্যাখ্যার তত চেষ্টা করেন নাই। কেবল যাগযজ্ঞের যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য আধুনিক সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়া ও বেদমন্ত্র কেবল মুখস্থ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য দেখিলেন লোকে কেবল মুখস্থ করিয়াই কার্য্য শেষ করে, এই জন্য তিনি বিজয়নগরের রাজার সাহায্যে সরল সংস্কৃতে ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎকালে যে বহুলপ্রচার ছিল তাহার প্রমাণ এই, যে, ঋক্‌বেদ অনুক্রমণিকায় মাধবাচার্য্য একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন। *সে মতটি এই যে ‘বেদমন্ত্র যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আবশ্যকতাই নাই।”* এই মত খণ্ডন করিয়াছেন আর শুদ্ধ মুখস্থ মতাবলম্বীদের বিলক্ষণ গালি দিয়াছেন।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।

যে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে সে কেবল গোঁড়া মাত্র; সে কেবল ভার বহন করে। মাধবাচার্য্যের টীকার এক প্রধান দোষ তাঁহার টীকা তাঁহার নিজের লেখা

নহে, তাঁহার ছাত্রদিগের লেখা; তাঁহার কেবল তত্ত্বাবধারণ মাত্র। উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কোথায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দি তর্জ্জমা সংস্কৃত, কোথাও দ্রাবিড়ী তর্জ্জমা সংস্কৃত। আর এক প্রমাণ আরও গুরুতর। বেদের প্রথম ঋকটি তিন চারি পাত ধরিয়া সব ব্যাকরণের সূত্র দিয়া লেখা হইল। তাহার পর বরাবর খানিক দূর ঐ ঋকের টীকায় বরাত দেওয়া হইল। দুই তিনটি সূক্তের পর আবার প্রথম ঋকের টীকা। তিন চারি পাত টীকায় সব ব্যাকরণের সূত্র দেওয়া আছে কিন্তু অনেক কথার বরাত দিলে বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই। এই রূপে একস্থানে যে কথার যে অর্থে যে রূপে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে আর এক স্থানে সেই কথার সেই অর্থে অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি। আবার তামাসা এই, প্রথমটি হয়ত যথার্থ ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়টী ভুল। যাঁহারা বৈদিক ব্যাকরণ উত্তমরূপ পড়িয়াছেন তাঁহাদের উচিত এই সকল ভুল সংশোধন করিয়া লন। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া লইতে যেন বিশেষ যত্ন করেন।

চতুর্থ ব্যাখ্যা রোথসাহেবের। রোথসাহেব ব্যাখ্যা করেন নাই কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই যে ব্রাহ্মণ কালে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহাতে এমত অনেক বিষয় আছে যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব আমাদের উচিত ঔপমিকভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া সমগ্র-বেদ নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল তাহা ত ভিন্ন আকারে ভাষান্তরে থাকিতে পারে। সেই ভাষা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাখ্যা করিতে হইবে এ কথায় অনেক সত্য আছে বটে, কিন্তু কোন্‌টি ঠিক অর্থ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। হয় ত বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে গ্রীকে সেইটী অন্য অর্থে আছে। এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাই।

মাক্ষমুলার রোথমতাবলম্বী। তাঁহার নূতন মত এই;—তিনি ঋক্‌বেদ হইতেই ঋগ্বেদের অর্থ করিতে চান। এবং এই উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদের একখানি নির্ঘণ্ট করিয়াছেন। উহাতে এক একটি শব্দ ঋগ্বেদের কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে সব ধরিয়া দেওয়া আছে। মাধবাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ এক কথার সতের জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিয়াছেন। এরূপ গোলমাল অনেক এবার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংস্কৃত এক কথার যে একই অর্থ হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক কথায় নানা অর্থ হয় বলিয়াই সকল অভিধানে নানার্থকোষ বলিয়া এক এক অধ্যায় দেওয়া আছে।

রেবরেণ্ড ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সায়নাচার্য্য ও প্রাচীন

টীকা পরিত্যাগ করা অন্যায় বটে কিন্তু যেখানে যেখানে ভিন্ন দেশীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে সেখানে সেখানে এ টীকা গ্রাহ্য নহে। অনেক কথা সায়নাচার্য্য যাহার অর্থে মেঘ জল বা অন্য জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মধ্যে পারস্য রাজা বা সেনাপতির নাম দেখেন। তিনি বলেন শরফলারুতি যে সকল শাসন পারস্যের পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদব্যাখ্যায় বিশেষ উপযোগী। একস্থানে পণিশব্দ সায়ন গো লিখিয়াছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইবে আমরা বলিতে পারি না

কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে সকল মতামতের কথা কহিতে ছিলাম সে ত সামান্য। সায়ন ও প্রাচীন টীকাই সকলের মূল। কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে মিলেন কেহ কোথায় মিলেন না এই পর্য্যন্ত। কিন্তু বেদের যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা কোনকালে হইবে না তাহার এক সম্ভাবনা হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতী একজন এক্ষণকার লোক, তিনি সমাজসংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান"। তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য্য কর, এই এই কর্ম্ম করিও না, কে তাঁহার কথা শুনিবে? এই জন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রীস্বাধীনা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন, দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী: তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। আগ নীবতে এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন, দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর, ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন, অতএব ঈশ্বর ধান্য। তাঁহার মত এই—সায়নাচার্য্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্ব্বে যে টীকা লিখিত হয় সেই টীকা, সেই প্রমাণ। নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সায়ন নিজের মত কোথাও দেন নাই। সর্ব্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনি জিনিস্।

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি

অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব : তৎকালীন লোকের কার্য্যকলাপ রীতিনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, তাহাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল, সেইটি বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষে নহে যেখানে যেখানে আর্য্যজাতি সেই সেইখানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি।

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়িয়াছেন, বেদের ব্যাকরণ তাঁহার সুন্দররূপ জানা আছে, ইংরেজি বেশ জানা আছে। আপনাকে সাধ্যমত বৈদিক আর্য্যসমাজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদব্যাখ্যা বিষয়ে তাঁহার মত এই, যে, ব্যাকরণ অভিধান কোনরূপে বজায় রাখিয়া সহজ অথচ মহান্, সরল অথচ উচ্চ প্রকৃতির মনোগত ভাব বা প্রকৃতি চিত্র দেখাইতে পারিলেই বেদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

রমানাথ সরস্বতী বেদের ব্যাকরণখানি তাঁহার বেদপ্রকাশিকায় ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষা অতি কটমট অথচ কথায় কথায় তর্জ্জমা নহে। তাঁহার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমাদের কিছুই তৃপ্তি হইল না। অনুক্রমণিকায় তিনি পুরাণশাস্ত্র হইতে অনেক বচন তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই বচনগুলি পরিপাক করিয়া সুন্দররূপে আপনার মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে কেন রাশি রাশি বচন উদ্ধার হইয়াছে সহজে অনুমান করা যায় না। তিনি প্রথমবারেই আপনার কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ষষ্ঠ সূক্ত ব্যাখ্যাস্থলে ম্যাক্স মুলরের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হওয়ায় "ম্যাক্সমুলার আমাদের দেশের কথা কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার মধ্যে মধ্যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন বলিয়া, ঋগ্বেদের প্রথম প্রকাশক, বেদব্যাখ্যা বেদপাঠে ক্ষয়িতজীবন মহাপুরুষকে সরস্বতী মহাশয়ের "কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দেওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার উচিত ছিল ভূমিকায় ম্যাক্সমুলারের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। যদি ম্যাক্সমুলারের ঋগ্বেদ না বাহির হইত তবে সরস্বতী মহাশয়ের বেদপ্রকাশিকা কোথায় থাকিত?

যখন মহাভারত অনুবাদ তিন চারিবার মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন বেদ যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই সে কেবল বাঙ্গালার কলঙ্ক। সরস্বতীমহাশয় সে কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রতিকুটীরে বেদ প্রকাশিকা থাকা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের একান্ত উচিত ইহার উৎসাহ দেওয়া। তাঁহাদের

নিজের দলের ত কেহ করিল না, শেষ একজন কায়স্থ বেদ প্রকাশ করিল। তাঁহাদিগকে ধিক্‌! কিন্তু তাঁহাদের উচিত ইহার সহায়তা করা। তাঁহাদের কার্য্য আর একজন করিল, ইহার সহায়তা না করিলে, তাঁহাদের কলঙ্ক ধুইলেও যাইবে না। সন্ধ্যা গায়ত্রী, জপ, হোম, সর্ব্বত্র যে বেদের দরকার, সে বেদ তাঁহাদের গৃহে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

বৈজিকতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তান হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হইয়া পিতামহ বা মাতামহের ন্যায় হইয়া থাকে, আবার অনেক সময় প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ বা তদূর্দ্ধ কোন পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর পৌত্র ও পিতামহ একত্রে দেখিতে পাই বলিয়া তাহাদের আকৃতির বা প্রকৃতির সাদৃশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু তদূর্দ্ধ কোন পুরুষের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও দেখিতে পাই না বলিয়া তাহা জানিতে পারি না। যে স্থলে পূর্ব্বপুরুষেরা আপন আপন চিত্রপট রাখিয়া যান বা আপন আপন আকৃতি প্রস্তরে খোদিত করাইয়া যান, সেস্থলে তাঁহাদের সহিত পরবর্ত্তী পুরুষের অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যে গঠন বা ভঙ্গী এক্ষণে বংশে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে হয় ত তাহা কোন না কোন পূর্ব্বপুরুষের ছিল, চিত্রপট না থাকায় তাহা চিনিতে পারা যাইতেছে না। এমনও কখন কখন দেখা যায় যে অতি দূরজ্ঞাতি বা মাতৃকুলোদ্ভব কোন দূর সম্বন্ধীয়দিগের পরস্পরের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ এক ছিলেন বলিয়া উভয়েই সেই পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি পাইয়াছেন।*

আকৃতির এইরূপ সাদৃশ্য যে কত পুরুষ অন্তর ঘটিতে পারে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, শত পুরুষ, সহস্র পুরুষ অন্তরেও ঘটিতে পারে। সে বিষয়ে অনেক প্রমাণও আছে, কিন্তু সে সকল প্রমাণ পরীক্ষা করিতে গেলে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহা এই:—আমরা এক্ষণে যে যে জাতীয় জীব দেখিতে পাইতেছি, ইহার মধ্যে অনেকগুলি পূর্ব্বে ছিল না, ক্রমে।একজাতি

* Variation of animals and plants. vol. II page 7-8

হইতে অপর জাতি উৎপন্ন হইয়া নানা জাতি হইয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি ব্যতীত নূতন নূতন প্রকার জন্তু কিপ্রকারে জন্মিল তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু তাহা যে জন্মিতে পারে এক্ষণে কেবল এইটী স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; তাহা হইলে পূর্ব্বসাদৃশ্যের আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা যত জাতীয় পায়রা দেখিতে পাই, সে সকলের আদি "গোলা" পায়রা। সিরাজু বলুন, গৃহ বাজ বলুন, লক্কা বলুন, লোটন বলুন ইহার কোন জাতিই পূর্ব্বে ছিল না। প্রথমে "গোলা" হইতে দ্বিতীয় এক জাতি উৎপন্ন হয়, সেই দ্বিতীয় জাতি হইতে ক্রমে আর এক তৃতীয় জাতি জন্মে এইরূপে ক্রমে ক্রমে ২৮৮ জাতি পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যায় এই সকল নূতন জাতীয় পায়রার বংশে মধ্যে মধ্যে গোলা পায়রার ন্যায় শাবক জন্মে। কেন জন্মে তাহা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে, যে লক্কার অমলশ্বেত পক্ষ দেখিয়া আমরা প্রশংসা করি সেই লক্কার বংশে যদি অকস্মাৎ গোলার ন্যায় ডোরাবিশিষ্ট শাবক জন্মে তবে কি বিবেচনা করা যায়? লক্কা এবং আদি "গোলা" কত সহস্র সহস্র পুরুষ অন্তর হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই আদি গোলার আকৃতি লক্কার বংশে জন্মিতেছে। ঘোটক আদিজাতি নহে। জেবরা নামক চতুষ্পদের অঙ্গ রেখার ন্যায় রেখাঙ্কিত একজাতীয় চতুষ্পদ হইতে ঘোটকের উৎপত্তি। সেই চতুষ্পদের সহিত এক্ষণকার ঘোটকের কত সহস্র পুরুষ অন্তর হইয়া গিয়াছে কিন্তু সেই চতুষ্পদের ন্যায় রেখাযুক্ত শাবক অদ্যাপিও ঘোটকের বংশে মধ্যে মধ্যে জন্মে।

জনকজননীর দোষ গুণ, আকৃতি প্রকৃতি সন্তানে জন্মে ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই বলিয়া আর তাহা আশ্চর্য্য বোধ করি না। বৈজিক কারণ তৎপ্রতি নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে দোষ গুণ জনক জননীর ছিল না, পিতামহ বা মাতামহের ছিল অথবা তৎপূর্ব্বগামী শত পুরুষ বা সহস্র পুরুষ অন্তরে কাহার ছিল, সেই শত পুরুষ বা সহস্র পুরুষ উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা কেবল এক পুরুষই উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহা কিরূপে অধস্তন কোন সন্তানে আইসে ইহা স্থির করা অতি কঠিন। ডারউইন সাহেব অনুভব করেন যে আমাদের অনেক দোষ গুণ বীজবাহী হইয়া অবসন্ন অবস্থায় বংশস্রোতে চলিতে থাকে কারণ পাইলেই কার্য্যক্ষম হয় নতুবা সেইরূপ অবসন্নভাবে থাকে। এই অনুভব সত্য হইলে হইতে পারে। কেন না দেখা যায় কাশ কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎকট রোগ দুই এক পুরুষে অদৃশ্য থাকিয়া আবার দুই এক পুরুষে প্রকাশ পায়।

যদি মধ্যবর্ত্তী পুরুষের বীজে সেই রোগ গোপনভাবে না থাকিবে তবে পরবর্ত্তী পুরুষে আবার কেন পুনঃপ্রকাশ হইবে। কেবল রোগ কেন? অন্য বিষয়েও কতকটা এইরূপ দেখা যায়। দুগ্ধবতী গাভীর গর্ভজ বৃষদ্বারা যে বৎস উৎপাদিত হয় সে বৎস স্বল্পদুগ্ধার গর্ভে জন্মিলেও দুগ্ধবতী হয়।* দুগ্ধবতীর গর্ভজ বৃষদেহে দুগ্ধবীজ না থাকিলে তাহার ঔরসজাত বৎস অবিকল পিতামহীর ন্যায় দুগ্ধবতী কেন হইবে। আবার চমৎকার এই যে ঐ বৃষজাত বৎস যে কেবল বহুদুগ্ধা হইবে এমত নহে তাহার দুগ্ধের স্বাদুতা পর্য্যন্ত অবিকল পিতামহীর ন্যায় হইবে।

বৃষ সম্বন্ধীয় কথাটী বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে স্ত্রীজাতির গুণ পুরুষেরও মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। দেখা যায় পুরুষকে মুষ্কশূন্য করিলে অর্থাৎ খোজা করিলে সেই পুরুষের স্ত্রীপ্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্ত্রীজাতির ন্যায় তাহার মৃদুস্বর হয় ভীরুস্বভাব হয়; পুরুষের ন্যায় আর তাহার শ্মশ্রু বা ওষ্ঠলোম জন্মে না। ছাগকে ছিন্ন বৃষণ বা খাসি করিয়া দিলে ছাগীর ন্যায় তাহার মুখ লম্বা হইয়া পড়ে। কুক্কুটকে খাসি করিয়া দিলে আর তাহার দাম্ভিক চীৎকার থাকে না পক্ষশিখা বা মাথায় ঝুট আর জন্মে না† কুক্কুটীর ন্যায় তাহার আকৃতি প্রকৃতি হয়। প্রসূতির প্রবৃত্তি তাহাতে বলবতী হইয়া থাকে আর হয় ত অণ্ডে বসিয়া তা দিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা জন্মে। কোন্ কুক্কুটী কখন অণ্ড ছাড়িয়া আহার অন্বেষণে যায় তাহা দূর হইতে লক্ষ্য করিতে থাকে, সময় পাইলেই দৌড়িয়া আসিয়া তা দিতে আরম্ভ করে। এই সকল স্ত্রী প্রকৃতি পুরুষশরীরে অবশ্যই ছিল বলিতে হইবে। একজন পুরুষ আপনার পৌত্রকে প্রতিপালন করিত, পৌত্রটীর গর্ভধারিণী ছিল না বা অপর স্বসম্পর্কীয় কোন স্ত্রীলোকও ছিলনা কাজেই শিশু ক্রন্দন করিলে তাহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত বৃদ্ধ আপনার স্তন দিত। মাতৃস্তনভ্রমে শিশু তাহা ওষ্ঠদ্বারা টানিত; ক্রমে বৃদ্ধটির বামস্তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে তাহাতে দুগ্ধসঞ্চারও হইল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া একপ্রকার প্রতীতি জন্মে যে পুরুষে স্ত্রীপ্রকৃতি এবং তদনুরূপ আবার স্ত্রীতে পুরুষের প্রকৃতি হীনভাবে অবশ্যই আছে। কিন্তু পুরুষে কি প্রকারে স্ত্রীপ্রকৃতি আসিল জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে তাহা মাতৃবীজের দ্বারা আসিয়াছে। পুত্র হউক আর কন্যাই হউক প্রত্যেকেই জনকজননী উভয়ের অংশ পায় কাজেই পুত্রে স্ত্রীর প্রকৃতি ও কন্যাতে পুরুষের প্রকৃতি থাকা সম্ভব। তবে বিপরীত প্রকৃতি গুলি কেবল অস্ফুট ও অপ্রকাশিত ভাবে থাকে মাত্র।

* Variation of animals. Vol II page 27.
† Variation of animals. Vol II page 26.

উপরে যাহা বলা গেল তাহা যদি বিচারে প্রকৃত বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে আর একটী কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যে সকল চিহ্ন প্রকৃতি বা শক্তি এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হয় তাহা ব্যতীত আরও শত শত প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক পূর্ব্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যতিক্রম বা যথাক্রম বীজবাহী হইয়া আমাদের শরীরে আসিয়া অপ্রকাশ্য ভাবে রহিয়াছে উপযুক্ত কারণ পাইলেই তাহার কোন কোনটি প্রকাশ পাইবে নতুবা পূর্ব্বমত অপ্রকাশ্যভাবে আমাদের শরীরে থাকিয়া আবার যথারীতি বীজানুগামী হইয়া সন্তানে যাইবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজের চিহ্নও লইয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সমুদয় তারতম্যের চিহ্ন বা অঙ্কুর যদি বংশপরম্পরা সকলের শরীরে আছে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষের সহিত আমাদের সাদৃশ্য কেন হয় বুঝিবার কতক উপায় পাওয়া যায়। কিন্তু বলা গিয়াছে যে সেই সকল চিহ্ন বা অঙ্কুর প্রায় অধিকাংশই অবসন্ন অবস্থায় থাকে, কারণ পাইলেই কার্য্যক্ষম হয়, ফলতঃ কি কি কারণে কোন্ কোন্ অঙ্কুর কার্য্যক্ষম হয় তাহার এপর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই। কত সহস্র সহস্র কারণ থাকিতে পারে তাহা মনুষ্য দ্বারা কখন যে আবিষ্কার হইবে আপাততঃ এমত কোন ভরসা নাই।

অনেকে বলেন যেস্থলে দ্বিজাতীয় জন্ম হয় সেস্থলে পূর্ব্বপুরুষের সহিত সাদৃশ্য ঘটিবার কারণ জন্মে। কেন জন্মে তাহা বলা যায় না, অথচ এইটী দেখা যায়। ঘোটক ও গর্দ্দভে যে বৎস উৎপন্ন হয় দেখা যায় যে প্রায় তাহাদের পদে একরূপ ডোরা অঙ্কিত থাকে অথচ হয় ত ঘোটক কি গর্দ্দভ উভয়ের মধ্যে কাহারও পদে সেরূপ ডোরা ছিল না। তবে কোথা হইতে আসিল? ঘোটক যে জাতীয় চতুষ্পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঐরূপ ডোরা ছিল, গর্দ্দভ সংশ্রবে ঘোটকের যে বৎস জন্মে তাহার পদে ডোরা থাকিলে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে সেই বহু পূর্ব্ববর্ত্তী চতুষ্পদ হইতে ঐ ডোরা আসিয়াছে। শ্বেত লক্কার গর্ব্ভে শ্বেত লোটনের ঔরসে যে শাবক জন্মে অনেক স্থলে তাহার পালকে কাল ডোরা হয়। গোলা সকল জাতি পায়রার আদি পুরুষ; এই জন্য বলিতে হইবে সেই কাল ডোরা গোলা পায়রা হইতে আসিয়াছে।

যেরূপ অবয়ব সম্বন্ধে বলা গেল— প্রকৃতি সম্বন্ধেও ঐরূপ পূর্ব্বসাদৃশ্য ঘটে। আমাদের যে সকল শান্তস্বভাবসম্পন্ন গৃহপালিত চতুষ্পদ আছে ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বন্য ছিল এবং কাজেই তাহাদের প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল। এখনকার এই শান্তপ্রকৃতি পশুদিগের মধ্যে যদি দুই স্বতন্ত্র জাতি হইতে বৎস উৎপাদন করান যায় তাহা হইলে সে

বৎস গৃহপালিতের ন্যায় শান্ত হয় না, তাহাদের বন্য পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় উগ্র স্বভাব হয়।* ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আমাদের মধ্যে উগ্র জাতিই এই নিয়মটির এক প্রধান প্রমাণ। আদিম অবস্থায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি বন্যজাতিদিগকে শূদ্র বলিতেন এবং ঘৃণাবশতঃ আপনাদের সমাজের সংস্পর্শে আসিতে দিতেন না, কিন্তু কালক্রমে তাহার কতক অন্যথা ঘটিল, আবার কালক্রমে আর্য্য ও শূদ্র এই দুই স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে বর্ণশঙ্কর ঘটিল। বর্ণশঙ্কর সন্তানদিগের প্রকৃতি অতি ভয়ানক হইল। ক্ষত্রিয় ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ব্বে যাহারা জন্মিয়াছিল তাহারা "উগ্র" এক্ষণে উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি।† তাহাদের এই নামকরণ প্রকৃতি অনুসারে হইয়াছিল জাতি অনুসারে নহে। ব্রাহ্মণীর গর্ব্বে ও শূদ্রের ঔরসে যে সন্তান হইল তাহার নাম হইল চণ্ডাল। চণ্ড শব্দে উগ্র। অতএব দুই স্বতন্ত্র জাতীয় মনুষ্যজাত সন্তান যে অতি নীচপ্রকৃতি ও অতি নিষ্ঠুর হয় তাহার প্রমাণ আমাদের ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইতেছে। জাম্বেসী নদীর ধারে বিলাতিদিগের ঔরসে এবং তদ্দেশীয় কৃষ্ণবর্ণা কাফ্রীদিগের গর্ব্বে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহাদের পৈশাচিক প্রকৃতি দেখিয়া লিবিংষ্টন সাহেব বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই দেশীয় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলে যে মহাশয়, শ্বেত পুরুষ দেবতার সৃষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষও দেবতার সৃষ্ট, আর, এই দোআঁসলারা পাপপুরুষের সৃষ্ট।‡

আমাদের দেশে দ্বিজাতীয় বংশ আবার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে সচরাচর "মেটে ফিরিঙ্গি" বলিয়া

---

* The parents of all our domesticated animals were of course aboriginally wild in disposition, and when a domesticated species is crossed with a distinct species, whether this is domesticated or only a tamed animal the hybrids are often wild to such a degree, that the fact is intelligible only on the principle that the cross has caused a partial return to a primitive disposition *Darwin's Variation of animals Vol II.*

† এক্ষণকার উগ্রক্ষত্রিয়েরা আর উগ্র নাই। যে কারণে তাহাদের উগ্র প্রকৃতি হইয়াছিল সে কারণও আর নাই।

‡ Many years ago, long before I had thought of the present subject, I was struck with the fact that, in South America, men of complicated descent between Negroes, Indians, and Spaniards, seldom had, whatever the cause might be, a good expression. Livingstone—and a more unimpeachable authority cannot be quoted—after speaking of a half casteman on the Zambesi, described by the Portuguese as a rare monster of inhumanity, remarks, "It is unaccountable why half castes, such as he, are so much more cruel than the Portuguese, but such is undoubtedly the case." An inhabi

থাকি, এই দেশীয়দিগের গর্ভে এবং বিলাতিদিগের ঔরসে তাহাদের জন্ম। শুনিতে পাওয়া যায় মোট ফিরিঙ্গিরা নীচপ্রকৃতির লোক, কিন্তু আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ নীচ বলিয়া বোধ হয় না। যে নীচত্ব দেখা যায় তাহা বোধ হয় শিক্ষার দোষজনিত। হইতে পারে যে বিলাতিরা আর্য্যবংশোদ্ভব, ও এদেশীয়েরাও আর্য্যবংশোদ্ভব, এই জন্য বিলাতীয়দিগের সহিত এদেশীয় রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় বিশেষ দোষ স্পর্শে নাই। যে দ্বিজাতীয়ের বংশের কথা হামবোল্ড বা লিভিংষ্টোন প্রভৃতি সাহেবেরা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় কাফ্রী ও ফরাসি, অথবা চিনা ও আরবী, বা তদ্রূপ অন্য কোন দুই স্বতন্ত্র গঠনের মনুষ্য দ্বারা যে সন্তান উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে গঠনের বিশেষ কোন বৈজাত্য লক্ষ্য হয় না। কাজেই এই দুই দেশীয় লোক দ্বারা যে বিজাতীয় জন্ম হয় এমত বলা যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্তান যে জনকের ন্যায় কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। জনকের ন্যায় না হইয়া সন্তান যে কতদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় হয় সে বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইল। সন্তান, আবার বংশের কাহারও মত না হইয়া একেবারে ভিন্ন বংশোদ্ভব লোকের ন্যায় যে হইতে পারে, এক্ষণে সেই বিষয় বলা যাইতেছে।

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর ন্যায় না হইয়া মৃত স্বামীর ন্যায় হয়। সন্তান উৎপত্তির দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে যে স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহার আকৃতি, তাহার অবয়ব অন্য ব্যক্তিজাত সন্তানে কিরূপে জন্মে ইহা বিবেচনা করিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার কারণ অনেকে অনেক প্রকার অনুভব করেন। কেহ বলেন কখন কখন গর্ভে পূর্ব্বস্বামীর বীজ সঞ্চিত থাকে তজ্জন্যই একরূপ সন্তান

---

tant remarked to Livingstone "God made whitemen, and God made blackmen, but the Devil made half-castes." When the two races, both low in the scale, are crossed the progeny seems to be eminently bad. It was the noble hearted Humboldt, who felt no prejudice against the inferior races, speaks in strong terms of the bad and savage disposition of the Zambos, or half-castes between Indians and Negroes, and this conclusion has been arrived at by various observers. From these facts we may perhaps infer that the degraded state of so many half castes is in part due to reversion to a primitive and savage condition, induced by the act of crossing, even if mainly due to the unfavourable moral conditions under which they are genarally reared. *Darwin's variation of animals and plants vol II. Chap XIII.*

জন্মে, কিন্তু এ কথা অতি অগ্রাহ্য। কেহ বলেন গর্ভধারিণী যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন সন্তানের সেই মূর্ত্তি হয়; বিরহ-কাতরা স্ত্রী পূর্ব্বস্বামীর মূর্ত্তি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন বলিয়া পূর্ব্ব স্বামীর ন্যায় তাঁহাদের সন্তান হয়। কিন্তু এ অনুভব অনেকে আগ্রাহ্য করেন; তাঁহারা বলেন যে, যদি কাহারও মূর্ত্তি ভাবনাই এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হইত তাহা হইলে গোমেষাদি পক্ষে এই কারণ খাটিত না, কেননা চতুষ্পদেরা অন্যের আকার ধ্যান করিতে পারে না, অথচ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে চতুষ্পদের মধ্যেও ঐ রূপ সাদৃশ্য ঘটে। গর্দ্দভের ঔরসে কোন ঘোটকী প্রথম গর্ভবতী হইয়া থাকিলে যদি সেই ঘোটকী আবার কোন সুন্দর ঘোটকের দ্বারা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়, তথাপি হয় ত সেই পূর্ব্ববর্ত্তী গর্দ্দভের ন্যায় তাহার বৎস জন্মে। ঘোটকজাত বৎসও যে গর্দ্দভের ন্যায় হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু এই রূপ ঘটনা ঘোটক, কক্কুর, মেষ, শূকর প্রভৃতি অনেক চতুষ্পদের মধ্যে পুনঃ পুন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকথিত আপত্তিকারীরা বলেন এইরূপ সাদৃশ্য গর্ভধারিণীর চিন্তাজনিত নহে, ইহা কেবল রক্তসংশ্রব জনিত। তাঁহারা বলেন যে গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ত সংশ্রবে মাতৃদেহ পিতৃচিহ্নগ্রস্ত হয় এবং সেই চিহ্ন পরবর্ত্তী সন্তানে মধ্যে মধ্যে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই অনুভব সম্বন্ধে আর একপক্ষ আপত্তি করেন যে যদি রক্তসংশ্রবে মাতৃদেহ পিতৃচিহ্নগ্রস্ত হয়, তবে পক্ষী সম্বন্ধে ত এই নিয়ম খাটে না, কেননা পক্ষীর গর্ভস্থ অণ্ডের সহিত মাতৃরক্তের কোন মতে সংস্পর্শ হয় না, অথচ চতুষ্পদের ন্যায় পক্ষীরও শাবক পূর্ব্ব গর্ভকর্ত্তার ন্যায় কখন কখন হইয়া থাকে। পক্ষীদিগের মধ্যে যে এরূপ সাদৃশ্য জন্মে একথা সকলে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ডাক্তার সেপিয়াস সাহেব এরূপ সাদৃশ্য কপোতমধ্যে দেখিয়াছেন। কিন্তু ডারউইন সাহেব বলেন যে ইহার আরও প্রমাণ চাই। বাঙ্গালা দেশে এ সকল বিষয়ে বড় মনোযোগ নাই অতএব আমাদিগের মধ্যে কেহ যে ইহার কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এমত সম্ভব নহে, কাজেই এই সহজ পরীক্ষার নিমিত্ত ইউরোপের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে।

গর্ভিণী যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন সন্তানের সেই মূর্ত্তি হয় পূর্ব্বে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্র ছিল এবং আমাদের দেশে অদ্যাপি আছে। ভরতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা গর্ভিণীর পক্ষে যে নিয়ম বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে তাঁহাদেরও এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল। গর্ভিণী কুদৃশ্য বা কুৎসিত ব্যক্তি দেখিবে না, কেননা তাহাতে সন্তান কুৎসিত হইবে; সর্ব্বদা স্বামীকে দেখিবে এবং স্বামীর ন্যায় সন্তান হয় এমত কামনা করিবে কেননা যে ব্যক্তিকে সর্ব্বদা

দেখা যায় বা সর্ব্বদা ভাবনা করা যায় সন্তান তাহারই মত হয়।

মুসলমানদিগের মধ্যেও বোধ হয় এই বিশ্বাস কতক ছিল ; কেন না, জনশ্রুতি আছে যে মুরসিদাবাদের কোন নবাব একবার একটি গর্ভিণী ঘোটকীর সম্মুখে আপনার ইচ্ছামত বর্ণ চিত্রিত করাইয়া একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত অশ্ব রাখিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে সেই চিত্রিত অশ্বের ন্যায় বৎসের বর্ণ হইবে এই অনুভবে মৃৎ মূর্ত্তি চিত্রিত করাইয়াছিলেন। লোকে বলে বৎসও সেই চিত্রিতবর্ণ পাইয়া ছিল। একথা কতদূর সত্য তাহা স্থির করিবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। কিন্তু লোকের যে এবিষয়ে কতদূর বিশ্বাস তাহা এই প্রবাদ দ্বারা বুঝা যাই-তেছে এবং তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত আমারা এই নবাবি কৌশলের উল্লেখ করিলাম।

পশুদিগের মধ্যে রূপচিন্তা অসম্ভব বলিয়া যে আপত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলে হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্য সম্বন্ধেও যে সেই আপত্তি অবশ্য বলবতী হইবে এমত বোধ হয় না, কেননা অনেক সময় চিন্তা হেতু গর্ভস্থ সন্তানের গঠন সম্বন্ধে তারতম্য হইতে দেখা গিয়াছে। এক-বার সূর্য্যগ্রহণের সময় একটি গর্ভবতীকে আত্মীয়েরা নির্জন ঘরে শয়ন করাইয়া রাখেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে গ্রহণের সময় গর্ভিণীকে কতকগুলি বি-ষয়ে বড় সাবধানে থাকিতে হয়। পাছে তাহার অন্যথা ঘটে এই আশঙ্কায় এক জন প্রবীণা আসিয়া গর্ভবতীর নিকটে বসিয়াছিলেন, এমত সময় বাহিরে হঠাৎ একটা গোলযোগ হইবায় প্রাচীনা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভবতী ও উঠিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনি নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, অমনি পুনরায় শয়ন করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সময় প্রাচীনা দেখি-লেন যে গর্ভবতী বামপদ চাপিয়াছেন এবং ঈষৎ বাঁকাইয়াছেন। অমনি প্রাচীনা চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের পা বাঁকিয়া গেল; অন্যান্য আত্মীয়েরা আসিয়া সকলেই গর্ভবতীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, গর্ভবতী ভয়ে অধোবদনা হইলেন। আমরা তৎ-ক্ষণাৎ যাইয়া বুঝাইবার এত চেষ্টা করি-লাম কিন্তু কোন ফল হইল না. গর্ভবতীর স্থিরবিশ্বাস হইল যে তাঁহার সন্তানের পা বাঁকা হইবে। তিনি অনবরত তাহাই ভাবিতেন। সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল কিন্তু গর্ভধারিণী যাহাই ভাবনা করিতেন তাহাই হইয়াছিল। সন্তানটীর বামপদ বাঁকা দেখিয়া আমরাও বিস্ময়াপন্ন হই-য়াছিলাম। প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত সন্তানটির বামপদ এত বাঁকা ছিল যে তাহার জুতা ফরমাইস দিতে হইত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল সে বক্রতা বিনা চিকিৎসায় সারিয়া গিয়াছে। এই

অঙ্গবৈলক্ষণ্য গর্ভধারিণীর সর্ব্বদা ভাবনার ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?*

আর একবার একজন ডাক্তার সাহেব কোন দীনহীন গৃহস্থকে অনুগ্রহ করিয়া চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। গৃহস্থের স্ত্রী তৎকালে গর্ভিণী ছিল। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, গর্ভিণী সেই সাহেবকে দেখিতে থাকে। এত নিকটে কখন সাহেব দেখে নাই অতএব সুবিধা পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। সাহেব চলিয়া গেলে গর্ভিণী সকলের নিকট সাহেবের চুলের পরিচয় দিতে লাগিল। সাহেবের বর্ণই শ্বেত হয় কিন্তু তাঁহাদের চুলের বর্ণও যে শ্বেত হয় একথা গর্ভিণী একেবারে জানিত না, অতএব সাহেবের চুল দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে কেবল তাহাই ভাবনা করিত। পরে তাহার সন্তান জন্মিলে দেখা গেল যে তাহার চুল সম্পূর্ণ ইংরেজিবর্ণের হইয়াছে। সন্তানটি ৮।১০ বৎসর অবধি জীবিত ছিল, তাহার চুল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইত। বালকটি উপস্থিত প্রস্তাবলেখকের প্রতিবাসী ছিল।

এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা আমাদের বিশেষ জানা আছে। এক জন যুবা একখানি ইংরেজি পট ক্রয় করেন। পটখানিতে একটি সুন্দর শিশুর নিদ্রাভঙ্গ চিত্রিত ছিল। যুবা এক দিন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী অতি আগ্রহের সহিত পটখানি একা দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়া যুবতী অপ্রতিভ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের কি এমত সুন্দর সন্তান হইতে পারে? এই সময় তিনি গর্ব্ভবতী ছিলেন। তাঁহার স্বামী দেখিলেন যে গর্ব্ভবতী সর্ব্বদাই সেই পটখানির নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। পরে যথাকালে তাঁহার পুত্র জন্মিল; প্রায় ছয় মাস বয়সের সময় দেখা গেল যে সন্তানটীর উদর ও বক্ষের গঠন পটের চিত্রিত শিশুর ন্যায় হইতেছে। পরে ক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সেই মত অবিকল হইল। এই সময় যিনিই পটখানি দেখিতেন তিনিই মনে করিতেন যে উহা বালকটির প্রতিমূর্ত্তি। এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বালকের প্রায় দুই বৎসর বয়স অবধি ছিল। কিন্তু পরে আর রহিল না। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে গর্ব্ভবতীর চিন্তানুরূপ সন্তান হওয়া নিতান্ত অমূলক নহে।

সাদৃশ্য জনক জননীর সহিত হউক, অথবা অপর কাহার সহিত হউক, অনেক সময় তাহা কেবল অল্পকাল স্থায়ী হয়; কখন বা তাহা কেবল সময়ে সময়ে হয়। ডারউইন সাহেব বলেন এইরূপ সাদৃশ্য কেবল পশুদিগের মধ্যেই দেখা যায়।

* যদি এই পরিচয় কেহ বিশেষ করিয়া জানিতে চাহেন, কাষ্ঠশালী গ্রামে গেলে জানিতে পারিবেন।

তিনি একবার কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুটের দ্বারা শ্বেত পক্ষ যুক্ত কুক্কুটীর শাবক উৎপাদন করেন। কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে অমল শ্বেত হইল, পর বৎসরে কাল হইয়া গেল। আবার কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে কৃষ্ণবর্ণ ছিল দ্বিতীয় বৎসরে অমল শ্বেত না হউক এক প্রকার শ্বেত-পক্ষ বিশিষ্ট হইল। ডারউইন সাহেব বলেন তিনি হোফাকার নামক বিদেশীয় পণ্ডিতের গ্রন্থে পড়িয়াছেন যে রক্তবর্ণ ষাঁড়ের ঔরসে কৃষ্ণবর্ণা গাভীর গর্ভে যে বৎস জন্মে,অথবা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের ঔরসে রক্তবর্ণা গাভীর গর্ভে যে বৎস জন্মে তাহা কখন কখন প্রথমে রক্তবর্ণ হয় পরে কালবর্ণ হয়। আমাদের দেশে এরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন গো জাতির মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন।

আকৃতির পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হইতেছে সকলেই তাহা দেখিতেছেন, বাল্যকালে এক আকৃতি, বার্দ্ধক্যে আর একরূপ। শৈশবে, কৈশোরে,যৌবনে, বার্দ্ধক্যে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা সচরাচর এক আকৃতির পরিবর্ত্তন মাত্র, কিন্তু যাহা বলা যাইতেছিল তাহা স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকথিত শিশু ছয়মাস বয়স্ হইতে প্রায় দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পটের চিত্রিত বালকের ন্যায় হইয়াছিল পরে আর এক প্রকার হইল। আমাদিগের কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে এই পরিবর্ত্তন কেবল বয়োবৃদ্ধি অনুসারে মূল আকারের তারতম্য মাত্র, এমত কথা বলিতেছি না যে সেই আকার রহিল, বয়োভেদে তাহার কিছু ভিন্নতা হইল। আমরা স্বতন্ত্র প্রকার পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি। পূর্ব্ব আকার লুপ্ত হইয়া ভিন্ন আকার পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ মূল আকারের পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহাই বলিতেছি। আমাদের বিশ্বাস যে একব্যক্তির আকৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া অনেকের বোধ হইবে, পূর্ব্বে আমাদেরও তাহা বোধ হইতে পারিত, কিন্তু যাঁহারা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহারা যেন অন্যের ন্যায় অগ্রাহ্য না করেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রকরণ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি এ, এম বি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তৃতীয় সংস্করণ। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এই গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। ১০৬০ পত্রের গ্রন্থ যে স্থলে অল্পকালের মধ্যে তিনবার মুদ্রাঙ্কন করিতে হইয়াছে সে স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গ্রন্থখানি দেশে বিলক্ষণ পরিচিত এবং আদৃত। আর সমালোচনা দ্বারা ইহার পরিচয় দিতে

হইবে না, তথাপি গঙ্গাপ্রসাদ বাবু স্মরণ করিয়া সমালোচনার্থ গ্রন্থখানি পাঠাইয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানি না পাঠাইলে আমরা ক্রয় করিতাম, গৃহস্থমাত্রেরই গ্রন্থখানি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিপাটী হইয়াছে,ব্রজমাধব বাবু এ বিষয়ে আপনার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

উপন্যাস-মালা। শ্রীযুক্ত রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর প্রণীত। নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে প্রায় ৩২ বৎসর হইল, এই উপন্যাসগুলি ইংরেজিতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান আকারে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার ভরসা যে গল্পগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু বোধ হয় এ ভরসা তাঁহার সম্প্রতি জন্মিয়াছে, নতুবা এত দিন গল্পগুলি ইংরেজিতে লুকাইয়া রাখিবেন কেন? যৎকালে গল্পগুলি ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার পাঠক ছিল না, কিন্তু বোধ হয় এই গল্পলেখকের ন্যায় লেখক যদি তৎকালে চেষ্টা করিতেন বাঙ্গালায় পাঠক জুটিত। পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না বলিয়াই লোকে তখন পড়িত না। পাঠ্য গ্রন্থ নাই তবু লোকে পাঠ করিবে এরূপ প্রত্যাশা কেবল হিন্দুকালেজ হইতেই জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে আমাদের কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজি সাহিত্যের সহায় হইয়াছিলেন। তাহাতে ফল কি হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা দূর হইতে দেখিতাম কয়েক জন যুবা সমুদ্র বাড়াইবার নিমিত্ত ঝিনুক হস্তে জলসিঞ্চন করিতেন। উপস্থিত উপন্যাস মালা ইংরেজিতে কয়জন পড়িয়াছিল শুনি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে শত শত লোকে পড়িয়া আপ্যায়িত হইবে তাহা আমরা কতক নিশ্চয় বলিতে পারি। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে,ভাষান্তরীকৃত বলিয়া একেবারে বোধ হয় না। কিন্তু যে প্রণালীতে গল্প বলা হইয়াছে তাহা ইংরেজি প্রণালী; যাঁহারা ইংরেজিতে ক্ষুদ্র গল্প পাঠ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ইহা নূতন বলিয়া বোধ হইবে, সে প্রণালী ইংরেজি হউক কিন্তু সুন্দর।

ভারত-উদ্ধার অথবা চারি আনা মাত্র (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্মা বিরচিত।

কিরূপে ইংরেজ হইতে ভারত উদ্ধার হয়, কাব্যখানিতে তাহাই রচিত হইয়াছে। কিরূপে

"—————দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানাপাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি' সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সলতে-হীন,আভাহীন এবে—
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার, উজ্জলিয়া মহী।"

ভারত উদ্ধারের সূত্র এই:—একদিন বুদ্ধিমান্ বিপিন গোলদীঘি তটে একা ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন

"ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে

জাগাইতে গেনু--ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তা'ও যদি ঘরে খেযে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই। * * *
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
* * *
—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরাজে।"

বিপিন বাবু শেষ "প্রিয়বন্ধু কামিনী-কুমারের" সহিত মিলিত হইয়া এক স্থানে সভা সংস্থাপন করিলেন।

"অজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
শোভিছে, সুরম্য রাজ-পথের উপরে,
আঁকা বাঁকা, উচু নীচু, কাষ্ঠ দণ্ড-শ্রেণী-
আবৃত অলিন্দ তার ম্লান ভাবে ঝুলি,
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান, মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাই'ছে দেহে।
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা পাখা, চীর আবরিত;
পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।
এ হেন মন্দিরে "আর্য্য কার্য্যকরী সভা"
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ!
ধন্য অনুরাগ!"

বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার স্থির হইল। ছাতু, লঙ্কা, পটকা আর পিচকারি বঁটি এই কয়েক দ্রব্য যুদ্ধের উপকরণ। ছাতু দ্বারা সুয়েজ সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ হইবে, বলিয়া ছাতু ক্রয় করিয়া, সমুদ্রধারে পাঠান হইল। আরং সকল উদ্যোগ হইল। বিপিন বাবু স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় হইবার নিমিত্ত বলিলেন,

"স্বদেশ-উদ্ধার কল্পে বাহিরিব আজি
করিব বিচিত্র রণ ইংরাজের সনে
শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন।"

বিপিন বাবুর স্ত্রী বিস্তর বুঝাইলেন,

"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে———
————বলি প্রাণ নাথ
দেশ ত দেশেই আছে কি আর উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দেও নাথ, ল'ব শিরঃপাতি;"

বীরশ্রেষ্ঠ তাহা শুনিলেন না। বঙ্গবীর সকল যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

"গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি————
কবাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন আদেশে
প্রসারি' দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্র নাদ করি।"

এইরূপে ভারত উদ্ধার হইল।

এখন কথা এই। রামদাস শর্ম্মা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত; কল্পতরুর মূলে আমাদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। আমরা তাঁহার মাই ডিয়ারের মধ্যে, এক্ষণে অনেকের ভয় পাছে রামদাসকে দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালিরা কোন দিন "বঁটাইয়া" দেয়। কিন্তু তাহার কারণ দেখি না। বাঙ্গালিরা চিরকাল বীরপুরুষ, তাঁহাদের বীরত্ব বর্ণনায় তাঁহারা অবশ্য আপ্যায়িত হইবেন।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

মানব ও যৌননির্ব্বাচন।

মানবসমাজে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য সমালোচন করিবার পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া উচিত, যে যৌননির্ব্বাচন কি? কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে স্থির করা উচিত, বিষয়টা কি? সে জন্যও বটে, আর অন্য কারণে এ স্থলে বিষয় নির্ণয় আবশ্যক। যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুপরিচিত নহেন, এবং যাঁহারা অল্পপরিচিত, তাঁহাদের কাছে বিষয়টা নূতন;—অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায় এবিষয়ের আন্দোলন যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা আমি অবগত নহি। অনেকের কাছে কথাটাও নূতন।

যৌননির্ব্বাচন একটা শক্তি। শক্তিমাত্রেরই পরিচয় কার্য্যের দ্বারা। কোন শক্তিরই কার্য্যনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সম্ভবে না। আমরা যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দেখিয়া যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি বুঝাইব।

সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রী এবং পুরুষ, এতদুভয়ের মধ্যে অনেক শারীরিক প্রভেদ দেখা যায়, অনেক মানসিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিভিন্নতা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

স্ত্রী এবং পুরুষ বলিতে গেলেই কতকটা প্রভেদ আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। সে প্রভেদ না থাকিলে স্ত্রীপুরুষে পার্থক্যও থাকে না। সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়ের যে সকল শারীরিক গঠনের সাক্ষাৎ-

সম্বন্ধ আছে, স্ত্রীপুরুষে তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। এইগুলিকে নৈসর্গিক অথবা মুখ্য যৌনচিহ্ন বলা যায়।

অনেক জীবের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আর একপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ পার্থক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, সুতরাং এ সকল স্ত্রীপুরুষ পার্থক্যেরই ফল নহে। কোন কোন জাতীয় জীবের মধ্যে চলৎশক্তির উপাদানীভূত অনেক শারীরিক গঠন পুরুষে দেখা যায়, তাহা সেই জাতীয় স্ত্রীতে নাই। পুরুষে ধৃত-বক্ষার্থ কতকগুলি গঠন আছে, স্ত্রীতে নাই। সন্তানরক্ষার সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী শারীরিক গঠন অনেক জাতীয় স্ত্রীর আছে, পুরুষের নাই—যেমন, মানবীর স্তন ইত্যাদি। এ সকল পার্থক্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। স্ত্রীকে পাইলে ধরিয়া রাখিবার জন্য অনেকস্থলে পুরুষ উপায় আবশ্যক হইয়া পড়ে। ডাক্তার ওয়ালেস বলেন, এমন কীট আছে যাহাদের পুরুষের পদ কোন কারণে ভগ্ন হইয়া গেলে আর তাহারা স্ত্রীসংসর্গ করিতে পারে না। এমন অনেক সামুদ্রিক জীব আছে, যাহাদের পুরুষের পদ সকল প্রাপ্তযৌবনে অসামান্য পুষ্টিলাভ করে। এস্থলে অনুমান করা যায় যে, এই সকল জীব নিয়ত সাগরোর্ম্মি দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, সুতরাং স্ত্রীকে আপন আয়ত্তে ধরিয়া রাখিবার উপায় না থাকিলে অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়া অসম্ভব অথবা দুর্ঘট হইয়া উঠে। কাজেই ইহাদের পদ সকলের দৈর্ঘ্য এবং পুষ্টির অভাবে তজ্জাতীয় জীবপ্রবাহের রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য বলিতে হইবে।

আর কতকগুলি পার্থক্য আছে, সেগুলি যৌননির্ব্বাচনের ফল—অর্থাৎ সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল বলিয়া স্ত্রীলাভচেষ্টায় একজন পুরুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছে—সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল না বলিয়া একজন পুরুষ অপরের ন্যায় স্ত্রীলাভ করিতে পারে নাই। একটি স্ত্রী আছে;—তোমাতে এবং অপর এক ব্যক্তিতে সেই স্ত্রীলাভ লইয়া প্রতিযোগিতা। মনে কর সেই স্ত্রী সুকণ্ঠসংগীতানুরাগিণী। এখন, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি দাঁড়াইবে? তোমাদের দুইজনের মধ্যে যিনি সুকণ্ঠ অথবা যাহার কণ্ঠধ্বনি সেই স্ত্রীর কর্ণে সু, সেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। তুমি যদি সুকণ্ঠ না হও, তোমাকে মনোদুঃখে, ম্লানমুখে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি সেই জাতীয় জীবের সকল স্ত্রীই সংগীতানুরাগিণী, সুকণ্ঠপক্ষপাতিনী হয়, তাহা হইলে অবশ্য এই ফল দাঁড়াইবে যে, যাহারা সুকণ্ঠ নহে তাহাদের অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইবে না, সুতরাং তাহাদের বংশলোপ হইবে। যাহারা সুকণ্ঠ তাহারাই কেবল স্ত্রীলাভ করিবে—কেবল তাহাদেরই বংশ থাকিবে।

এইস্থলে আর একটী কথা বুঝাইতে হইতেছে। উত্তরাধিকার নিয়মের কথা সকলে শুনিয়া থাকুন বা না থাকুন, গাল্টনের 'প্রতিভার উত্তরাধিকার' গ্রন্থ সকলে পড়িয়া থাকুন বা না থাকুন, পিতৃপ্রকৃতি যে অনেকটা পুত্রে বর্ত্তে তাহা সকলেই জানেন—অন্ততঃ এতৎসম্বন্ধমূলক প্রচলিত প্রবাদটা সকলেই শুনিয়াছেন। প্রবাদটা সত্য। এতৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ সংগৃহীত এবং সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অবতারণার এ উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া আমরা প্রমাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম। তবে দুই চারিটা মোটামুটি কথা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

ইহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ রুচি, বুদ্ধিমত্তা, সাহস, বিশেষ বিশেষ পরিবারের সকলের মধ্যেই দেখা যায়। প্রতিভার ন্যায় জটিল শক্তিরও উত্তরাধিকার হয়। এবিষয়ে গাল্টন সাহেব বহু যুক্তি দিয়াছেন, বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তন্মধ্যে পিতাপুত্র হর্শেল, পিতাপুত্র মিল, পিতাপুত্র ফক্স, পিতাপুত্র পিটের কথা সকলেই জানেন। প্রুসিয়ার বিখ্যাত 'গ্রেনেডিয়ার' সৈন্যদলের কথাও সকলে জানেন। যে সকল গ্রামে এই দীর্ঘকায় পুরুষ এবং তাহাদের দীর্ঘকায় স্ত্রীগণ বাস করিত, সে সকল গ্রামে বহুতর দীর্ঘকায় লোকের জন্ম হইত। ডারুইন সাহেব এবিষয়ের বিস্তৃত সমালোচন করিয়াছেন।*

এই নিয়মানুসারে সুকণ্ঠদিগের বংশধরেরা সুকণ্ঠ হইল। এবং অনুশীলনে সেই ক্ষমতা আরও পরিপুষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যেও আবার ঐরূপ নির্ব্বাচন হইল,—সেই সুকণ্ঠদিগের মধ্যে যাহাদিগের কণ্ঠ অধিকতর সু তাহাদেরই বংশ থাকিল, অন্যের থাকিল না, কেন না তাহাদের দগ্ধ অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইল না। এইরূপে সেই জাতীয় জীবের মধ্যে ক্রমশঃ কণ্ঠমাধুর্য্যগুণের পুষ্টি হইতে লাগিল। ইহারই নাম যৌন নির্ব্বাচন।

কিন্তু সকল জাতীয় জীবেরই স্ত্রী কিছু কণ্ঠরবে মোহিতা হয় না—সকলেরই প্রেম প্রলোভন কিছু শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয় না। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী—পুরুষের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এস্থলে যৌননির্ব্বাচনে বর্ণের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্যের চটক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কেহ বা নৃত্যের পক্ষপাতিনী—তজ্জাতীয় পুরুষের নৃত্যক্ষমতা ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সুগন্ধে মুগ্ধ—পুরুষের শরীরনিঃসৃত সৌরভে উন্মত্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে যৌন নির্ব্বাচন পুরুষের সৌরভবিকীরণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে।

* The variation of Animals and plants under domestication vol ii, chap xii.

সকল সময়ে আবার এত সহজে স্ত্রী লাভ ঘটিয়া উঠে না। যখন একজন স্ত্রীর অনেক প্রয়াসী, অথবা অল্পসংখ্যক স্ত্রীর অধিক সংখ্যক প্রেমপ্রার্থী জুটে, তখন মহাকলহ উপস্থিত হয়। তখন কাজেই তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইবে। স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে স্ত্রীলাভ চেষ্টা প্রায়শঃই যুদ্ধে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে এমন কলহ, এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত না গড়াইয়া তাহার অবসান হয় না। শশকের ন্যায় ভীরু এবং শান্তপ্রকৃতি জীবের মধ্যেও স্ত্রীলাভের জন্য বিবাদ করিয়া একজন অপরকে মারিয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে।*

যাহারা দুর্ব্বল তাহারা হয় মরিয়া যায়, নয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। যাহারা বলবান্ তাহারা থাকে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং বংশধরেরা পিতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নির্ব্বাচনে পুরুষেরা বলবান্ হইয়া উঠে। এইরূপ নির্ব্বাচনে স্ত্রীপুরুষে বলের তারতম্য, আকারের তারতম্য, সাহসের তারতম্য, বুদ্ধির তারতম্য।

এইস্থলে একটি সমস্যা উপস্থিত হয়। যে সকল পুরুষেরা অন্য পুরুষকে পরাজিত করে, অথবা স্ত্রীদিগের চক্ষে অধিকতর মনোহর বলিয়া প্রতীত হয়, কিরূপে তাহারা অধিকসংখ্যক বংশধর রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়, ইহা বুঝা কিছু কঠিন। অধিকতর বংশধর রাখিয়া যাইতে না পারিলে, যে সকল গুণে তাহারা স্ত্রীলাভ ব্যাপারে অন্য পুরুষ অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, তাহা কখনই যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংখ্যার তারতম্য বড় না থাকে, এবং যদি পুরুষেরা বহুবিবাহপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে কি ভাল কি মন্দ সকল পুরুষেই অবশ্য অগ্রপশ্চাৎ স্ত্রীলাভ করিবে। যাহারা বলবান্, অথবা সুন্দর, অথবা সুগায়ক, তাহারা না হয় অগ্রেই স্ত্রীলাভ করিবে—যাহারা সেরূপ নহে, তাহাদিগকে না হয় দুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে—স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান হইলে কেহই একেবারে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু দুদিন অগ্রপশ্চাতে বড় আসে যায় না। সৌন্দর্য্য অথবা সুকণ্ঠ অথবা সুনৃত্যের সঙ্গে জীবনোপায়াহরণের সম্বন্ধ অল্প সুতরাং ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, সুকণ্ঠ কুকণ্ঠ, সুনর্ত্তক কুনর্ত্তক সকলেই—যে অগ্রে স্ত্রীলাভ করিবে সেও যেমন, যাহার মেওয়া সবুরে ফলিবে সেও তেমনি—সমানসংখ্যক অপত্য রাখিয়া যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে সংখ্যার তারতম্য তাদৃশ থাকিলে স্ত্রীসংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইলে অবশ্য অনুমান করা যাইত যে স্ত্রীগণ উত্তম পুরুষদিগের মধ্যে বিলি হইয়া

* Zoologist, vol i. p 2ii.

গেল, সুতরাং অধমেরা পাইল না, কিন্তু তেমন ন্যূনাধিক্য সর্ব্বত্র দেখা যায় না*। বহুবিবাহও সকল জাতীয় জীবের মধ্যে প্রচলিত নাই†। তবে কেমন করিয়া উত্তমেরা অধিকতর অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারিল? কেমন করিয়া এই সকল স্ত্রীমোহন গুণের পুষ্টিসাধন যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা হইল?

ডারুইন সাহেব এ সমস্যা এই রূপে পূর্ণ করিয়াছেন। মনে কর কোন প্রদেশস্থ বিশেষ এক জাতীয় বিহঙ্গীসমূহকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম—এক ভাগে, যাহারা অধিকতর সবলকায়; অন্য ভাগে, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায়। এক্ষণে ইহা এক রূপ নিঃসন্দেহ যে, যাহারা অধিকতর সবলকায় তাহারা বসন্তকালে অন্য দলের অগ্রেই অবশ্য গর্ব্ভধারণে সক্ষম হইবে—জেনর উয়ের সাহেবের ন্যায় এক জন বিখ্যাত পক্ষিচরিত্রবিৎও এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়েও সন্দেহ অল্প যে, যাহারা সবলকায় এবং

* ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার ন্যূনাধিক্য নির্ণয় করিবার জন্য যে সকল তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য—এত অল্প যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার উপর আর এক শঙ্কট এই যে যৌননির্ব্বাচনের পক্ষে কেবল মাত্র জন্মকালের ন্যূনাধিক্য স্থির করিলে চলিবে না—পরিণত বয়সে কি রূপ দাঁড়ায় তাহাই দেখিতে হইবে। এবং ইহা স্থির করা এক্ষণে এক রূপ অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। ইহা নিশ্চয় যে মনুষ্য মধ্যে প্রসবকালে, তৎপূর্ব্বে এবং শৈশবে বালিকার অপেক্ষা বালকের অধিক মৃত্যু হয়। মেষ এবং সম্ভবতঃ আরও কোন কোন শ্রেণীর জীবের মধ্যেও ঐ রূপ। কতকগুলি জীবের পুরুষেরা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে। কতকগুলি পরস্পরকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় এবং ক্রমে শীর্ণকায় হইয়া পড়ে। যখন তাহারা ব্যগ্রতা সহকারে ইতস্ততঃ সঙ্গিনী খুঁজিয়া বেড়ায়, সে সময়েও অনেক বিপদ ঘটে। কতকগুলি মৎস্যের পুরুষেরা স্ত্রীগণ অপেক্ষা অনেক ছোট, তাহারা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অথবা অন্য মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার অন্যদিকে, স্ত্রীগণ যখন কুলায় বসিয়া সন্তান রক্ষা করে তখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোন কোন স্থলে পরিণতদেহ স্ত্রীগণ পুরুষের ন্যায় লঘুগতি নহে, সুতরাং ভাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এই সকল কারণে বন্য জীবের মধ্যে পরিণত বয়সে স্ত্রীপুরুষের ন্যূনাধিক্য স্থির করা দুঃসাধ্য। তবে ইহা এক প্রকার জানা আছে যে কোন কোন স্তন্যপায়ী জীবের, কতকগুলি পক্ষীর এবং কোন কোন শ্রেণীর মৎস্যের এবং কীটের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র এ রূপ নহে। *Vide Darwin's Descent of Man Part II. chap VIII. supplement.*

† অনেকগুলি স্তন্যপায়ী জীব এবং কতকগুলি পক্ষী বহুবিবাহ পরায়ণ; কিন্তু নিম্নতর জীবশ্রেণীতে এ প্রবৃত্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অগ্রে গর্ভধারণের উপযুক্তা, তাহারা অধিকসংখ্যক বলবান্ অপত্য সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইবে। বসন্তাগমে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অগ্রেই যৌনসম্বন্ধলোলুপ হয়; যাহারা বলবান্ তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাড়াইয়া দিয়া, সবলকায় স্ত্রীদিগের সঙ্গ লাভ করে, কেন না দুর্ব্বলকায় স্ত্রীরা তখনও পুরুষসংসর্গে প্রস্তুত নহে। এই সকল বিজয়ী পুরুষ এবং সবলকায় স্ত্রী অবশ্য অধিকসংখ্যক বলবান অপত্য সংরক্ষণ করিবে। পরাজিত পুরুষেরা দুর্ব্বলকায় স্ত্রীসাহচর্য্য করে, সুতরাং তত অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারে না। এই রূপ নির্ব্বাচন বহুকাল ধরিয়া হইয়া যায়—বৎসর যায়, শতাব্দী যায়, সহস্রাব্দী যায়, যুগ যায়, কল্প যায়—কালে সেই জাতীয় পুরুষদিগের শারীরিক আয়তন, শক্তি সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আরও একটা কথা আছে। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই যে স্ত্রীলাভ হয় এমন নহে। বিজয়ী বীর যদি সেই স্ত্রীর মনের মত না হয়, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যাত হয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীলোকের মন পুরুষে সহজে পায় না—অনেক উপাসনা করিতে হয়, বিহঙ্গীগণ, কেহ রূপের ভিখারিণী, কেহ সংগীতপাগলিনী, কেহ নৃত্যোন্মাদিনী, সুতরাং যুদ্ধজয়ীর অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ ঘটিতেও পারে, না ঘটিতেও পারে। ডাক্তর কোভালেভ্স্কি বলেন যে কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যায়, যে পুরুষেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, স্ত্রী হয় ত সেই অবসরে কোন যুদ্ধভীরু নবীন যুবার সঙ্গে সরিয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীগণ শক্তির পক্ষে একেবারে অন্ধ নহে—যেমন রূপ চায়, নৃত্যগীত চায়, তেমনি সামর্থ্যও চায়। জেনর উয়েব সাহেব বলেন যে, যে সকল পশীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহাদের মধ্যেও পুরুষ আহত হইলে অথবা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে স্ত্রীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং অধিকতর পরিণতদেহ স্ত্রীগণ—যাহারা প্রথম বসন্তে যৌনসাহচর্য্যোৎসুক হয়—অনেক পুরুষের মধ্য হইতে মনোমত সঙ্গী বাছিয়া লইতে পায়; এবং যদিও তাহারা কেবল মাত্র শক্তি দেখিয়া আত্মসমর্পণ না করুক, যাহাদিগকে তাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা নারীহৃদয়জিৎ অন্যান্য গুণের সঙ্গে সবলতা এবং সামর্থ্যেরও অধিকারী। পিতা মাতা উভয়েই সবলদেহ হওয়ায় অপত্যসংরক্ষণ উত্তম হয়—অন্যের অপেক্ষা ভাল হয়। কালের স্রোতঃ বহিয়া যায়, পুরুষেরা ক্রমে অধিকতর বলবান্, অধিকতর যুদ্ধশীল অধিকতর সুন্দর, অধিকতর মনোহর হইয়া উঠে।

এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দ্বিবিধ। এক প্রকার কার্য্যে পুরুষেরা কলহ বিবাদ করে, দুর্ব্বলেরা পলাইয়া যায়, সবলেরা স্ত্রীলাভ করে। ইহাতে স্ত্রীগণ

কোন প্রকার বাছনি করে না—তাহারা নির্ব্বাচনচেষ্টাশূন্যা—জোর যার, স্ত্রী তার। দ্বিতীয় প্রকার কার্য্যে, পুরুষেরা স্ত্রীলাভ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু স্ত্রীগণও চেষ্টাশূন্যা নহে—তাহারা আপন মনের মত পুরুষকে আত্মসমর্পণ করে।

প্রায়শঃই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেই যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা অধিকতর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ জীবের মধ্যেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের সঙ্গে শাবকদিগের অধিকতর সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে, প্রায় সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রীদিগের অপেক্ষা পুরুষের আগ্রহ অধিক। অধিকতর ব্যগ্র বলিয়া পুরুষেরাই পরস্পর যুদ্ধ করে, আপনাদের বর্ণবৈচিত্র লইয়া স্ত্রীদিগের সমক্ষে ঘটা করে, স্ত্রীগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য উন্মুক্তকণ্ঠে স্বরলহরী বিস্তার করে। যাহারা জয়লাভ করে, তাহারা সিদ্ধমনোরথ হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এই সকল গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেনই যে প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষেরাই অধিকতর ব্যগ্র ইহা বুঝা সুকঠিন। তবে ইহা বুঝা যায় যে, স্ত্রী অনুসরণে কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে ব্যগ্রতা প্রয়োজনীয়; এবং যাহাদের ব্যগ্রতা অধিক তাহাদের অপত্য সংখ্যাও অধিক হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রায়শঃই পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অনুসরণ এবং অন্বেষণ করে, এবং তজ্জন্য যৌননির্ব্বাচনের দ্বারা পুংপ্রকৃতিরই অধিকতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যায় যে স্ত্রীগণই সমধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—সামর্থ্য, শারীরিক বৃহত্ত্ব, কলহপ্রবণতা, বর্ণ বৈচিত্র্য উপার্জ্জন করিয়াছে। কোন কোন জাতীয় পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায়, যৌন-সাহচর্য্য সংস্থাপন প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগণই অধিকতর ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে—পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত ধীর। কুক্কুট জাতীয় কোন কোন বিহঙ্গী এইরূপে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্ণোজ্জ্বলা এবং অলঙ্কারাধিক্য লাভ করিয়াছে—অধিকতর বলশালিনী এবং কলহরতা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা মুখচোরা, স্ত্রীলোকেরা গায়ে পড়া—সাহচর্য্য করিতে এত ব্যগ্র যে গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। এ স্থলে প্রতীয়মান হইতেছে, যে যৌননির্ব্বাচনের স্রোতঃ উজান বহিয়াছে।

উজান হউক ভাটা হউক, এ উভয়বিধ প্রক্রিয়াতেই যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য এক তরফা। কিন্তু কোন স্থলে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য দুই তরফাও হইয়াছে। পুরুষেরাও বাছনি করিয়াছে, স্ত্রীলোকেরাও বাছনি করিয়াছে—"বিনা গুণ পরখিয়া" কেহই মজে নাই—স্ত্রীগণ যেমন মনোহর পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, পুরুষেরাও তেমনি মনোহারিণী স্ত্রী দেখিয়া অনুগত হইয়াছে।

এ রূপ স্থলে বাহ্য দৃশ্য স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য বড় লক্ষিত হইবে না, কেননা যাহা পুরুষের চক্ষে সুন্দর তাহাই যদি স্ত্রীর চক্ষে সুন্দর হয়, তাহা হইলে উভয়েতেই সেই সৌন্দর্য্যের পুষ্টি হইবে। তবে যদি স্ত্রীপুরুষের সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী রুচি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের স্ত্রীপুরুষে রুচির স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যে কোন স্থলে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনচিহ্ন সকলের পরিপুষ্টি উপলক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই যে বুঝিতে হইবে উভয় পক্ষ হইতেই সমসাময়িক বাছনি হইয়াছে, এমন কিছু কথা নহে। বরং তাহা না হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা, কেননা প্রায় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যেই পুরুষেরা এত ব্যগ্র যে প্রায় বাছাবাছি করে না—স্ত্রী হইলেই হইল, যাহাকে পায় তাহারই সাহচর্য্য করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যৌনচিহ্নের পরিপুষ্টি অন্য কারণেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, পুরুষে প্রথম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্ত্তন পুত্র কন্যা উভয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, কোন কারণ বশতঃ বহুকাল ব্যাপিয়া তজ্জাতীয় জীবের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে; এবং পরে হয়ত আবার অন্য কোন কারণে তেমনি বহুকাল ধরিয়া স্ত্রীসংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। একরূপ হইলে সহজেই বুঝা যায়, যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ হইতে বাছনি হইয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ণবৈচিত্র প্রভৃতি যে সকল চিহ্নকে আমরা যৌনচিহ্ন বলি, সে সকল যে সর্ব্বত্রই যৌননির্ব্বাচনের ফল, অন্য প্রকারে ঘটিতে পারে না, এ কথাও বলা যায় না। কোন কোন জীবের মধ্যে অসামান্য বর্ণবৈচিত্র এবং বর্ণৌজ্জ্বল্য দেখা যায়, অথচ তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে, তাহাদের মধ্যে যৌন নির্ব্বাচনের অস্তিত্ব সম্ভবে না। একরূপ অনেক সামুদ্রিক জীব* আছে, যাহাদের বর্ণ অসামান্য উজ্জ্বল, কিন্তু তাহাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ইহাকে যৌননির্ব্বাচনের ফল বলিয়া গণ্য করা যায় না, কেন না তাহাদের কতকগুলির মধ্যে স্ত্রীপুং উভয় প্রকৃতিই একই ব্যক্তিতে সংস্থিত, কতকগুলি স্থানৈকসংবদ্ধ এবং চলৎশক্তিবিরহিত, এবং সকলেরই মানসিক স্ফূর্ত্তি অতিসামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ইহাদের বর্ণৌজ্জ্বল্য কখনই যৌননির্ব্বাচনের ফল নহে।

এ সকল স্থলে হয়ত প্রাকৃতিক নির্ব্বা-

* For instance, many corals and sea anemones (Actiniae), some jelly-fisn (Medusae, porpita &c), some Planeriae, many star fishes Ascidians &c.

চনে বর্ণৌজ্জ্বল্য উপার্জ্জিত হইয়াছে,—হয় ত জীবনসংগ্রামে বর্ণদীপ্তি তাহাদের রক্ষার উপায়ীভূত—হয় ত এতদ্দ্বারা তাহারা শত্রুর লক্ষ্য অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যে অনেক গুণ উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণও দেওয়া যায়। ওয়ালেশ* সাহেব বলেন, যে "গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে অরণ্যানী কখনই পত্রবিরহিত হয় না, যেখানে বৃক্ষ সকল চিরশ্যাম-শোভায় পরিশোভিত, সেখানে বহুসংখ্যক শ্রেণীর পক্ষী দেখা যায়, তাহাদের একমাত্র বর্ণ, শ্যাম।" সুতরাং যখন তাহারা বৃক্ষে থাকে, তখন তাহাদের শ্যামবর্ণ পাদপের শ্যামলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—শত্রুকর্তৃক তাহারা সহজে দৃষ্ট হয় না। বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণের শ্যামবর্ণ বোধ হয় এইপ্রকারে লব্ধ। আবার যে সকল পক্ষী ভূম্যাশ্রয়ী তাহারা মৃত্তিকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়—যেমন চাতক প্রভৃতি।† ট্রিস্‌ট্রাম সাহেব বলেন যে, সাহারা মরুভূমের অধিকাংশ অধিবাসী জীব জন্তুর বর্ণ বালুকার ন্যায়। কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যৌন-নির্ব্বাচন উভয়ের কার্য্য একত্র দেখা যায়। সাহারা প্রদেশে এরূপ কতকগুলি পক্ষী আছে যাহাদের মস্তক এবং গাত্র বালুকার ন্যায় বর্ণপ্রাপ্ত, কিন্তু পাখার নিম্নভাগ অপূর্ব্ববর্ণে রঞ্জিত। পক্ষ বিস্তার করিয়া যখন তাহারা দেখায় কখনই তাহাদের বর্ণবৈচিত্র দেখা যায় —যাহাকে দেখায় সেই দেখে—নতুবা দেখা যায় না। এস্থলে ইহাই অনুমেয় যে তাহাদের মস্তকের এবং গাত্রের বর্ণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনলব্ধ এবং পক্ষ-নিম্নভাগ যৌননির্ব্বাচনে রঞ্জিত।

অনেকেই বলিবেন যে, বৃক্ষাশ্রয়ীর শ্যামবর্ণ, ভূম্যাশ্রয়ীর মৃদ্বর্ণ, মরুভূমবাসীদিগের বালুকাবর্ণ যেন সংরক্ষণের উপায়ীভূত বলিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা সিদ্ধ হইল, কিন্তু বর্ণের ঔজ্জ্বল্য অথবা বৈচিত্র কিরূপে সংরক্ষণের উপায় হইতে পারে? যাহার বর্ণ উজ্জ্বল সে বরং শত্রুকর্তৃক আরও সহজে উপলক্ষিত হইবে। সুতরাং লোহিত অথবা তদ্রূপ নয়নাকর্ষক কোন বর্ণ কখনই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সিদ্ধ নহে, অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, যাহাদের মধ্যে যৌননির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই, অতি সমুজ্জ্বল বর্ণোপেত। ইহাদের বর্ণদীপ্তি কিরূপে, কোথা হইতে আসিল?

ইহার ত্রিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম,—হাকেল বলেন যে, কেবল জেলি-মৎস্য বলিয়া নহে, অনেক ভাসমান মলস্কা, ক্রুসটেসিয়ান এবং ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্য এইরূপ অতি প্রোজ্জ্বল

* Westminster Review July 1867 p. 5.

† Partridge, snipe, wood-cock certain plovers. lark, night jars &c.

বর্ণশোভিত। অতএব এমন হইতে পারে যে এই সকলের সাহচর্য্যে উহারা বাঁচিয়া যায়। উজ্জ্বলবর্ণ জীবের নিকটে থাকায় ইহাদের ঔজ্জ্বল্য রক্ষার উপায় স্বরূপ হইতে পারে—সহজে এক হইতে অন্যকে চিনিয়া লওয়া যায় না। দ্বিতীয়,—অনেকস্থলে উজ্জ্বল বর্ণ অস্বাদকটুতার পরিচায়ক—যাহাদের শরীরের বর্ণ দীপ্তিমান, তাহারা অখাদ্য। অতএব এমনও হইতে পারে যে, এই সকল জীবের বর্ণ সমুজ্জ্বল বলিয়া ইহারা শত্রু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এ উভয় ব্যাখ্যাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অনুকূল। তৃতীয়,—হয় ত ইহাদের বর্ণৌজ্জ্বল্য ইহাদের শারীরিক গঠনের ফল—লাভালাভের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ডারুইন সাহেব এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, লাভ না থাকিলেও শারীরিক অংশবিশেষের রাসায়নিক প্রকৃতির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মনে কর, মনুষ্যদেহের শোণিতের ন্যায় সুন্দর বর্ণ বোধ হয় কিছুরই নাই; কিন্তু শোণিতের বর্ণ লইয়া কোন লাভই নাই—শরীরের রক্ত শ্বেত অথবা পীত হইলেও বোধ হয় কিছু ক্ষতি হইত না। হয় ত কোন নবেল্‌প্রিয় পাঠক বলিয়া বসিবেন—রক্তের লৌহিত্যে কোন লাভ নাই কে বলিল?—ইহাতে সুন্দরীর গণ্ডের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। তা বটে, স্বীকার করি, শোণিতের লৌহিত্য সুন্দরীর সুন্দর গণ্ড সুন্দরতর করে, স্বীকার করি, তাহা দেখিয়া উষ্ণশোণিত যুবার হৃদয়শোণিত আলোড়িত হয়; কিন্তু সুন্দরীর গণ্ড সুন্দর করিবার জন্যই শোণিত লোহিত বর্ণ পাইয়াছে, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবে না। এতটা বাড়াবাড়ি করিতে বোধ হয় কাহারও সাহস হইবে না।

এতক্ষণ পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, কোন কোন্ স্থলে বর্ণবৈচিত্র যৌননির্ব্বাচনের ফল, কোথায় বা অন্য কারণ সম্ভূত, ইহা স্থির করা অতি সুকঠিন ব্যাপার। তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, সকল জীবের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে বর্ণের তারতম্য আছে—স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বর্ণ অধিকতর সুন্দর, অধিকতর বিচিত্র—অথচ ইহাদের জীবনপ্রণালীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যে তদ্দ্বারা এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে স্থলে বর্ণবৈচিত্র যৌননির্ব্বাচনের ফল বুঝিতে হইবে। ইহার উপর যদি স্ত্রী পুরুষের কাছে অথবা পুরুষ স্ত্রীর কাছে অপরের কাছে এই সৌন্দর্য্য লইয়া ঘটা করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে আর সন্দেহ থাকে না—তখন নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, এ বর্ণবৈচিত্র যৌননির্ব্বাচনেরই ফল।

এতক্ষণ আমরা যে সকল কথা লইয়া আন্দোলন করিলাম তাহাতে বোধ হয় এক প্রকার বুঝা গেল যৌননির্ব্বাচন

কি—ইহার কার্য্য কি রূপ—ইহার ফল কি রূপ? এক্ষণে যৌননির্ব্বাচনে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে একবার তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। যদি এ উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এ তুলনার অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্যপ্রণালী যে রূপ কঠোর, যৌননির্ব্বাচনের তেমন নহে। জীবন এবং মৃত্যু লইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ব্যবসায়। যৌননির্ব্বাচনের কার্য্যেও কোথাও কোথাও মৃত্যু সংঘটিত হয়—সময়ে সময়ে পুরুষদিগের মধ্যে স্ত্রী লইয়া এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, যে এক জন না মরিলে আর তাহার অবসান হয় না। কিন্তু প্রায়ই এতদূর গড়ায় না। অধিকাংশ স্থলেই এই পর্য্যন্ত হয় যে, পরাজিত পুরুষে হয় ত স্ত্রীলাভ করিতে পারে না—হয় ত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পুরুষ স্ত্রী বিলম্বে প্রাপ্ত হয়—তজ্জাতীয় জীব যদি বহুবিবাহপরায়ণ হয়, তাহা হইলে হয় ত অল্পসংখ্যক স্ত্রী প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অধিকসংখ্যক এবং বলবান্ অপত্য রাখিয়া যাইতে পারে না—হয় ত অপত্যই রাখিয়া যাইতে পারে না।

অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের সীমা আছে। একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সে শ্যামবর্ণের সীমা আছে—বৃক্ষপত্রের যে শ্যামবর্ণ সেই শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হইলেই বর্ণ পরিবর্ত্তনের সীমা হইয়া গেল, কেন না তদপেক্ষা গভীরতর শ্যামবর্ণ রক্ষার উপায় না হইয়া বরং ধ্বংসের কারণ হইবে—শত্রুগণ সহজে চিনিতে পারিবে শরীরের শ্যাম আর বৃক্ষশ্যামে ঢাকিবে না। যৌননির্ব্বাচনসম্পাদিত পরিবর্ত্তনের এ রূপ সীমা নাই—ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং নির্ব্বাচন প্রক্রিয়া সমান চলিবে। তবে, কোন গুণ কতদূর পুষ্ট হইবে তাহা অবশ্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। তত্তৎ গুণের সমধিক পুষ্টি যদি ক্ষতিজনক এবং বিপদসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে অবশ্য তত পুষ্ট হইবে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে এতদ্বৈপরীত্যও দেখা যায়, অর্থাৎ যৌননির্ব্বাচনে অঙ্গবিশেষের এরূপ পরিণতি হয় যে তাহা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিজনক। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন কোন শ্রেণীর মৃগের শৃঙ্গপরিণতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের শৃঙ্গ এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে তদ্দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা—শত্রুহস্ত হইতে পলায়নের অন্তরায় হইয়া উঠে। মনুষ্যদেহের লোমহানি ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত। শীতপ্রধান দেশের ত

কথাই নাই, গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও লোম হানি ক্ষতিজনক, কেননা ইহাতে শরীরে অধিকতর সূর্য্যোত্তাপ লাগে। অথচ যৌননির্ব্বাচনে এই ক্ষতিজনক পরিবর্ত্তি ঘটিয়াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় অথবা স্ত্রী চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া পুরুষের যে লাভ, অবস্থার উপযোগিতা নিবন্ধন লাভের অপেক্ষা তাহা অধিক।

এবারে আমরা যৌননির্ব্বাচন কি, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। আগামীতে মনুষ্য সমাজে যৌননির্ব্বাচনের কার্য্য কি প্রকার, তাহার সমালোচনা করা যাইবে।

মণিপুরের বিবরণ।

প্রথম প্রস্তাব।

মণিপুরীয়গণ আর্য্য কি না ?

ভীষ্ম পর্ব্বারম্ভে লিখিত আছে যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সঞ্জয়, যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আমার অন্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি আমার নিকট, সেই ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন কর।" তৎপরে সঞ্জয় ভারতবর্ষের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সঞ্জয় প্রথমে সাতটী প্রধান পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির জন্য এক "প্রভৃতি" শব্দে শেষ করিলেন। পরে ১৬৯টী নদ নদীর নাম উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ বলিলেন, "ইহা ভিন্ন সহস্র২ নদী অপ্রকাশিত আছে। তৎপরে জনপদ গুলির নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর দিকে নূনাধিক ১৫০, ও দক্ষিণাপথে ৬৯টী জনপদের নাম করিলেন। কিন্তু ইহার এক স্থানেও মণিপুরের নাম নাই। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে ভ্রমক্রমে একটি প্রধান আর্য্যরাজ্যের উল্লেখ করেন নাই, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্বে মণিপুরের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহাকে তদানীন্তন একটি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভীষ্মপর্ব্বে ইহার নাম উল্লেখ না থাকাতে মণিপুর একটি আর্য্যরাজ্য কি না আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

কোন ইংরেজি লেখক বলেন, মহাভারতে মণিপুরের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইতেছে,

তৎসমুদায়ই অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচায়ক মাত্র। আমরা ঘনটাচক্রে বাধ্য হইয়া মহাভারতের মত উপেক্ষা করিয়া সাহেবের মত পোষণ করিতে চলিলাম, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। হুইলার সাহেব মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিকাল এজেণ্টের রিপোর্টের* উপর নির্ভর করিয়া মহাভারতের ঐ সকল অংশ অলীক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দৃঢ় প্রত্যয়োপযোগী চাক্ষুষ ও অবস্থাঘটিত প্রমাণ না পাইলে কখনই হুইলার সাহেবের মত সমর্থন করিলাম না।

আমাদের বিবেচনায় মণিপুর প্রাচীন অসভ্যদিগের আবাসভূমি। মণিপুরের রাজবংশও অনার্য্যবংশসম্ভূত। তবে এইরূপ উল্লেখের কারণ কি? আদিপর্ব্বে অর্জ্জুনবনবাসে মণিপুরের নাম প্রথম দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, অর্জ্জুনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর বনবাস সম্পূর্ণ কল্পনামূলক।† কেবল অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য এই অধ্যায়ের সৃষ্টি। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "ভারত" রচনা করেন। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে তাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোমহর্ষণসুত সৌতি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণের নিকট সেই ভারত উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। সাধারণে একটি প্রবাদ অবগত আছেন, "তিন নকলে আসল খাস্ত।" মহাভারত সম্বন্ধেও যে তদ্রূপ কিছু না হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আবার পরবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীও যে মধ্যে মধ্যে তন্মধ্যে স্বরচিত শ্লোকের সমাবেশ করেন নাই তাহাও নহে। পুরাণ গুলির বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের এই সকল যুক্তি অকর্ম্মণ্য বোধ হয় না। আমাদের মতে মণিপুরের বিবরণাংশটি এইরূপে ভারতে স্থানলাভ করিয়াছে।

আদৌ মণিপুরীয়দিগের মুখাকৃতি দর্শন করিলে, ইহাদিগকে কোন মতেই আর্য্যজাতি বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ইহাদের ভাষায় সংস্কৃতের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না‡।

তৃতীয়তঃ, মণিপুরীয়দিগের আচার ব্যবহার।¶

চতুর্থতঃ মণিপুরীয় জাতি। আমরা যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে মণিপুরে তিনটি শ্রেণীই প্রধান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

---

* In Culloch's account of Manipuri.

† হুইলার সাহেব এই সম্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

‡ মণিপুরীয় ভাষায় শতভাগে একভাগ মাত্র বাঙ্গালা ভাষা পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

(See Jorn Bengal A. society vol vi) এ সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ হইবে।

¶ ইহাও প্রস্তাবান্তরে লেখা যাইবে।

কায়স্থ। এতদ্ব্যতীত আর যে কয়েকটী নীচদাসশ্রেণী আছে তাহারা সকলেই মণিপুরের পার্শ্বস্থ অনান্য পার্ব্বত্যজাতি। তাহার প্রথম উদাহরণ "কালাছা"। ইহারা সর্ব্ব প্রথমে কাছার বা হেরম্ব রাজ্যের অধিবাসী ছিল। কাছারের যে সকল অংশ মণিপুরপতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে সেই অংশই তাহাদের প্রধান বাসস্থান। এতদ্ব্যতীত আর একটি প্রবাদ আছে, মণিপুরপতি কাছার বিজয় করিয়া যে সকল লোককে বন্দী করিয়া আনেন তাহাদিগকেও "কালাছা" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ দাসরূপে পরিগণিত হয়।

যে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়গণই মণিপুরের প্রকৃত প্রাচীন অধিবাসী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেক দিন পরে বঙ্গদেশ হইতে তথায় গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ অবশ্য বাঙ্গালির উপনিবেশের কথা শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা সপরিবারে তথায় গমন করেন নাই। কোন কার্য্য উপলক্ষে মণিপুরে গিয়া তত্রত্য কোন ক্ষত্রিয়কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রণয়িনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া জন্মভূমির মমতা "বরাক" নদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এ কারণেই মণিপুরে "ব্রাহ্মণ" ও "কায়স্থ" জাতির উৎপত্তি। তাহাদের সন্তান সন্ততি, "বন্দ্যোপাধ্যায়" "মুখোপাধ্যায়" "চক্রবর্ত্তী" "ঘোষ" "বসু" "দত্ত" প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন।*

---

* জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর ও মাইজখাড়ের ঘোষ বংশের 'বংশাবলিতে" দৃষ্ট হইতেছে, পদ্মলোচন রায় উজিরের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কবিবল্লভ পিতৃপদ "উজিরি" (ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান সচিব) লাভ করেন। দ্বিতীয় কবিরত্ন ত্রিপুরার সুবা (সৈন্যাধ্যক্ষ) হন। তৃতীয় পুত্র কবিচন্দ্র ত্রিপুরার অন্যতর সেনাপতি ছিলেন। কবিচন্দ্র যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যে মণিপুরে গমন করিয়া তত্রত্য কোন ক্ষত্রিয় বালিকার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া, মণিপুরে দক্ষিণরাঢ়ীয় সৌকালীন ঘোষ বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অধস্তন দশম ও একাদশ পুরুষ এইক্ষণও জীবিত আছে। সময় নির্ণয় করিবার জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রতি পুরুষে গড়ে ১৬ হইতে ২৩ বৎসর ধরিয়া থাকেন। এস্থলে আমরাও কবিচন্দ্রের মণিপুর গমন সময় অবধারিত করিবার জন্য দশ পুরুষে (১৬ বৎসর হিসাবে) ১৬০ বৎসর নির্ণয় করিতে পারি প্রকৃত পক্ষেও খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল এমত বোধ হয় না। মণিপুরের বর্ত্তমান পলিটিকাল এজেণ্ট ডেমেণ্ট (Damant) সাহেব মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশের সময় খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ অবধারিত করিয়াছেন। (see Jorn. Bengal A. society vol XLVI. part I.) হুইলার সাহেবও এরূপই লিখি-

মণিপুরীর ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীর পাকান্ন ভোজন করেন না। তদ্গর্ভজ সন্তান গুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পাকান্ন পিতা কিম্বা অন্য কোন ব্রাহ্মণের ভোজন করিতে নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে, যথা "আরিবম"ও "আনোবম।"

"আরিবম" অর্থাৎ "পূর্ব্বাগত" অর্থাৎ যাহারা বহুকাল পূর্ব্বে মণিপুরে গমন করিয়াছেন,"আনোবম" অর্থে"নবাগত" অর্থাৎ যাহারা অল্পকাল মাত্র মণিপুরে উপস্থিত হইয়াছে। নবাগত যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, কাহারও পিতা বা পিতামহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মণিপুরে বাস করিয়াছেন, যদিও সেই প্রাচীন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের সন্তান সন্ততিগণ মণিপুরের ভাষা ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, তথাপি কোন কোন শব্দ দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রকৃত মণিপুরিয়া অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ পিতাকে "পাবা" বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি "বাবা" শব্দটী বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই রূপ ক্ষত্রিয়গণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে "দাদা" বলে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সেই অতি আদরের "দাদা" শব্দটী অদ্যাপি স্মরণ রাখিয়াছেন। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কায়স্থগণ "লাইরিএংবম" নামে পরিচিত। "লাইরিক" অর্থ পুস্তক, "এংবা" অর্থ দেখা। মণিপুরীয় ভাষার এই দুইটী শব্দ যোগ করিয়া "লাইরিএংবম" হইয়াছে। ইহার যৌগিক অর্থ "যে জাতি পুস্তক দেখে,"আর একটি বিস্ময়ের বিষয় আমরা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর ৩ জন মণিপুরীয় একবারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যত অবিলম্বে বলিতে শিখে, একজন ক্ষত্রিয় তত শীঘ্র পারে না। এমন কি ক্ষত্রিয়েরা কখনই তাহাদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারে না।

আমাদের বিশ্বাস যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারাই মণিপুরের প্রাচীন প্রকৃত অধিবাসী। তাহারা যদিও এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে তথাপি তাহাদিগকে অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালে কেবল ক্ষত্রিয়গণই যে মণিপুরে বাস

যাছেন। "And it is somewhat remarkable that no trace of Brahmanism can be found in Manipore of an earlier date than the beginning of the last century."

W. History of India Vol I. page 149.

করিতে গিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, কারণ তাঁহাদের সহিত আর যে দুটী মিশ্র* আর্য্যজাতির উল্লেখ করিলাম তাহারা যে অল্প কাল হইল তথায় গিয়াছেন তাহা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। হুইলার সাহেব মণিপুরীরদিগকে নাগ নামক অসভ্য বংশ হইতে সমুৎপন্ন লিখিয়াছেন।

বোধ হয় পাঠকগণ অনবগত নহেন যে অদ্যাপি মণিপুরের পার্শ্বে "নাগা পর্ব্বত" আছে। ঐ স্থানেই নাগাদিগের বাস। বোধ হয় এই নাগাগণই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণকর্তৃক "নাগ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মণিপুরের বর্ত্তমান রাজবংশজগণ আপনাদিগকে নাগকুলে উৎপন্ন বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। মণিপুরের রাজসিংহাসনের নিম্নে একটি সর্প বাস করিতেছে বলিয়া অদ্যাপি প্রবাদ আছে। সেই সর্পের নাম "পাখংবা।" পাখংবা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ অথচ কুলদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মণিপুরীয়গণ এইরূপ অনার্য্য বংশোদ্ভব হইয়া কিরূপে হিন্দুসমাজভুক্ত হইল, বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের পতিতপাবন বৈষ্ণব প্রভুদিগকে মনে পড়ে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই "হরি" "হরি" বলাইয়া উদ্ধার করিতেছেন, মণিপুরীয়গণ তাঁহাদের দ্বারাই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭৫ বৎসরের অধিক অতীত হয় নাই, তাহারা অন্যান্য পর্ব্বত্যজাতিদিগের ন্যায় কদর্য্য আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে তাহারা মহিষ, বরাহ, কুক্কুট প্রভৃতির মাংস ভোজন করিত তাহা তাহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মণিপুরীয়গণ এতদূর গোঁড়া বৈষ্ণব যে পাঁঠার নাম উল্লেখ করিতে হইলে "বাঙ্গালির তরকারি" বলে।

মণিপুরপতি রাজা চিংতোমখোম্বার† রাজত্ব সময়ে, শ্রীহট্টবাসী জনৈক অধিকারী মণিপুরে উপস্থিত হইয়া, চৈতন্যের প্রেমতরঙ্গে "মণিপুর" ভাসাইয়া দিলেন। রাজা প্রজা সকলেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই মণিপুরীয়গণ রাসক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভাগ্যচন্দ্র (এই রাজা) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মণিপুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

* মণিপুরীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ "মিতাই" বলিয়া পরিচিত। "মিতাই" অর্থ মিশ্রজাতি। অধুনা ক্ষত্রিয়গণও আপনাদিগকে "মিতাই" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

† চিংতোম খোম্বার সময় হইতেই মণিপুরপতিদিগের হিন্দুনাম দৃষ্ট হয়। এই নৃপতির "ভাগ্যচন্দ্র" "কর্ত্তা" প্রভৃতি কতকগুলি নাম ছিল। এচিসন সাহেব ইহাকে "ভরতসাহি" লিখিয়াছেন।

Aitchison's Treaties. Vol. I. page 121.

ডেমেণ্ট সাহেবের মতে এই ঘটনাটি আরও কিছু পূর্ব্বে হইয়াছিল। তিনি বলেন "চারাইরংবার*" রাজ্যশাসন সময়ে মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হয়। আমরা স্বীকার করি চারাইরংবার রাজত্ব সময়েই হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন সকল মণিপুরে প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মণিপুররাজকুলতিলক ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্ব কালেই তাহা সংশোধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মণিপুরের প্রাচীন অধিবাসী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের পূর্ব্ব অসভ্য সময়ের দেবতা "পাখংবা" "লেমাম্নন" প্রভৃতির অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এই সকল দেবতার উপাসনা করে না। বরং প্রকাশ্যরূপে ঘৃণা করে। তাহারা কেবল নারায়ণের উপাসনানিরত।

অধিকারী মহাশয়েরা খুঁজিয়া মণিপুরেশ্বরকে বুঝাইয়া দিলেন, যে তাঁহারা চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়। কেবল এতকাল আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। উপদেশ দ্বারা অসভ্যদিগকে যত সহজে ধর্ম্মপথে আনিতে পারা যায়, সভ্যদিগকে আনা তাদৃশ সহজ নহে। তাহার উদাহরণ "সাঁওতাল"। একদিকে আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ কালীপূজা ও চণ্ডীপাঠের উপলক্ষ করিয়া সাঁওতালদিগের অর্থ শোষণ করিতেছেন, অপরদিকে পাদ্রি-মহাশয়গণ টানিতেছেন।

মণিপুরপতি ক্ষত্রিয় হইলেন। স্বজাতীয় প্রজাবর্গকে ভিন্ন রাখিতে পারিলেন না। দেশশুদ্ধ লোক পবিত্র হইয়া গেল।

বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার পার্ব্বত্যজাতি আছে মণিপুরীগণ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। † প্রায় সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মণিপুরীয় মহিলাগণ যখন পুষ্পাভরণে সজ্জিত হন, তখন আমাদের ঋষিগণের বর্ণিত গন্ধর্ব্বকুমারী বলিয়া ভ্রম জন্মে। বোধ হয় তাহাদের রূপরাশিই মণিপুরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশ সৃষ্টির প্রধান কারণ। এইরূপে বাঙ্গালিবংশ বৃদ্ধি হওয়া আমাদের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরস্পর ধর্ম্মবিদ্বেষ উত্থান নিতান্ত দুঃখের কারণ। মণিপুরীয়গণ একজন বৈষ্ণব দর্শন করিলে অনায়াসে তাঁহার চরণামৃত গ্রহণ করে। কিন্তু শাক্ত ব্রাহ্মণকেও তাহাদের বাসভবনে প্রবেশ করিতে দেয় না। "পাঁঠাখোর" বলিয়া ঘৃণা করে।‡

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* চারাইরংবা ভাগ্যচন্দ্রের পিতামহ। চারাইরংবা ১৭১৪ খৃঃঅব্দে পরলোক গমন করেন।

† মণিপুরীয়দিগের মুখাকৃতিতে উহাদিগকে "ইণ্ডোচায়নিজ" বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কিন্তু চীনাগণ অপেক্ষা ইহারা সুশ্রী। ইহাদের নাসা ও চক্ষু যদিও আমাদের ন্যায় উন্নত ও বিস্তৃত নহে। তথাপি চীনাদিগের ন্যায় কদর্য্য নহে।

‡ গোস্বামী মহাশয়দিগের দ্বারাও যে মণিপুরীয়দিগের অনিষ্ট না হইয়াছে ইহা কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে সক্ষম নহেন। গোপীভাবে উপাসনা করিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যের ক্রমশঃই লাঘব দেখা যাইতেছে।

বৃত্র সংহার।*

বঙ্গদর্শনে এই কাব্যের প্রথম খণ্ড সমালোচিত হইয়াছিল পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথমখণ্ডের শেষে, দানবপত্নী ঐন্দ্রিলা-কৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। প্রথমখণ্ডের আরম্ভে দ্বাদশসর্গে সেই ক্রোধাগ্নিশিখা দেখিয়া, বৃত্রাসুর স্তম্ভিত, ভীত। শূন্য হতে দৈত্যপতি একাকী দাঁড়ায়ে,

ভূধর আঙ্গেতে স্থির অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ চিহ্ন দেখা দিল।

বৃত্র শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখিয়া আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে, মহিষীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় শচীকে মুক্ত করিয়া শিবকে প্রসন্ন করেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলার মত, শচী তাহার সেবা করিবে। প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টি মিটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আবদার মিটে না। ঐন্দ্রিলা, লেডি মাকবেথের মত স্বামীর আশঙ্কা মুখঝামটায় উড়াইয়া দিলেন। বৃত্র দেখাইয়া দিলেন,

চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখনও শোভিছে মৃদু সুমেরু উপরে দীপ্ত
অন্ধকার যথা!

ঐন্দ্রিলা কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষণ হইয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। অথবা দেবতার মায়া।"

আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!—
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে!

বৃত্রের প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেবসেনাপতির বন্ধন ঐন্দ্রিলা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বৃত্র বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক"। ঐন্দ্রিলা বড় কোপ করিয়া বৃত্রকে গর্ব্বিতলোচনে, গর্ব্বিত বচনে ইন্দ্রজেতাকে ভর্ৎসনা করিল। বৃত্র, ঐন্দ্রিলার ক্রোধ বড় গ্রাহ্য না করিয়া, রতিকে আদেশ করিলেন, যে শচীকে ডাকিয়া আন। আমি তাহার কারাক্লেশ ঘুচাইব। বৃত্র, স্বয়ং প্রাচীরশিরে উঠিয়া দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। হেম বাবুর একটি মণিময় বর্ণনা—

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে!
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল—

* বৃত্রসংহার। কাব্য। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ১৭ সংখ্যক ভবানীচরণ দত্তের লেন। ১২৮৪ সাল।

কোথা অবিরলশ্রেণী—দু' একটি কোথা।
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা। দেখিতে তেমতি
হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবীর জলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমাবস্যা উৎসব নিশিতে,—
মত্ত যবে কাশীবাসী দেবালি উল্লাসে।

অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে রজনীরে ঘেরি!
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,
কোদণ্ড বিশাল মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত তনু তূণীর, ফলক,
তোমর, মার্গণ, ভীম টাঙ্গী খরশান।

কোন খানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ—নেমি দীপ্তিময়:
কোথাও শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।

* * *

কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপু, দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেবরণস্থল।

ত্রয়োদশ সর্গারম্ভে, ইন্দ্র, পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দধীচির আশ্রমে যাইবেন। অরণ্যমধ্যে দৈত্যভয়ে স্বর্গচ্যুতা দেবকন্যাগণ পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া দিনযাপন করিতেন এখন, রজনীর আশ্রয় পাইয়া স্বর দেহ ধারণ করিয়া দিব্যাঙ্গনাগণ সেই অটবী মধ্যে কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন। অল্প কথায় এই চিত্রটী অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভুলিবে না। দেবকন্যাগণ ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথ বলিয়া দিলেন। লোকহিতৈষী পরহিতব্রত, শান্তিরসনিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর। বাসব, ঋষির আশ্রমে দেখা দিলেন। ঋষি, ইন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু, ইন্দ্র, ঋষির প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন—কি প্রকারে তাহা বলিবেন? মুখে বলিতে পারিলেন না—নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ মহা চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। এই সরল, সুধাময়, কথাগুলি বিস্তৃত হইলেও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সাধবাদে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিপ্রায়, গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত?—কি সৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'বে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নেও অতীত!

এতেক কহিয়া মহা তপোধন ধীরে,
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,

গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা,
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়,
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।

জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতি সুবিমল
নিস্থল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে।
সুললাটে আভা নিরুপম! বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে!

বসিলা ধীমান—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে।
চাহি শিষ্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে,
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে,—"কি কারণ,
হে বৎস মণ্ডলি, কেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভব মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে, পায় কত জন।"

* * *

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিয়া এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে, কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র লোচন
তপোধন-শিরঃ স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক!
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন।
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর!"

* * *

বলিয়া রোমাঞ্চ-তনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল!
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ-গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাস শূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে! বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনিন্দ্রে আচ্ছাদি।—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

সুশীতল সুস্থির সাগরবৎ, এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে—ইহার অতল রস-প্রবাহে মন ডুবিয়া যায়।

চতুর্দ্দশসর্গে "চিন্তময়ী" সর্গে ইন্দ্রাণীর বন্দিনী।

———শোভিছে তেমতি।
চির পরিচিত যত অমর বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি।

কিন্তু স্বর্গ আজি অসুরপীড়িত, পরাধিকৃত দেশ—
চিন্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পোড়া দহন আজি।

দেশবৎসলগণকে এই দেশবৎসলার রোদন টুকু পড়িতে অনুরোধ করি। শচী রোদন করিতেছিলেন, এমত সময়ে বৃত্রপ্রেরিতা রতি শচীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, দৈত্যপতি শচীকে মুক্ত করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। শচী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পঞ্চমসর্গে যখন নিঃসহায় অরণ্যে, সম্মুখীন, ভীষণাসুর দেখিয়া, চপলা, তাঁহাকে ছদ্মবেশ ধরিতে বলিয়াছিল—শচী তখন বলিয়াছিলেন

আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন।
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন।

এখনও সেই শচী। রতি মুক্তিসূচক শুভসম্বাদ শুনাইতে আসিলে, শচী বলিলেন

"————শুভ সমাচার
শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ
স্থাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ! কিম্বা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে হে অনঙ্গময়ে,

* * *

না রতি, কহ গে দৈত্যে—চাহি না উদ্ধার
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতি হস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।"
এত কহি স্থির নেত্রে শূন্য দেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীব দুঃখ বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা পদ—দেখিবে তা তুমি?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ। প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্।

শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা,
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা আগারে

পঞ্চদশ সর্গে স্বর্গদ্বারে সুরাসুরের যুদ্ধ এবং অসুরের পরাভব। অসুরের পরাভব দেখিয়া বৃত্র স্বয়ং দেববিজয়োদ্দেশে শিবদত্ত ত্রিশূল পরিত্যাগ করিলেন। অব্যর্থ ত্রিশূলের ত্রাসে সকল দেবগণ লুক্কায়িত হইলেন—ত্রিশূল লক্ষ্য না পাইয়া বৃত্রের করেই ফিরিয়া আসিল। এই যুদ্ধ বর্ণনায় অনেকটা মহাভারতি গন্ধ আছে —এবং স্থানে স্থানে মহাভারতি অত্যুক্তিও আছে—যথা

পড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য)

কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিত্ব-কুসুমও আছে। যথা, যেখানে বৃত্র,

মথিতে লাগিলা বেগে, দেবচমূরাশি
উড়িল অমররন্দ আচ্ছাদি অম্বর
যথা সে কার্পাস রাশি উড়ায় ধুনারি
টঙ্কারি ধুননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।
অথবা যেখানে
ধাইছ মার্ত্তণ্ড
উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ।

যেমন পঞ্চদশ সর্গে, বৃত্রের রণজয়, ... দশ সর্গে তেমনি ঐন্দ্রিলার রণজয়। ...র রণজয় শিবের ত্রিশূলে ... ঐন্দ্রিলার ...র মন্মথের ফুলধনু লইয়া। রসিক কবি, বৃত্রের রণজয়ের অপেক্ষা ঐন্দ্রিলার রণজয় গাঁথিয়াছেন ভাল। আমরা তাঁহার এই পক্ষপাতিতা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে অনেক নিন্দা করিয়াছি।

ঐন্দ্রিলার মনে মনে বড় সাধ, শচী তাঁহার সেবাকারিণী পরিচারিকা হইবে। কিন্তু তাঁহার কৃত শচীপীড়নে রুদ্রদেব রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তাহাতে বৃত্র ভীত হইয়া, শচীকে ছাড়িয়া দিতে-ছিলেন। শুনিয়া, ঐন্দ্রিলা সে ভয় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ব্যঙ্গ শুনিয়া বৃত্র, বীরসুলভ ঘৃণার সহিত মহিষীকে বলিয়াছিলেন, "বামা তুমি?" ঐন্দ্রিলার সে কোপ মনে ছিল—

"বামা আমি, অহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যবামা অৰ্দ্ধ মৃদু-স্বর,
"শচী ছাড়ি, নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার
এতই হেলা॥
আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার,
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার
তোমার (০) যেমন তোমারি আমার;
হে দনুজপতি ...দিবে এবার
বামা কেমন।"

ঐন্দ্রিলার আদেশে মদন তখন স্বর্গে এক অতুল্য শোভাসমন্বিত নিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিলেন, যথায়

নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর, থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।

যথায়

ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল,—
স্বরগ বিহঙ্গ আনন্দে আকুল;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে, কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটি॥

ঐন্দ্রিলা সেইখানে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে রতি আসিয়া শচীর কঠিন, দর্পিত উত্তর শুনাইল। ঐন্দ্রিলা বলিলেন, "তবে আমি স্বয়ং তাহাকে আনিতে যাইব। রতি, তুমি আমাকে ভাল করিয়া সাজাইয়া দাও দেখি—

সাজা এই খানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার;
রতন মুকুট, মণি-ময় হার,
জবলদ্ধধন,—ধনেশ ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি॥
আন যান, পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ,

আন বীণা, বেণু, মন্দিরা মুরজ,
আনাব যা কিছু,—মানস পঙ্কজ
ফুটাব আ[illegible] ॥

ব[illegible] তাহা[illegible]ক অপূর্ব্ব সাজে সাজাইল। এমত কালে বৃত্রাসুর সণ্জয় করিয়া আসি[illegible]। কুঞ্জের শোভা, ও ঐন্দ্রিলার সাজ দেখিয়া, অসুরেশ্বর মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে ঐন্দ্রিলার বৈভব সকল কুঞ্জমধ্যে বক্ষিত হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐন্দ্রিলা বলিল,

'কোথা তবে আব রাখিব এ সব,
কহ শুনি অহে হৃদয় বল্লভ।
কার গৃহ [illegible] [illegible]ন ও সব
দেখিছ ওখানে? অমর বিভব।
শচী ভবন।

শুনিয়া, অসুর বড় ক্রুদ্ধ হইল।

অমরার রাণী!—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
কহিলা বচিবে, কহিলা রাখানি,
এ ভুবন তার!—কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা?—চাহে না সে ধনি
কারা মোচন।
"আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ বাণী?"
ব[illegible]ল ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি,—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর
নিল ফুলধনু আপনার হাতে,
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি!) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।
অব্যর্থ সন্ধান। মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ পরাণ,
ফিরিয়া দেখিল 'স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব কামিনী
* * লাবণ্য-রাশি!
কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র সহচরী,
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি,
পূরাও মহিষি;—ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী।"

সপ্তদশ সর্গে, রুদ্রপীড়ের যুদ্ধে যাত্রা। [illegible] এবং [illegible]র কাছে [illegible] ভূত হইয়া[illegible], সই [illegible]র শরীর দহিতেছিল। পিতার [illegible] মাতার কাছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। এবং পত্নী ইন্দুবালার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। পরদুঃখকাতরা ইন্দুবালার প্রাণে সহে না, যে কেহ যুদ্ধ করে— স্বামী যুদ্ধ করে একান্ত অসহ্য। ইন্দুবালা কিছুতেই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দুবালা বলিল,

'যাবে নাথ?-যাবে, কি হে, ছিঁড়িয়া এ লতা?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি!
ছিঁড়ে, কি হে, তরুবর, ঘেরে যদি তায়,
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া?
ছিঁড়িলে, তবুও, নাথ, লতিকা ছাড়ে না—
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ?
কোথা, নাথ, বলো বলো তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ?

রুদ্রপীড় তাহাতেও শুনিল না। তখন

কহিলা সরলা বালা—নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন—
' যাবে যদি, নাশো আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এত দিন;

এই পুষ্প তরুরাজি, কিসলয়ে ঢাকা—
হের দেখ কত পুষ্প দুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা—
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যাহা রতই আদরে।

নাশো আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধবর্ণে নয়নরঞ্জন!
প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুগ্ধদানে;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যার হইতে কাতর!

নাশো এই সখিগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম—আজীবন কাল
সম্প্রীতি [illegible], সদা—সেবিলা, প্রাণেশ,
প্রাণ মন, দেহ স্নেহ রসে মিশাইরা।

নাশো পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহিত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ—
পাতিয়া দিলাম বক্ষ হানো এ হৃদয়ে
সে রক্তপিপাসু অসি, [illegible] যাও বীর।"

বলি, মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন;
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর, ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।

নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানবকন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন!
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ।"

ইন্দুবালা পতির মঙ্গলের জন্য শিব-পূজা করিতে গেলেন। পূজার ঘট মহাদেবের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া গেল।

অষ্টাদশ সর্গ প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য। বিরাও গীতিকাব্যের—কাব্য ও গীতি। এরূপ ওজস্বিনী তূর্য্যধ্বনিসদৃশা গীতি, হেম বাবু ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারে না। মন্দাকিনীতীরে—

কুলু কুলুধ্বনি।—চলে মন্দাকিনী,
দেবকুলপ্রিয়, পবিত্র তটিনী,
লতায়ে লুটিছে সুর মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
পীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায়।

যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ ছিল না দৈত্যের;
সুরবালা কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত;
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে!

যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে;
দেবঋষিগণ আ[illegible] পুণ্ডরীক
অমৃতহ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী করে গরিমা গুণে।

সেই মন্দাকিনী তীরে ম্রিয়মনা,
মন্দির-অলিন্দে, শচী সুলোচনা;

কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশ, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-বাণী।

এই সর্গে শচীর নিকট রতি ইন্দুবালাকে লইয়া গিয়াছে। সেখানে শচী তাহাকে নানা কথায় ভুলাইতেছেন এমত সময়ে ঐন্দ্রিলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রবধূকে শক্রপত্নী-পদতলস্থা দেখিয়া ঐন্দ্রিলার গুরুতর ক্রোধ উপস্থিত হইল। এবং ইন্দুবালাও তাঁহার আগমনে সশঙ্কিতা হইল। তাঁহার রক্ষার্থ শচী অগ্নি এবং জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন। এদিকে ঐন্দ্রিলা ইন্দ্রাণীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পদাঘাতের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবদূত আসিলে, সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। বীরভদ্র শচীকে সুমেরুশিখরে লইয়া গেলেন। এবং বৃত্রনিধন যে নিকট তাহা বৃত্রমহিষীকে শুনাইয়া গেলেন।

উনবিংশ সর্গে বজ্রের নির্ম্মাণ। বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায়, ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়া উপস্থিত।—হেমবাবুর কবিতা, সর্ব্বত্র সমান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালায় তাঁহার সঙ্গে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়—কর্ণ বধির হইয়া যায়। অগ্নির গর্জ্জনে, মুদ্গরের আঘাতে, ধূমের তরঙ্গে, ধাতুনিঃস্রবে রবে, মহাকোলাহল—আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সত্য সত্যই দেবশিল্পীর কারখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সর্গ কবির কল্পনাশক্তির এবং মৌলিকতার বিশেষ পরিচয়স্থল। আমরা এই কাব্য হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি—এই সর্গ হইতে কিছুই উদ্ধৃত করিব না—অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার মহিমার পরিচয় দেওয়া যায় না। এই সর্গে বজ্র নির্ম্মিত হইল, এবং তাহাতে ত্রিদেবের তিনশক্তি প্রবেশ করিল।

পাঠক দেখিবেন, আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল একত্রে বৃত্রসংহার পাঠ করিতেছি—প্রচলিত প্রথানুসারে আমরা বৃত্রসংহারের সমালোচন করিতেছি না। আমরা উদ্যানের শোভা বর্ণনে প্রবৃত্ত নহি—আমরা পুষ্পচয়ন করিতেছি মাত্র। উদ্যানের শোভা কীর্ত্তনে মালীর সুখ হইতে পারে, কিন্তু দর্শকের সুখ পুষ্পচয়নে। অতএব সম্প্রতি আমরা পুষ্পচয়নই করিব। তার পর, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়, বলা যাইবে। কিন্তু বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, বৃত্রসংহার পাঠের যে সুখ তাহা যদি পাঠককে প্রাপ্ত করাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম মনে করিব।—বড় ভারি রকম বাগাড়ম্বর করিলে অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু অনেকে বুঝিবেন না, এবং কার্য্যসিদ্ধির তাদৃশ সম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ।

ইউরোপে শাক্যসিংহের পূজা।

বোধ হয় শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন যে রোমনগরে বা লিস্‌বন সহরে বা অন্যত্রে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি পরম পবিত্র খ্রীষ্টীয় ঋষিদিগের বলিয়া গিরিজায় গিরিজায় সন্নিবেশিত এবং পূজিত হইতেছে, তাহার মধ্যে আমাদের শাক্যসিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। শাক্য ভারতবর্ষে ঋষি, ইউরোপে সেণ্ট (saint) পূজা উভয় স্থানে কেবল নামভেদে মাত্র। এ অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধদেব, বিলাতে তিনি সেণ্ট জোসেফট্।

শাক্যসিংহের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের দেশে অনেকেই জানেন। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত শাক্যবংশোদ্ভব রাজকুমার ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া বলেন, যে সন্তানটি হয় অতি প্রবল মহারাজাধিরাজ হইবেন, নতুবা পিতৃসিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। রাজা এই গণনা শুনিয়া সাবধান হইলেন, যাহাতে রাজপুত্র সন্ন্যাসী না হন, রাজা তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতত বিলাস সম্ভোগী করিবার নিমিত্ত রাজপুত্রকে এক রম্য উদ্যানে রাখিলেন। পৃথিবী যে সুখময়, সুখ ভিন্ন এ সংসারে যে আর কিছুই নাই এই সংস্কার জন্মাইবার নিমিত্ত তদুপযোগী উপকরণ রাজপুত্রের চারিদিকে রক্ষিত হইল। রাজপুত্র মহাবিলাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে একদিবস হঠাৎ একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে কখন বৃদ্ধ দেখিতে পান নাই অতএব দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি?" পারিষদেরা তাহা বুঝাইয়া দিল। রাজপুত্র অতি গম্ভীর হইলেন। পরে আর একদিবস রুগ্নদেহ দেখিলেন, তাহার পর মৃত্যু পর্য্যন্তও দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার যে সুখময় বলে তাহা মিথ্যা, এ পৃথিবী কেবল দুঃখময়, অতএব দুঃখনিবারণ* এ যাত্রার একমাত্র উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ সাধন করিবার জন্য কি করা উচিত মনে মনে চিন্তা করিতেছেন এমত সময় এক দিবস এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া রাজকুমার আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী লোভ নাই সুখ-ইচ্ছা নাই, কোন ইচ্ছাই নাই। রাজকুমার ভাবিলেন দুঃখনিবারণ জন্য এই অবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব তিনি রাজ্য ত্যাগ

---

* চলিত কথায় বুঝাইবার নিমিত্ত উপরে দুঃখনিবারণ শব্দ প্রয়োগ করা গেল বস্তুত দুঃখ নিবারণ বৌদ্ধদেবের প্রকৃত উদ্দিষ্ট ছিল না। তিনি মনুষ্য প্রকৃতিকে এইরূপ উন্নত করিতে চেষ্টা করেন যে দুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারিবে না,—মনুষ্য উন্নত হইলে দুঃখ অনুভব করিতে পাইবে না।

করিলেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, বনে গিয়া নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিরূপে দুঃখ নিবারণ হইবে তাহা স্থির করিলেন। এবং স্থির করিয়া অপর সকলকে তাহার উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলে নত শিরে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল, পারত্রিক বিষয়ের পূর্ব্ব পদ্ধতি সকলে ত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধদেব বলিয়া পূজা করিতে লাগিল।

বহুকাল পরে সন্ন্যাসী পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, পিতা তখনও জীবিত আছেন—রাজ্য করিতেছেন। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ে পুত্রের মত অবলম্বন করিলেন।

এই পরিচয় দিগ্‌দিগন্তর ব্যাপিতে লাগিল। ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া এই পরিচয় নানাদেশে চলিতে লাগিল। যখন এই পরিচয় যবনরাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন বোগদাদনগরে খলিফা আলমান সরের দরবারে জন নামে এক জন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ইটালিদেশস্থ কোন পণ্ডিত পাদরি দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ ঐকান্তিকতা জন্মিয়াছিল অতএব রাজপদ ত্যাগ করিয়া তিনি দামস্কসনগরে মঠবাসী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অনেক গুলি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেন, তন্মধ্যে "সেন্ট জোসেফট্" প্রভৃর পরিচয় তিনি একখানি গ্রন্থে এই রূপ লেখেনঃ—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ান দিগের চিরশত্রু কোন রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল। জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া বলেন, যে রাজকুমার নবধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। রাজা এই কথা শুনিয়া যাহাতে রাজকুমার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন এবং পৃথিবীর দুঃখ যাতনা হইতে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বিলাস সম্ভোগে কালযাপন করিতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। এক সময় কোন খ্রীষ্টীয়ান সন্ন্যাসীর সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসীর উপদেশে তিনি নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান্ হইলেন, এবং ঐহিক সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। এবং যাইবার সময় নিজ পিতাকে নবধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া গেলেন। জন আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহার এই গল্পটি প্রকৃত। এবং তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে এই গল্প শুনিয়াছিলেন।

গল্পটি প্রথমে গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়; পরে কালডিয়া, আরবা, মিশর, আরমানি ইহুদি, লাটিন ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জর্ম্মনী, স্পেনীয়, ইংরেজি ও আইসলণ্ডিক ভাষায় অনুবাদিত হয়।

জনের লিখিত সেণ্ট জোসেফটের জীবনবৃত্তান্ত, ও "ললিত বিস্তর" গ্রন্থের লিখিত

বৌদ্ধদেবের পরিচয় এই উভয় সম্বন্ধ, সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সক্ষমুলর অনুভব করেন, যে জন কেবল বাচনিক পরিচয়ের উপর নির্ভর করেন নাই, বোধ হয়, তিনি 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থে দেখিয়া ছিলেন। কেননা ললিত বিস্তর গ্রন্থে মানবদেহের জীর্ণতা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে সকল বিশেষণ প্রযোগ আছে, জন অবিকল সেই সকল বিশেষণ পর্য্যন্ত আপনার গ্রন্থে প্রযোগ করিয়াছেন।

এই রূপে গৌতম শাক্য মুনি তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজ্য হইযাছেন। প্রতিবৎসর ২৬এ আগষ্ট ও ২৭এ মে তারিখে তাঁহার অর্চনা হইযা থাকে। ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে তাঁহার পূজা নবেনা পর্ব্ব বলিয়া পরিচিত। হুগলি নগরের নিকটবর্ত্তী বলাগোড় গিরিজায় এই নবেনা পর্ব্ব অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইযাছে বলিলে অসংগত হয় না কিন্তু চীনরাজ্য ব্রহ্মরাজ্য প্রভৃতি অনেক দেশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত। খ্রীষ্টীয় মহম্মদীয় প্রভৃতি পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল। ইউরোপে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রবেশ করে নাই সত্য কিন্তু তথাপি তথায় তিনি পূজ্য। মহান্ দিগের পূজা সর্ব্বত্র।

তর্কতত্ত্ব।*

বঙ্গদেশ, ন্যাযশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গীয় ন্যাযশাস্ত্র এক্ষণে আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত করে না। ন্যায়, বিজ্ঞানের সহচরী, বা শিক্ষয়িত্রী। যে ন্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ উপযোগিনী না হইল, তাহার জন্ম বৃথা। বঙ্গীয় ন্যাযশাস্ত্র হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন উপকার হয় নাই। তাহা যে বিজ্ঞানের উপযুক্তা সহচরী নহে, ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ভিন্ন দেশীয় ন্যাযশাস্ত্রে অন্য কোন ফল যে কখন জন্মে নাই, তাহা জনসমাজে সুপ্রকাশিত। পাশ্চাত্য ন্যায় বিজ্ঞানের যথার্থ সহায়, উপকারিণী এবং উন্নতিকারিণী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি সুতরাং পাশ্চাত্য ন্যায় শিক্ষা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।—

* তর্কতত্ত্ব বা পাশ্চাত্য ন্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-যন্ত্র, ১৮৭৮।

সেই শিক্ষাপ্রদানের জন্য বাবু প্রমথনাথ মিত্র এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ অতিশয় পরিশ্রমের ফল। এই গ্রন্থে কতদূর পরিশ্রম, ও চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণেই বুঝা যাইবে।

পুস্তক খানি দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে নামকরণ, প্রসঙ্গ, ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবন্ধন—এই কয়টি বিষয় সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমান, ন্যায়াবয়ব, অনুমান শৃঙ্খল, অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞান এবং গাণিতিকতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ গুলি পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ কি না—এই কয়টি বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। তর্কতত্ত্বের এই খণ্ডের বিষয় কেবল অবনয়ন (Deduction) মাত্র। অবনয়নের ভিত্তি যে উন্নয়ন (Induction)—অর্থাৎ আমরা যে বিশেষ সত্য হইতেই বিশেষ সত্যকে অনুমান করিয়া থাকি—তাহা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় গুলির প্রমাণের নিমিত্ত ভাষার বিশ্লেষণ, শ্রেণীবন্ধন এবং ব্যাখ্যা এই তিনটি সাতিশয় প্রয়োজনীয়। অতএব শেষোক্ত বিষয়গুলি প্রথম পরিচ্ছেদেই ন্যস্ত হইয়াছে।

সমস্ত বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় প্রসঙ্গ দ্বারা মাত্র প্রকাশিত হইতে পারে। অতএব প্রসঙ্গই ন্যায়ের প্রধানতম যন্ত্র। অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃতি না জানিলে আমরা এ বিজ্ঞানে এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না। প্রসঙ্গ আবার দুইটি নাম বিরচিত। প্রত্যেক প্রসঙ্গে দুইটি করিয়া নাম আবশ্যক। তন্মধ্যে একটি প্রসঙ্গের প্রবাচ্য (Subject) আর অপরটি প্রসঙ্গের প্রবচন (Predicate) অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে নামের প্রকৃতি জানিতে হয়। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে নাম সম্বন্ধেই প্রথমে বিচার করা হইয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে আধুনিক পণ্ডিত সমাজে নামের অন্যান্য বিভাগ সমূহের মধ্যে নাম স্বীকার বাচক বা অস্বীকার বাচক—এই বিভাগটি করা হয়। কিন্তু তর্কতত্ত্বকারের মতে উক্ত বিভাগটি সম্যক্‌রূপে দুষ্ট। কারণ নাম স্বীকারবাচকই হউক আর অস্বীকারবাচকই হউক নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে স্বীকারই করে। তবে স্বীকারবাচক নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে নির্দ্দিষ্টরূপে স্বীকার করে, আর অস্বীকারবাচক নাম অনির্দ্দিষ্টরূপে স্বীকার করিয়া থাকে। 'মনুষ্য' বলিলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল ও তৎসঙ্গে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম—যথা বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনীশক্তি, ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার—সংচিহ্নিত হইল। 'অ মনুষ্য' বলিলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল এবং তৎসঙ্গে 'অ মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ সংচিহ্নিত হইল। 'অ-মনুষ্যত্ব' ধর্ম্মবৃন্দ অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু 'অমনুষ্যত্ব' বলিয়া বিশ্বে কতক গুলি ধর্ম্ম আছে তাহার সন্দেহ নাই।

'মনুষ্যত্ব' ব্যতীত—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার ও জীবনীশক্তি এই তিন ধর্ম্মের সমষ্টি ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্ম্মই 'অমনুষ্যত্ব' নামে বিবৃত হইতে পারে। অতএব 'অমনুষ্য,' এই নামটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে অস্বীকার করে না বরং এক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলী ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্ম্মকে স্বীকার করে। অতএব দেখিতে গেলে স্বীকারবাচক ও অস্বীকারবাচক নামে বিশেষ কোন প্রভিন্নতা নাই।

নাম বলিলেই সতের নাম বুঝায়। নাম হইলেই সতের নাম হইতে হইবে। অতএব নামের পরে নাম চিহ্নিত সৎ নিচয় সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। জগৎস্থ সমস্ত সৎ নিম্নলিখিত মতে বিভক্ত হইয়াছে;—

(১) অনুভূতিনিচয় বা অন্তর্বোধের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ।

(২) উক্ত অনুভূতিনিচয়ের অনুভবকারী মনঃ।

(৩) শরীর—যাহারা উক্ত অনুভূতি সমূহকে উৎপন্ন করে বা যাহাদিগের উক্ত অনুভূতি নিচয়কে উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে।

(৪) পারম্পর্য্য, সমবর্ত্তিতা, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য।

তাহার পর প্রসঙ্গ বিবেচিত হইয়াছে। সমস্ত প্রসঙ্গই দুইটি নাম অর্থাৎ দুইটী সৎ হইতে বিরচিত। অতএব জগৎস্থ সমস্ত সৎসম্বন্ধে সতের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃতি জ্ঞাত হইলে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান হইল। তাহার পর প্রসঙ্গ কিরূপে নির্দ্দেশ হয় তাহার বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গের প্রকৃতি এবং তাহার পরের অধ্যায়ে প্রসঙ্গের অর্থ বিবেচিত হইয়াছে। নাম এবং নাম চিহ্নীয় সৎ সমূহের প্রকৃতি জানা থাকিলে প্রসঙ্গ বা তদর্থ স্বতঃই আমাদের সম্মুখে আইসে।

বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে শ্রেণীবন্ধন সাতিশয় প্রয়োজনীয়। কতকগুলি সৎ এক সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধকরাতে স্মৃতির অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায়াবয়বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শ্রেণীবন্ধন কার্য্যটি বিজ্ঞানে সাতিশয় প্রয়োজনীয়। স্বীকার্য্য পঞ্চ (The five predicables) নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত হইয়াছে,—

পরজাতি

অপরজাতি

প্রভিন্নকধর্ম্ম

উৎপন্ন নিত্যধর্ম্ম

নৈমিত্তিকধর্ম্ম

যে শ্রেণী অপর এক শ্রেণীকে অন্তর্ভূত করে তাহা শেষোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পরজাতি আর শেষোক্ত শ্রেণী প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে অপরজাতি। 'মনুষ্য প্রাণী'—এস্থলে 'প্রাণী' শ্রেণীটি 'মনুষ্য' শ্রেণী

সম্বন্ধে পরজাতি ; আর 'মনুষ্য' শ্রেণীটী 'প্রাণী' শ্রেণী সম্বন্ধে অপরজাতি 'প্রাণী' শ্রেণী অপেক্ষা 'মনুষ্য' শ্রেণী অধিক ধর্ম্ম সংচিহ্নিত করে। 'প্রাণী' বলিলে 'জীবনীশক্তি' মাত্র সংচিহ্নিত হয ; আর 'মনুষ্য' বলিলে 'জীবনীশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার সংচিহ্নিত হয। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' 'মনুষ্য' অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম্ম। অর্থাৎ প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাপর অপরজাতি সমূহ হইতে 'বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আকার' এই ধর্ম্মদ্বয 'মনুষ্য' অপরজাতিকে ভিন্ন করিযা দিতেছে। অপরজাতীয ধর্ম্মকে তবে প্রভিন্নক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর নিত্য ধর্ম্ম হইতে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহাকে উৎপন্ন নিত্য ধর্ম্ম বলে। 'বুদ্ধিবৃত্তি' 'মনুষ্য' শ্রেণীর একটি নিত্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তি' না থাকিলে নির্দ্দিষ্ট সৎকে 'মনুষ্য' শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায না। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি (নিত্যধর্ম্ম) আছে বলিয়াই 'বাক্‌শক্তি' ও আছে, অর্থাৎ বাক্‌শক্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন। অতএব 'বাক্‌শক্তি' মনুষ্য শ্রেণীর একটি উৎপন্ন ধর্ম্ম। আবার যেখানেই 'বুদ্ধিবৃত্তি' দেখিতে পাওয়া যায সেইখানেই 'বাক্‌শক্তি' দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 'বাক্‌শক্তি' একটি উৎপন্ন নিত্যধর্ম্ম। আবার এমত কতকগুলি ধর্ম্ম আছে যাহাদের নির্দ্দিষ্ট অপরজাতি সম্বন্ধে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যাহারা নিত্য নহে। এইরূপ ধর্ম্মকে নৈমিত্তিকধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কাকের 'কৃষ্ণবর্ণত্ব' এই রূপ নৈমিত্তিকধর্ম্মের একটি উদাহরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানে প্রযুক্ত পরিভাষাসমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সাতিশয় প্রয়োজনীয। ব্যাখ্যার প্রকৃতি, ব্যাখ্যা কিরূপে করিতে হয ও কিরূপে করিলে বিশুদ্ধ হয়, এবং ব্যাখ্যা ও বিবরণে কি প্রভিন্নতা আছে—এই গুলি দেখান এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয পরিচ্ছেদে এ পুস্তকের প্রকৃত বিষয়—অর্থাৎ অনুমান—বিবেচিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে অনুমানের প্রকৃতি সমালোচিত হইয়াছে। জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যকে অনুমান করণকেই প্রকৃত অনুমান বলে। তদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সামান্য প্রসঙ্গ হইতে তদায বিশেষ প্রসঙ্গ অনুমিত করণ ইত্যাদি অনেক প্রকার অপ্রকৃত অনুমানও আছে। এই অধ্যায়ে ঐ সমস্ত অপ্রকৃত অনুমানের উদাহরণ সমালোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যাযাবয়ব বিবেচিত হইযাছে। পাশ্চাত্য নৈযায়িকেরা ন্যায়াবয়বকে মধ্যবাক্যের (Middle Term) স্থানানুসারে চারিটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু তর্কতত্ত্বকার বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত্যনুসারে উক্ত বিভাগকে নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন।

এখানে বলা উচিত যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করণকে (Quantification of the predicate) একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তর্কতত্ত্বকার এ বিষয়ে হ্যামিল্টনের মতাবলম্বন করিয়া প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করণকে অধিকতর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে ন্যায়াবয়বের চারিটি বিভাগ একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান (Major Premiss) যে একটি উন্নয়ন (Induction) মাত্র তাহা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা যে এক বা বহু বিশেষ সত্য হইতে অপর একটি সত্যকে অনুমান করি—তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং ন্যায়াবয়বের কার্য্য যে কেবল সেই অনুমানটী অদুষ্ট কি না তাহা স্থির করা, —ন্যায়াবয়ব যে নিজে অনুমান কার্য্য নহে—কেবল অনুমান কার্য্যটি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষক মাত্র—তাহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে অনুমানশৃঙ্খল (Chain of Inference) ও অবনয়নসিদ্ধবিজ্ঞান (Deductive sciences) সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে যে অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানবৃন্দ সকলেই উন্নয়ন (Induction) সাপেক্ষ। এবং তজ্জন্য ইউক্লিডের পঞ্চদশ প্রতিজ্ঞা ন্যায়াবয়বের মতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ গুলিকে ও ব্যাখ্যাগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ উন্নয়নবৃন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি যে বাস্তবিকই পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ উন্নয়ন তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং এই মতানুসারে যাহাকে আমরা অসংশয়িত সত্য (Necessary truth) বলিয়া থাকি তাহা যে কতদূর অসংশয়িত তাহা দর্শিত হইয়াছে; এবং অবনয়নসাপেক্ষ (Deductive) বিজ্ঞানপুঞ্জ যে উন্নয়নসাপেক্ষ (Inductive) বিজ্ঞানপুঞ্জ অপেক্ষা কতদূর অসংশয়িত তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমরা গ্রন্থের যে এত বিস্তৃত পরিচয় দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেন না, এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় ইহার উপযুক্ত প্রশংসা। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে যতদূর চিন্তাশক্তির বিকাশ দেখা যায়, ইহাতে যে বিদ্যাবত্তা এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা আমরা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণীকৃত করিতে পারিতাম না। এতদ্রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন বিস্তর আয়াস-সাধ্য। প্রথমতঃ, বিষয় অতি কঠিন; এইরূপ কঠিন বিষয় অধীত করিয়া নিজের আয়ত্ত করা, অল্পলোকের সাধ্য। তার

পর কেবল ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেই ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্যক। শেষে ভাষার কষ্ট। পাশ্চাত্য ন্যায়ের উপযোগী ভাষা, বাঙ্গালায় ইতিপূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই। মিত্র মহাশয়কে তদুপযোগিনী ভাষারও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহাও অল্প শক্তির কার্য্য নহে। নূতন ভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রথম পাঠে তাঁহার গ্রন্থ একটু দুর্ব্বোধ্য দেখা যায়, কিন্তু একবার ইহার পরিভাষা হৃদয়ঙ্গম হইলে সে কষ্ট আর থাকে না।

বাঙ্গালির যেরূপ প্রগাঢ়চিন্তায় অক্ষমতা এবং পল্লবগ্রাহিত্ব দেখা যায়, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় দুইটী শিক্ষা বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, গণিত, এবং পাশ্চাত্য ন্যায়। তাঁহাদিগের চিত্তরোগের এই দুইটি মহৌষধ। যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন, তাঁহাদিগের এই দুই শাস্ত্রে কতক শিক্ষা হয়, নিতান্ত পক্ষে একটীতে কতক ব্যুৎপত্তি জন্মে। আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাশূন্যতা এবং পল্লবগ্রাহিতা দোষ তাঁহাদিগের তত থাকে না। কিন্তু যাঁহাদিগের শিক্ষা কেবল বাঙ্গালা পুস্তকের উপর নির্ভর করে, তাঁহাদিগের চিত্তোন্নতির সে সদুপায় নাই। ইদানীং বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে কিছু গণিত শিক্ষা হইতেছে—ন্যায়ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। তর্কতত্ত্ব বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধীত হওয়া বিহিত।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল—সরোবরে কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল—পৃথিবী আলোকের হর্ষে হাসিয়া উঠিল—যেন কিছুই হয় নাই—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে

পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন, যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন, যে এ হৃদয়-সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা —স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধ স্বরূপ, দিবারাত্র স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ উপন্যাস লিখিলাম।*

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া, স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্ত করে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও," যদি বলিত "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি তাহা হইলে ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেননা রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী;—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ; ঈশ্বরের অংশ; পুরুষ ঈশ্বরের—সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর

* অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"রোহিণীকে মারিলেন কেন?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট হইয়াছে।" কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।

হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।—ভ্রমরের সহায় ছিল —যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি না যে সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ;—মুখে, মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া!

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনা বাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পুরিয়া গিয়াছে—দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেক ক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া, শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী পুষ্করিণীতটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে স্ফাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যে খানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানা পুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথ-

সেই দেখিলেন রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে —সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চীর বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিযাছিলেন —ভ্রমর বলিযাছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিযা যাইব?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন ফটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিযাছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ফুলগাছ নাই—কেবল উলু বন, আর কচু গাছ, ঘেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে —প্রস্তরমূর্ত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিযাছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিযা গিযাছে, ঝিলমিল সাশি কে ভাঙ্গিযা লইযা গিয়াছে —মর্ম্মর প্রস্তর সকল কে হর্ম্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাগানে আর ফুল ফুটে না—ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইযা উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতে ছিলেন। একবার ভ্রমর, তাহার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইযা উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিযা ভ্রম হইতে লাগিল —প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখন বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখন বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখন বোধ হইল তাহারা দুই জনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্কপত্র নড়িতেছে—বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বনমধ্যে বন্য কীট পতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই

ভগ্ন পুত্তল পদতলে—সেই ভ্রমর রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

"এই খানে।"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এইখানে কি ?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে

"এমনি সময়ে।"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণি ?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল,

"এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে, আমি ডুবিয়াছিলাম।"

গোবিন্দলাল, আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমি ডুবিব ?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন,

"হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

পরিশিষ্ট।

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার অপ্রাপ্তবয়ঃ ভাগিনেয়, শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। কয়েক বৎসর পরে শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

শচীকান্ত যখন মানুষ হইল, তখন সে প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে—যেখানে

আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল —এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল।—প্রত্যহ সেইস্থানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া, আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিলফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো।—প্রমোদভবনের পরিবর্ত্তে একটী মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব দেবীর স্থাপনা করিল না। বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া, ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপনা করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে,
ভ্রমরের সমান হইবে,
আমি তাহাকে
এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"

সমাপ্তঃ।

শৈশবসহচরী।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিত।

কিছু দিন পরে একদা নিশীথে জ্যোৎস্নাময়ী রাজপথে একটি স্ত্রীলোক একাকিনী গমন করিতেছিল। তাহার গতি অতি বিচিত্র। উহা দেখিলে বোধ হইবে যেন বিনা পাদবিক্ষেপে, বিনা মৃত্তিকাস্পর্শে গমন করিতেছে। চন্দ্রমাশোভিত নীল নভোমণ্ডলে পবনসঞ্চালিত মেঘখণ্ডের ন্যায় গতি অমানুষিক এবং অনৈসর্গিক। সেই গভীর নিশীথে জনহীন রাজপথে নির্ভীক চিত্তে একাকিনী গমন করিতেছে। পথিপার্শ্বে ভীমতরুর ছায়ান্ধকারে হিংস্র পশুদিগের কখন কখন ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, তাহাতে ভয় নাই। গ্রাম্য প্রহরীদিগের ভয়াবহ চীৎকারে ভয় নাই। মস্তক আবরণহীন রহিয়াছে, লজ্জা নাই, ঊর্দ্ধদৃষ্টে সেই বিচিত্র গতিতে গমন করিতেছিল। রমণী রাজপথ ত্যাগ করিয়া

বৃক্ষবাটিকার গলি রাস্তায় চলিল। এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল। সেও সেই রাস্তা লইল। বৃক্ষবাটিকার বাগানের নিকট আসিয়া রমণী কলের পুত্তলিকার ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া মস্তক ফিরাইল এবং পরক্ষণেই সেইরূপে অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিল। তৎপরে সেইরূপ বিচিত্রগমনে গঙ্গার তীরে আসিয়া কূলেতে অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে যখন জলের নিকট আসিল তখন পশ্চাদনুসারী ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফিরাইলেন। রমণী নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চমকিত হইয়া এবং সম্মুখে তরঙ্গময়ী নদী দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইল,এবং বলিয়া উঠিল "আমি কোথায়, একি স্বপ্ন?" অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর না করিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। রমণীর ধীরে ধীরে স্মরণ হইল যে তিনি গতরাত্রে তাহাদিগের বাটীতে একটি কক্ষে শয্যোপরে শয়ন করিয়াছিলেন। নদীকূলে ত শয়ন করেন নাই, তবে কি প্রকারে নিদ্রিতাবস্থায় এখানে আসিলেন? আর এ অপরিচিত পুরুষ কে? তাহার নিকট দাঁড়াইয়াই বা কেন? সহজেই তাঁহার অনুধাবন হইল যে ঐ অপরিচিত ব্যক্তি কোন দুরভিসন্ধিতে তাঁহাকে কোন কৌশলে গৃহপ্রবেশ করিয়া নিদ্রিতাবস্থাতে এখানে তুলিয়া আনিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত রমণীর মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র তিনি ভীতা হইয়া অতি দ্রুত বৃক্ষবাটিকার দিকে যাইবার উদ্যম করিলেন কিন্তু অপরিচিত পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল। রমণী অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল "স্থির হও—বিধু চীৎকার করিও না—কোন ভয় নাই।" অপরিচিত পুরুষ নাম ধরিয়া ডাকাতে তাঁহার সাহস হইল, ভাবিলেন যখন এ ব্যক্তি তাঁহাকে জানে, তখন সে অবশ্য কোন পরিচিত ব্যক্তি, বসন দ্বারা মুখের কিয়দংশ আবরণ আছে বলিয়া তিনি চিনিতে পারিতেছেন না, এবং সে কারণ কোন ভয়ের কারণ নাই—এই সিদ্ধান্ত করিয়া রমণী অথবা বিধু আর চীৎকার করিল না,এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

অঃ পুঃ। পরে জানিবে এখন আমার সহিত আইস।

বিধু। কোথায় যাইব? আপনি আমাকে ঘুমন্ত তুলিয়া আনিয়াছেন কেন?

অঃ পুঃ। তুমি ঘুমন্ত এখানে আসিয়াছ বটে, কিন্তু আমি আনি নাই—তুমি আপনি হাঁটিয়া আসিয়াছ।

বি। মিথ্যা কথা, তুমিই আনিয়াছ। মানুষে কি ঘুমন্ত হাঁটিতে পারে?

অঃ পুঃ। পারে বই কি, তুমি কি কখন নিশীতে পাওয়া শুন নাই—সেও ত নিদ্রিতাবস্থাতে হাঁটিয়া বেড়ায়।

এই কথা শুনিবামাত্র বিধুর হৃৎকম্প হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "সে যে ভূতে ডাকে তাই ঘুমন্ত যায়।"

অঃ পুঃ। সে সকল নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক

দিগের কথা। নিশিতে ডাকাব অর্থ এই যে, যে সকল কর্ম্ম মানুষ দিবসে করিয়া থাকে বা কবিতে ইচ্ছা করে কেহ কেহ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখাব ন্যায সেই সকল কর্ম্ম কবিয়া বেড়ায়। তুমি বোধ হয় দিবসে এই ঘাটে সর্ব্বদা আসিয়া থাক, অথবা আসিতে বাঞ্ছা কবিয়া থাক, তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও এখানে আসিযাছ। নিশিতে ডাকা আর কিছুই নহে।

বিধু এই শেষোক্ত কথাতে লজ্জিতা হইয়া মস্তক নত কবিলেন। পরে চকিতেব ন্যায় তাঁহাব স্মবণ হইল, যে সে দিবস প্রাতে কুমুদিনী যে ঘটনাটি তাহাব পিতাব নিকট বিবৃত কবিতেছিল, সে তবে তাহার কৃত। অর্থাৎ সেই গভীব নিশীথে অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে যে স্ত্রীলোকটি প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীর গাত্রে হাত দিয়াছিল সে তবে তিনিই—নিশ্চয় তিনিই, কেন না বিনোদিনীর অতিশয় জ্বর হওয়াতে তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া প্রথম রাত্রে মধ্যে মধ্যে সেই কক্ষমধ্যে যাইয়া বিনোদিনীর গাত্রোত্তাপ পরীক্ষা করিতেছিলেন। অপরিচিত পুরুষের যুক্তিমতে তাঁহাব স্থিরবিশ্বাস হইল যে তিনিই সে রাত্রে কক্ষমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র বিধু অতি কাতর হইয়া বলিল, "যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আমার পরমায়ু আর অল্পদিন, কেন না ঘুমন্ত এই প্রকার বেড়াইতেং আমি হয় কোন দিন জলে ডুবে মবিব, না হয় ছাদ হইতে পড়িয়া মরিব। কিন্তু আজ আমায় আপনি প্রাণদান দিলেন আপনি আমার বাপ—আপনি কে?"

অঃ পুঃ। পবে বলিব, আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইলে। আমি অবধৌতিক মতে অনেকেব এই প্রকাব পীড়াশান্তি কবিয়াছি, তোমাকেও আবোগ্য কবিব—অদ্য বাত্রেই ঔষধ দিব, আমাব সহিত আইস।

বিধু যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অপবিচিত অতি দ্রুত গঙ্গাজলে নামিয়া বলিলেন "শুন বিধু, আমি এই গঙ্গাজল স্পর্শ কবিয়া বলিতেছি যে আজ হইতে তুমি আমাব কন্যা হইলে, আমাব দ্বাবা তোমাব কখন কোন অনিষ্ট হইবে না—বরং ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কেন না আমি তোমার রোগ আরোগ্য কবিব। কিন্তু তুমি যদি আমায় পিতার ন্যায় জ্ঞান কর তা হলে তুমিও এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ কব যে আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে ও যাহাতে আমার উপকার হয় তাহা কবিবে।" তাঁহাব জীবনরক্ষাকর্ত্তা, অপরিচিতের কথায় বিধুর প্রথম হইতে বিশ্বাস জন্মিতেছিল; এক্ষণে তাহাকে শপথ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। তিনিও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অপরিচিতের আদেশানুসারে শপথ করিলেন। তৎপরে অপরিচিতের আজ্ঞামত তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর রজনীতে বৃক্ষবাটিকার একটি কক্ষে দীপালোকে এক যুবা কি পড়িতেছিল। যখন বিধু নদীকূলে অপরিচিত পুরুষকে প্রথম দেখিয়া চীৎকার করিয়াছিল, সেই চীৎকার শুনিয়া যুবা কক্ষহইতে দ্রুত আসিয়া বাগানের কোন স্থান হইতে লুক্কায়িতভাবে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। যখন অপরিচিত এবং তৎপশ্চাতে বিধু নদীগর্ভ হইতে উপরে উঠিতেছিল যুবা তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "এ কি—— সহিত কুমুদিনীর সহচরী কেন? কি অভিপ্রায়ে আর এত রাত্রে কোথায় যাইতেছে।"

বিধুকে পাঠকের নিকট পরিচিত করা আবশ্যক।

বিধু পিতৃমাতৃহীনা একটী দরিদ্র কায়স্থকন্যা। বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া হরিনাথ বাবুর বাটীতে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভাকে লালনপালন করিত, সেই জন্য তাঁহার বড় অনুগত হইয়াছিল। যখন স্বর্ণ শ্বশুর বাড়ীতে ছয়মাস বাস করিয়াছিল, তখন বিধু তাহার সহিত রজনীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে হরিনাথ বাবুর বাটীতে পুনরায় আসিয়া বাস করিল। বিধু পরিচারিকার ন্যায় ছিল না—হরিনাথ বাবুর কন্যার এবং ভ্রাতৃকন্যার সহচরীর ন্যায় ছিল, বিনোদিনীকে বিশেষ ভাল বাসিত, বিধু কুমুদিনীর সমবয়স্কা, দেখিতে ভদ্রকন্যার ন্যায় বটে, বর্ণ খুব টক টকে না হউক, গৌরবর্ণ বটে, গঠন যদিও সুন্দর ছিল না, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থূলকায় জন্য উহা সুন্দর দেখাইত। বিধু পান খাইত না, গহনা পরিত না, বা পাড়ওয়ালা কাপড় পরিত না—কিন্তু মিহি চন্দ্রকোণা ধুতি পরিত। বিধুর শরীর পরিষ্কার এবং নয়নরঞ্জক বটে, বিধু অতিশয় গম্ভীর, শরীরে কোন দোষ ছিল না। কেবল কুমুদিনী সম্প্রতি একটি মাত্র দোষ দেখিত। বিধু অগ্রে বসুন্ধরার ঘাটে স্নান করিত কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষবাটিকার ঘাটে স্নান করে। অগ্রে একবার যাইত—এখন সকালে বৈকালে দুইবার স্নান করিতে যায়—আর অধিক ক্ষণ জলে পড়িয়া থাকে, এ ভিন্ন আর কোন দোষ ছিল না। কখন কেহ কোন প্রকার নিন্দা করিতে পারিত না, বিধু কাহারও সহিত কলহ করিত না, সকলের প্রিয় ছিল, এবং সকলকে ভাল বাসিত, কেবল বোধ হয় যেন ইদানীং কুমুদিনীকে দেখিতে পারিত না। বিধু অপরিচিতের সহিত সেই গভীর যামিনীতে চলিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাননে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া প্রায় তৃতীয় প্রহর—আকাশে তরল মেঘাচ্ছন্ন

হওয়াতে কাকজ্যোৎস্না হইয়াছে, তজ্জন্য দূরের মানুষ লক্ষ্য হয় না। অপরিচিত পুরুষ এবং বিধু গ্রাম পান্তরে সেই নিবিড় অন্ধকারময় বনমধ্যে প্রবেশ করিল, কিঞ্চিৎ পরেই অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই যুবা প্রবেশ করিল। বিজন এবং অগম্য বন দেখিয়া বিধু অতিশয় ভীতা হইয়া দাঁড়াইল, এবং বলিল "কোথায় যাইব, আর আমি যাইব না।"

বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদে বনপ্রান্তে অদূরে তরঙ্গিণী নদী দেখা যাইতে ছিল, সেই জ্যোৎস্নাময়ী তটিনীর নিকটে অপরিচিত পুরুষ, বিধুকে লইয়া গিয়া আপনার গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল,

"বিধু এখন আমায় চেন?"

বিধু স্তম্ভিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; চিনিবেন না কেন, চিনিলেন, কিন্তু চিনিয়া মুমূর্ষুবৎ হইলেন। যে রতিকান্তের নাম শুনিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইত সেই রতিকান্ত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—সেই গভীর যামিনীতে নির্জ্জন অন্ধকারময় বনমধ্যে একাকিনী সেই নৃশংসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—বিধু ভয়ে বিহ্বল হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রতিকান্ত তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,

"বিধু, তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? আমার বেশ দেখিয়া বুঝিতেছ না যে আমি দেবার্চ্চনায় এ শরীর অর্পণ করিয়াছি। আমার দ্বারা কি কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করা উচিত? আমি কি কখন কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি?—রজনীকান্ত আমার পৈতৃক বিষয় ভোগ করিতেছিল তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ভৈরবীর সেবায় অর্পণ করিবার মানসে কেবল তাহারই সহিত বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিয়াছ কি আর কাহারও আমি অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি? আর আমি অতিশয় পাষণ্ড হইলেও তোমার ভয় কি? তুমি না আমার কন্যা? ছিঃ এ অবিশ্বাস তোমার অনুচিত, তোমার নিতান্তই যদি ভয় হইয়া থাকে, তবে চল তোমায় গৃহে রাখিয়া আসি, কিন্তু তোমাকে ঔষধ দিতে পারিব না, কেন না যে দেবীকে পূজা করিয়া ঔষধি দিব রোগীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

ঈদৃশ তর্কের দ্বারা রতিকান্ত বিধুর ভয় অথবা অবিশ্বাস দূরীকৃত করিলেন, তৎপরে উভয়ে বনের নিবিড়াংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূরে একটী আলো দেখিতে পাইলেন। সেই আলো দেখিয়া বিধু বলিল "আর কত দূর যাইব? আমায় যে আবার প্রভাত না হইতেই বাড়ী ফিরে যাইতে হইবে।"

রতি। ঐ আলো আমার আশ্রমে জ্বলিতেছে, ঐ স্থানে তোমার ঔষধি আছে আর ঐ স্থানে তুমি জানিতে পারিবে যে আমার উপকারার্থে তোমায় কোন কর্ম্ম করিতে হইবে—তোমায়

রাত্রে চারিটার মধ্যে বাটী রাখিয়া আসিব।

বিধু নিঃশব্দে রতিকান্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এক বৃহৎ ও পুরাতন দেবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রতিকান্ত বলিলেন "মন্দিরমধ্যে দেখিতেছি দেবীর পূজার জন্য কেহ আসিয়াছে, তাহাকে বিদায় দিয়া তোমাকে লইয়া যাইব. তুমি আপাততঃ এই কুটীর মধ্যে থাক।" এই বলিয়া মন্দিরপার্শ্বে একটী পর্ণকুটীরে বিধুকে রাখিয়া রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, পশ্চাৎ-অনুসারী যুবা এই অবকাশে মন্দিরের দ্বারের নিকট গিয়া দাড়াইলেন। রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি পীতবসন দ্বারা সমুদায় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। অপর ব্যক্তি আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত দেবনাথ মুখোপধ্যায়—

রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখাবৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি কি স্থির করিয়াছেন?"

উত্তর। আমি পূর্ব্বে যাহা আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই স্থির—আপনার সহিত যদি কখন বৈরভাব প্রকাশ করিয়া থাকি তবে তাহা ভুলিয়া যাউন, এক্ষণে আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলাম আপনি যাহা করেন—কুমুদিনী ব্যতিরেকে আমার এ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কঠিন, যাহাতে কুমুদিনীকে পাই আপনি তাহা করুন এ উপকারের বিনিময়ে আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহাই দিব।

রতি। আপনার সহিত আমার প্রথম যে দিবস দেখা, সেই দিবস হইতে আমি কুমুদিনীকে গোপনে ধরিয়া আনিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি—এ পর্য্যন্ত তাহারা সফল হয় নাই। একদিবস ভ্রমক্রমে তাহার ভগিনী বিনোদিনীকে ধরিয়াছিল। যাহা হউক অতি শীঘ্র তাহারা সফল হইবে।

উ। আগামী কল্য তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে, ইতিমধ্যে সফল হওয়া আবশ্যক।

র। আগামী কল্য রাত্রে আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিব—এই মন্দিরমধ্যে দেবীর সম্মুখে বিবাহ হইবে,—পুরোহিত প্রভৃতি সকল উপস্থিত থাকিবে, নিশ্চয় জানিবেন—কাল গায়ে হলুদ দিব, দিবসে একবার এখানে আসিবেন। মুখাবৃতকারী এই উৎসাহান্বিত বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহা এক্ষণে দিব, না সেই সময়ে দিব।"

র। এক্ষণে রাখুন সেই সময়ে দিবেন, অগ্রে আপনার কার্য্যোদ্ধার করি তবে পুরস্কার লইব।

এই কথোপকথন শেষ হইলে দেবনাথ মুখো বলিলেন,

"ভাই, আমি তোমার ভগিনীপতি,

আমি যে তোমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছি আমাকে কি দিবে ?”

অপরিচিত বলিল,

“মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি চান।”

দেব। কি চাই ? অর্দ্ধেক রাজ্য আর এক রাজকন্যা চাই—আর কিছু নয়। পরে হাসিয়া বলিলেন “কি চাই এর পর বলিব।” তৎপরে রতিকান্ত দেবনাথকে ও বসনাবৃত যুবককে বিদায় দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিধুকে মন্দিরমধ্যে আনিলেন। বিধু দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই পাষাণমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত দেবীর নিকট বসিয়া কোশাকুশি ঠন্ ঠন্ করিতে লাগিলেন, ও মধ্যে মধ্যে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন—তৎপরে উঠিয়া আসিয়া বিধুর হস্তে একটি রূপার মাদুলি দিয়া বলিলেন “ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবে এবং প্রত্যহ দেবীকে স্মরণ করিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইবে—অদ্য হইতে সেই উৎকট রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।” বিধু উহা অতি যত্নে হস্তে লইয়া, দেবীকে পুনরায় প্রণাম করিয়া, বসিয়া বলিলেন “আপনার জন্য আমায় কি করিতে হইবে বলুন।”

রতিকান্ত সহসা উত্তর করিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন,

“বিধু, কুমুদিনীকে তুমি ভালবাস না, তাহার অনিষ্ট হইলে সুখী হও।”

বিধু চমকিয়া উঠিল। বলিল “সে কি —সে আমার কি করিয়াছে যে ভাল বাসিব না।”

রতি। কিছু করে নাই—তবে তোমরা উভয়েই—বলিয়া আর বলিলেন না। বিধু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আবার বলিতে লাগিলেন। “কোন দুইটি স্ত্রীলোকে এক পুরুষকে ভালবাসিলে সেই স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে শত্রুতা জন্মে—তেমনি তুমি ও কুমুদিনী উভয়েই রজনীকে ভালবাসাতে, তুমি কুমুদিনীকে দেখিতে পার না।”

বিধু। আপনি বড় অসঙ্গত কথা বলিতেছেন, আমি চলিলাম।

রতি। কিছু অসঙ্গত নহে। যখন তুমি রজনীর বাটীতে স্বর্ণপ্রভার সহিত বাস করিতে তখন হইতে এই ভালবাসা জন্মিয়াছে, ভৈরবীর সম্মুখে মিথ্যা কহিও না।

বিধু কোন উত্তর না করিয়া মস্তক নত করিয়া রহিল। রতিকান্ত পুনরপি বলিলেন, সে সকল কথা যাউক—কুমুদিনীকে আমি একজন দরিদ্রহস্তে সমর্পণ করিব, তুমি সাহায্য করিবে?

বিধু। সে আপনার কি করিয়াছে যে তাহার এত অনিষ্ট করিবেন।

রতি। তুমি ত সকলি জান—সে আমার ভ্রাতৃজায়া হইয়াও আমার মন্দ করিয়াছে—মনে পড়ে না কি ? শরৎকুমার আমায় তাহার বিষয় দান করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে রহিত করিয়াছিল।

বিধু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তৎপরে

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ ?"

বিধু। কিরূপ সাহায্য ?

রতি। তুমি আগে দেবীর নিকট স্বীকার কর যে সাহায্য করিবে তবে বলিব।

বিধু। স্বীকার করিলাম।

রতি। তবে শুন, আগামী কল্য তাহার বিবাহ হইবে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহাকে এই স্থানে ধৃত করিয়া আনিয়া সেই দরিদ্রসন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিব।

বিধু। কি প্রকারে ইতিমধ্যে ধৃত করিবেন।

রতি। রাত্রি দুই প্রহর সময়ে বিবাহলগ্ন—সন্ধ্যার পর তাহাকে তুমি একবার কোন কৌশলে খিড়কিতে আনিবে—সে স্থানে আমার লোক থাকিবে—তাহারা ধৃত করিয়া আনিবে—মুখ বন্ধ করিয়া আনিবে যে চীৎকার করিবে না—আর সম্মুখ অন্ধকার আছে, কি বল, তুমি সম্মত আছ ?

বিধু। আচ্ছা।

রতি। তুমি দেবীর নিকট স্বীকার করিলে ?

বিধু। করিলাম।

এই বলিয়া দুই জনে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই বিধু হরিনাথ বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যে যুবা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল, তিনিও বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে কুমুদিনী একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরের পত্র পাইলেন। তাহার অর্থ এই "অদ্য সন্ধ্যার পর খিড়কির বাহির হইও না, সমূহ বিপদ !"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা সধবা হলো।

কুমুদিনীর বিবাহের দিন উপস্থিত। বিধবার বিবাহ, বড় সমারোহ নাই। বালিকা কন্যা নহে—বালক বর নহে—সুতরাং বাজনাবাদ্য, বেশেলা, রোশনাই, বরযাত্র কন্যাযাত্রীর হুড়াহুড়ি নাই; লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই; উদ্যোগের বড় তাড়াতাড়ি নাই। বিশেষ বিধবার বিবাহ—হিন্দুয়ানি ছাড়া কাণ্ড, যে বরযাত্র বা কন্যাযাত্র আসিবে তাহারই জাতি যাইবে—লোক জনের বড় শব্দ নাই। সব চুপি চুপি, সব লুকাইয়া, চুপি চুপি বর বসিবার জন্য একটী ঘরে একটা বিছানা হইল; লুকাইয়া মালী একটা টোপর দিয়া গেল; লুকাইয়া নাপিত পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; লুকাইয়া স্ত্রী আচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। —কিন্তু স্ত্রী-আচারে কতকগুলা মেয়ে দল না বাঁধিয়া উলু না দিলে, গণ্ড গোল দাঙ্গা ফেসাদ না বাঁধাইলে সকল শাশুড়ীর মন উঠে না। অন্ততঃ সাতটি এয়ো চাই—নহিলে বরণ হয় না।

বিধবার বিবাহ—কেহ আসে, কেহ আসিতে চাহে না, হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেখিলেন সাতটি এয়ো জুট নাই। তাঁহার মনটা চটিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। বলিলেন "পাড়ার মাগীদের ন্যাকরা দেখে আর বাঁচি না। যা ত বিনোদিনি—মাগীদের ডেকে আন্‌গে ত। মাগীরে সে দিন কায়েতের ছেলের ভাতে লুচি মণ্ডা মেরে এলো, আর আমার মেয়ের বিয়েতে আসিতে পারে না। যা দেখি, প্যারীর মা, রামের দিদি, কানাইয়ের বউ, গিরিশের শ্যালী, সবাইকে ডাক গিয়া। না আসে ত যা হবার তা হবে।"

বিনোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জ্যেঠাইমার কথা না শুনিলে নয়। বলিল, যে "রাত হয়েছে একেলা যাব কেমন করিয়া?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন বিধি সঙ্গে যাক্ না।"

অগত্যা বিনোদিনী চলিল। অগত্যা বিধু সঙ্গে চলিল। উভয়ে খিড়কী দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাত্রি অধিক হইল তথাপি বিধু কি বিনোদিনী ফিরিল না, অথবা সাতটা এয়োর একটা জুটিল না, ও দিকে বরও এলো না, কি হবে, কুমুদিনীর মা, ঘর আর বার করিতে লাগিলেন। শেষেতে বিধু ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া কর্ত্রী চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হ্যাঁরে বিধি, বিনোদ কই?"

বি। ওমা সে কি, বিনোদ আসেনি? সে যে খানিক দূর গিয়ে আমায় বল্লে বিধু তুই সবাইকে ডেকে আন্‌গে, আমি বড় কাহিল, আমি বাড়ী ফিরে যাই।

কর্ত্রী। কই সে ত আসেনি, "হ্যাঁরে বিনোদ ঘরে এসেছে?" বলিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলই বলিল "না, আসে নি।"

এই কথা শুনিয়া কর্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মেয়ের বিবাহ ও সাত জন এয়োর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বিনোদিনী বয়ঃস্থা। বয়ঃস্থা কন্যাকে রাত্রে খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না, শুনে দশে দশ কথা বলিবে, সেই ভয়ে চুপি চুপি অনুসন্ধান হইতে লাগিল। যেমন কুমুদিনীর বিবাহ-উদ্যোগ চুপি চুপি হইতেছিল তেমনি বিনোদিনীর অনুসন্ধানও চুপি চুপি হইতে লাগিল। কিন্তু বিনোদিনীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে অধিক রাত্রি হইল তথাপি বর আসিতেছে না, লগ্নভ্রষ্ট হইবার সম্ভব, ইহাও মহাবিপদ্। হরিনাথ বাবু ভাবিলেন বিধবাবিবাহ কি জগদীশ্বরের মনোমত নহে, যাহাহউক সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি কি কুকাজ করিয়াছেন!

সেই রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় এক যুবা আপাদমস্তক একখানি বহুমূল্যের কাশমিরি শালের দ্বারা আবৃত করিয়া একটীমাত্র পরিচারক সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকা হইতে

নিক্রান্ত হইলেন, এবং বরাবর হরিনাথ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হরিনাথ বাবু বর বলিয়া চিনিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া বরাসনে বসাইলেন। বর আসিলে একটি শঙ্খের একবার মাত্র ধ্বনি হইল, কিন্তু হুলুর ধ্বনি হইল না।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল তথাপি সম্প্রদানের কোন উদ্যোগ না দেখিয়া হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বর ডাকিয়া বলিল "লগ্ন অতীত হইয়া যায়, সম্প্রদানের আর বিলম্ব কি?" ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তর করিল—"মহাশয় আপনার নিকট গোপন করা উচিত নয়, আমার একটি ভগিনীকে সন্ধ্যা হইতে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, সেই জন্য আমরা সকলে বড় কাতর আছি।" বর উত্তর করিলেন, " বিনোদিনীকে পাচ্চেন না—তাঁর বুঝি আজ বিয়ে—এতক্ষণ হয়ত হয়ে গিয়াছে, আর সুপাত্রে পড়েছেন আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। এ ভগিনীর সম্প্রদানের আর বিলম্ব করিবেন না।" এ কথায় অথবা তামাসায় হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে হরিনাথ বাবু বরকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন। বিধুর আহ্বানেই হউক আর বিধবার বিয়ে দেখিবার জন্যই হউক এখন সাতটি এয়ো জুটিয়াছে, সুতরাং কর্ত্রীর একবার সাধ হইল যে স্ত্রীআচারটা হয়। বর স্ত্রী-আচারস্থানে দাঁড়াইল কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত দেখিয়া সকলে জলে পুড়ে উঠিল, কত প্রকার তামাসা করিল, বর তবু মুখ খুলিল না। আকার ইঙ্গিতে বরকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু চোকটি কেমন নাকটি কেমন, বর্ণ কেমন এ না দেখিলে স্ত্রীলোকদের মন উঠে না। একজন—সম্বন্ধে শ্যালী পশ্চাৎ হইতে বলিল "ভাই তোমার খোলসটা ছাড় না একবার তোমায় দেখি—" বর খোলস ছাড়িল না, কিন্তু পুরুষের চাতুরি স্ত্রীলোকের নিকট অধিক ক্ষণ খাটে না, পশ্চাৎ হইতে সেই যুবতী তাহার শাল ধরিয়া এমত টান দিল যে শাল তাহার গাত্র হইতে খুলিয়া গেল। বর অনাবৃত হইল, এখন বরের মুখ ও শরীর সম্পূর্ণরূপে সকলে দেখিতে পাইল, কিন্তু দেখিবামাত্র সকলে স্তম্ভিত ও নিস্পন্দ হইল, ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ ভর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হইতেছে এই বাসনায় কুমুদিনী একটি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া বরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন বর অনাবৃত হইল তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। সম্মুখে বিধু অতি ম্রিয়মানা হইয়া বরকে দেখিতেছিল, নিকটস্থ একটি পাত্রে বাটা হলুদ দেখিতে পাইয়া কুমুদিনী সেই অগ্রহায়ন মাসের শীতে হঠাৎ যাইয়া বিধুর মুখে এবং গায়ে মাখাইতে লাগিল। এবং বলিল "পোড়ার মুখি, আমার বর দেখে কি তোর হিংসা হয়েছে, আয় আজ তোরও এই সঙ্গে বিয়ে দেবো—"

এই কথায় এবং ব্যবহারে বিধুর যে প্রকার মুখভঙ্গী হইল, তাহা যদি কুমুদিনী দেখিতে পাইত তাহা হইলে ভয় পাইত। বিধু উত্তর করিল, "ও যে রজনীকান্ত, ও তোমার বর কেমন করে—ও যে স্বর্গের বর—যদি তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে স্বর্গ রাগ করিবে,আজ রাত্রেই কেড়ে নিয়ে যাবে।" বিধুর এই নিষ্ঠুর এবং অমঙ্গলজনক বাক্যে কুমুদিনী বড় ক্ষোভিত এবং ভীত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। এদিকে রজনীকান্তকে দেখিয়া কুমুদিনীর মাতা "আমার সোণার চাঁদকে আবার ফিরে পেলুম" বলিয়া দাড়ি ধরিয়া চুম খাইলেন। তার পর কন্যা-সম্প্রদান হইল। কুমুদিনী আবার সধবা হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিরবাঞ্ছনীয় চির-হৃদয়বিহারী প্রতিমা রজনীর সহিত কি মিলন হইল? না এখন না; বিনোদিনী যে কোথায় তাহা রজনী ভিন্ন আর কেহ জানিত না, সুতরাং বিবাহের পর রজনীকান্ত বিনোদিনীর উদ্দেশে চলিলেন। কুমুদিনী কাঁদিতে লাগিল। বিধুর অমঙ্গলজনক বাক্যে মনে করিয়াছিলেন, যে বিবাহের পর আর তাঁহাকে নয়নের আড় করিবেন না, কিন্তু বিবাহের পরে তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল, অবিশ্রান্ত নয়নবারি ঝরিতে লাগিল।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোজ নামচা লিখিবার অভ্যাস।

বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলি মধ্যে লিখিয়াছেন—

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত॥

পাঠক!

জটাধারীর চরিতাবলীতেই ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাইবে। হঠাৎ অবতার হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে সকলে সেণ্টপল হন না, সকল ঋষি দেবর্ষি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, কলেজের সকল ছাত্র "দর্শনের" সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। স্বর্গারোহণের পথে কেহ ছাত্রবৃত্তি প্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ বি এব পথে, কেহ মৃতদেহ চিরে চিরে, কেহ রসায়নের অগ্নিপার্শ্বে পটকে যান। যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি বা প্রতিভা সকলের সমান নহে, কেবল বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কখন কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান কারণ। কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্মা কেবল অবস্থার অধীন ছিলেন না, সময় দেখিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন।

আমি যখন বিদ্যারম্ভ করি তখন

সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। বাঁম খড়িতে ভুমিতে লিখিতে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না, তাল পত্রে লিখিয়া রৌদ্রে কালী শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধূলা ছড়াইতে হইত, তখন "ইরেজার" বিনিময়ে চা-খড়ি, বুটিং বিনিময়ে চূণের থলি "গম আরেবিক" বিনিময়ে,আলকাতরাবিনিন্দিত কাল গঁদের ভাণ্ড, স্বর্ণনির্ম্মিত চিরকাল পটু পেটেণ্ট-পেনের বদলে বাঁতার কলম, মরক লেদর আবৃত ইসক্রু টপ মস্যাধার বিনিময়ে চাল চুবানি ও ভুষাজড়িত মৃত্তিকাপাত্র, তখন থেকার স্পিঙ্ক এবং কোং, পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বন্দোপাধ্যায়ভ্রাতা, মুখরজি পুত্র বা চাটুর্য্যা কোম্পানির কোন প্রসঙ্গ ছিল না।

শৈশবাবস্থায় "আগডুম বাগডুম" খেলায় বড় আমোদ ছিল, তখন "হঁাডু ডুডু" প্রণয়সম্ভাষণ বাক্য নূতন হইয়া ছিল। নামটী কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না, বোধ হয় ইংরেজদিগের How do you do ? হাউডু ইউডু কথা হইতে জন্মিয়াছিল। হাউডু অর্থাৎ কেমন আছ, এই সম্ভাষণ করিতে গিয়া তখন যুদ্ধ বাঁধিত। যাহা হউক মুসলমান বাদসাদিগের অনুকরণে মোগল পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ অনুকরণে এই খেলা হইয়া থাকিবে। এটি ঘোর যুদ্ধময় খেলার নাম ছিল—যাহাহউক সে খেলার সর্দার গঙ্গাধর শর্ম্মাই ছিলেন। তদ্ভিন্ন দৌড়াদৌড়ির সাঁতার শিক্ষার ও গুলি দণ্ড ক্ষেপণের একটী প্রধান "গ্রেজুয়েট" ছিলাম। পাঠশালার পাঠ কতক্ষণে শেষ হয় কেবল তাই সময়ে সময়ে ভাবিতাম, কিন্তু পাঠেও একবারে অনাস্থা ছিল না, দুষ্ট ছিলাম কিন্তু ধরা ছুঁয়া দিতাম না, এই জন্যই গুরুমহাশয় কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া "ভিজে বিড়ালটা" বলিয়া উঠিতেন, তাহাতে আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম, গুরুমহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আনাগনা ঘ গাঁড়র শিঙ্গে ম, হাডগোড ভাঙ্গা দ, কান্দে বাড়ি ধ, তিনপুটুলি শ, মিষ্ট স্বরসহ লিখিতাম। তখন মূর্দ্ধন্য ষ, ও মূর্দ্ধন্য ণয়ের নামও ছিল না, কয়ে ষ যোগ করিলে যে ক্ষ হয় তাহা গুরুমহাশয়ও জানিতেন না। এই কথার বর্ণ পরিচয়ে পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় এক দিন ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন "বিদ্যাসাগর বিদ্যাপচার করিয়াছেন, বাপ পিতামহের অপেক্ষা তাঁর অনেক বিদ্যা।"

আমাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর, প্রকৃত শ্রীমন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী; এখানে পাঠশালা, মক্তব, চতুষ্পাঠী সকলই উজ্জ্বল ছিল। গুরুমহাশয় আখন্জি মল্লা সাহেব, ও নবদ্বীপের ফেরত "লদের পণ্ডিত" আখ্যাধারী অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাগাভাগি করিয়া ছাত্রবর্গ মধ্যে রাজত্ব করিতেন। তখন

বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, উপক্রমণিকার নামও ছিল না, অল্লেই শিক্ষা শেষ হইত। শিক্ষালাভে অপেক্ষাকৃত পরিশ্রম করিতে হইত কিন্তু "লাউসেন দত্ত" মহাশয়ের বেত্রাঘাত আরও কষ্টকর ছিল। কয়েক বৎসর পাঠশালার পিটনি সহ্য করিয়া পাঠ সাঙ্গ করি। পরে পিতৃব্যগণের অনুজ্ঞায় আখন্দি মিয়ার কর্ণের আঘাত ও তৎপরে অবসরমতে চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ সূত্র মুখস্থ করিতে বাধ্য হই। লতান লাউ-লতা স্বরূপ লম্বাকৃতি লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, রক্তচক্ষু বেত্রপাণী, "দেড়ে" আখন্দি মিয়ার দয়া ও সুপক্ক বেলবিনিন্দিত চাক্চিক্যমান বৃহৎ মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণানুবাদ ক্রমে কীর্ত্তিত হইবে, ইহাদের মধ্যে কাহার গুণ বেশী কাহার তাড়না সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশজনক তাহা দুই এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। আপাততঃ রোজনামচা বা দৈনিক বৃত্তান্ত লিখনারম্ভ নির্দ্দেশ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

আমাদের গ্রামে দীঘীর নিকট পুরাণ থানা ঘর ছিল, যদিও থানা স্থানান্তরিত হইয়াছে তথাপি ঐ পথে গমন করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই বৃহৎ হাতার মধ্যে বৃহৎ শ্মশ্রুধারী গোলাম সরদার দারগা সাহেব পঞ্চ অঙ্গুলিতে গণ্ডতলস্থ কেশরাশি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতেছেন। দারগার নামে সকলে কাঁপিত. কিন্তু আমি ত সময় পাইলেই তাঁহার চৌকির পাশে যাইয়া বসিতাম। বলিতে পারি না কেন তিনিও আমায় ভাল বাসিতেন ও কহিতেন "লেড়কা বড়া হুঁসিয়ার"। যে সময়ে দারগা সাহেবের কাছারি গরম হইত, বিরুবরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খাঁ, সমসের খাঁ, রামচাঁদ শ্যামচাঁদনামা মুষ্টিপ্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়া রাখিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাঁধিত, তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদ মধ্যেও যাইতাম না। রবিবারে, চৌকিদার হাজিরির সময় শিষ্ট বালকের মত যাইতাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার মুন্সিজির তামাক ক্রয়জন্য এক একটি পয়সা দিত ও মুন্সিজি রোজনামচা পুস্তকে দিন দিনের ঘটনা লিখিতেন, আমি তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে দুই একটী মিষ্ট কথা কহিতেন, হয় ত কোন দিন দুই চারিটি পয়সা দিয়া নিকটস্থ দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আনাইয়া দিতেন ও দারগা সাহেব কহিতেন "বাবা থানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহাকেও কহিতে নাই, যদি কেহ বলে, শ্যামচাঁদের প্রহার লাভ হয়"। আমি থানার ঘটনা ভয়ে কাহাকেও বলিতাম না, দারগা সাহেব আমার উপর আরও সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমিও ভাবিতাম রোজনামচা লেখা ভাল কর্ম্ম, তাহাতে কাঁচা পয়সা আমদানি হয় ও অনেক খৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এই

সময় আবার আমাদের গ্রামে নববিদ্যালয় বিভাগের এক জন তত্ত্বাবধারক আসিয়া এক দিন অবস্থিতি করিলেন—তাহাকে কেহ "ইনষ্টপিষ্টি" কেহ "ষ্টুপিড" কেহ "পেকৃটব বাবু" কহিতে আরম্ভ করিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক বিবরণসহিত আত্মস্বাস্থ্যসম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন "বাবুব বাটীব বৃহৎ আরসিতে অদ্য নিজ মুখ দেখিয়া জানিলাম যে ক্রমাগত পরিভ্রমণে মুখশ্রী শুষ্ক হইয়াছে এবাব স্বস্থানে পৌঁহুছিয়া প্রতিদিন অজা মাংস ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিব।" কেহ রোজনামচা লিখে খৈচুর বেহ প্রতিদিন আজামাংস আহবণে সক্ষম হন। এত ভাল রোজনামচা, ইহা লেখা কর্ত্তব্য বোধে আমিও সময়ে সময়ে ইহাঁদেব অনুকবণ করিতাম। প্রাত্যহিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিখিতে চেষ্টা করিতাম। সেই অবধি আমার রোজনামচা লিখিবার হাতে খড়ি হয়—আজও লিখি, এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম্ম হইয়া উঠিযাছে। সেই বৃহৎ পুস্তক হইতে একটি আখ্যান উদ্ধৃত কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বোধ হয় কোন স্থল পাঠকগণের হৃদয়রঞ্জক হইলেও হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আত্মপরিচয়।

শরৎ কাল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল—সে আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পূজার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নিবিড় আম্রতলে খেলিতে খেলিতে সুদূরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম সূর্য্যদেব রক্তকলেবর, বৃহৎকায়, ধীরে ধীরে রাশি রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেন সোণার চক্‌চকে মোহর, সাটিনের থলিতে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বারা প্রবিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণ থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল লোহিত হইল, যেন ছায়া বাজিতে কত মূরতি আকাশপটে শ্রেণীবদ্ধ হইল—ঐ আকাশবুড়ি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে—ঐ শিপাই তরবাল হস্তে দণ্ডায়মান—ঐ বাঘ পশ্চাৎ পা কুঞ্চিত কবিয়া থাবা উত্তোলন করিয়া লম্ফ দিবার মনন করিতেছে—ঐ কুমিব পাটিযুগল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; আবার আবও দূবে নৌকা পতাকা সুবঙ্গে রঞ্জিত, তাব উপর বালশশিবেখা শ্বেত ফোঁটাব মত আকাশ ললাটে ভাসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, এমন সময় সুদূরে গ্রামে বাবুর বাটীতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার পরেই নৌবতের বাদ্য সানায়ের স্বরসহিত বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব্দ হওয়া মাত্র শস্য ক্ষেত্রহইতে শত শত বকদল উড়িয়া ইণ্ডীয় রবরেব ন্যায় ক্ষণেক লম্বা ক্ষণেক ক্ষুদ্র শ্বেত মালা গাঁথিল, গ্রামের বৃক্ষরাজি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল—আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে—

"বক মামা বক্ মামা ফুল দিয়ে যাও
যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও"

কহিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে দৌড়িলাম। মনে হইল আজ আমোদের কেবল আরম্ভ নহে। নৌবতখানা, ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়া,সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া পূজার বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূজার বাজানা জলদ বাজিতেছে, কত কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে বেলোয়ারি মালা গাঁথা হইতেছে, কোথাও কেহ সারি সারি সেজে বাতি, লণ্ঠনশ্রেণীতে নারীকেল তৈল সম্প্রদান করিতেছে। কেহ কহিতেছে এই ছবিটি নিম্ন হইল, সঙ্গের শিষ্ট হারাধনের ক্ষিপ্তবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে, কেহ কহিতেছেন মাঝের ঝাড়ের ঝালর বাসদেবের মাথায় ঠেকিবে, কেহ কহিতেছেন সাদা গোলক লণ্ঠনের মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা বেল-লণ্ঠন দাও, কেহ পরামর্শ দিতেছেন আল্তা গুলিয়া গেলাসে রঙ্গ দিলে বড় বাহাবই হয়, আবার কেহ সুনির্ম্মিত সোলার কান্দি কান্দি কলা, আঁসাঙ্কিত মৎস্য,নবরঙ্গ রঞ্জিত ফুল-ঝারা, তরবালহস্ত তালপেতে শিপাইশ্রেণী, নাট্যশালার চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে আলম্বিত করিতেছে। পূজার বাড়ী যেন প্রফুল্ল-মুখী কণের মত বড় সেজেছে। যথা প্রতিমার চাল চিত্র ও কারিকরগণের তুলিকা চলিতেছে তথা হইতে যেখানে লণ্ঠন গেলাসে উড়কি প্রমাণ তৈল বণ্টন হইতেছে, সকল দেখিলাম। এ আমার কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি না কিন্তু প্রতিমানির্ম্মাতা মিস্ত্রি-জ্যেঠা কহিতেন যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত তদবধি বিসর্জ্জনের দিন পর্য্যন্ত আমি সুস্থির থাকিতাম না, কখন মিস্ত্রির অসাক্ষাতে গড়িতে যাইয়া ভাঙ্গিয়া রাখিতাম; কখন আমার তুলিতে চাল-চিত্র গুলি বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কাজ বাড়াইয়া দিতাম; কখন বৃদ্ধ মিস্ত্রি, গুরুমহাশয়ের দুষ্টতানিবারণী ক্ষমতা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতেন ও যখন আমাদের উপদ্রবে তাঁহার তুলিকাচালনার নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিতেন "দত্তজা মহাশয় রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, প্রতিমা গঠন ও রঙ্গ ফলান হইতে যাত্রাদলের বাসায় যাইয়া পূর্ব্বাহ্নে সঙ্গের সংবাদ মনোযোগ পূর্ব্বক সংগ্রহ করা এক বিশেষ কার্য্য ছিল, সতত ব্যস্ত সমস্ত থাকিতাম ও প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটী মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ উপস্থিত হইত; মনে হইত কাল না হয় পরশ্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তের লম্বা বেত দর্শন করিতে হইবেক। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, হাতছড়ি এ সকল অকথা কুকথায় এখন সময় নহে।

সমারোহে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেন, তন্মধ্যে বাবু রয়ের আক্ষে-

শই প্রবল, সকলে তাঁহাদের আজ্ঞানু বর্ত্তী হইতেই শশব্যস্ত—ইহাদের মধ্যে একজন অমরেন্দ্র নাথ বড় বাবু, আর একজন নরেন্দ্রনাথ ছোট বাবু মহাশয়। উভয়ের আকার প্রকার, কথাবার্ত্তা বেশভূষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্ হয় নাই,আলবার্ট ফেসনের নামও নাই, উভয় বাবুর মস্তকে দশ আনি ছয় আনি বাটওয়ারার টেরি কাটা হইয়া উজ্জ্বল কাল কেশরাশি উভয় কর্ণের উপর সাপ খেলান হইয়া দুলিতেছে, "গুয়া-থুপি" কেশ গুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। গোঁফ যুগলও অনেক হেফাজতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম এক একটি বক্র মিহিরেখাতে শেষ হইয়াছে, ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় বেল-আটা বা মম সংযুক্ত হইয়া ঘড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র রহিয়াছে। উভয়েরই যোড়া ভ্রূ,ভ্রূযুগলমধ্যে পূজার শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, গলায় মিহি তুলসিমাল্য তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ, একটী রক্তবর্ণ পলা ও দুইটি সোণার দানা গ্রথিত। চাদর খানি কুঞ্চিত, যেরূপ আল্‌নাতে থাকে সেইরূপই বামস্কন্ধে দুলিতেছে। পূজার বাজার,—চৌড়া কাল কিনারা শোভিত মিহি ঢাকাই ধুতি উভয়ের অঙ্গলাবণ্য সংবর্দ্ধন করিতেছে, কোঁচার দিকুটি ময়ূর পুচ্ছের মত গিলা কুঞ্চিত, কাছাটি রেশমি ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা; উভয় বাবুই খালি ভূমে রুমাল পাড়িয়া বসিয়া আছেন, নিকটে এক একটী আঁকাবাঁকা কাল কাষ্ঠনির্ম্মিত যষ্টি রহিয়াছে, যষ্টির শিরোভাগে রৌপ্যনির্ম্মিত বাঘ মুখের অনুকরণ, সেই মুখে আবার হরিৎ প্রস্তর খচিত আঁখিদ্বয় জ্বলিতেছে। উভয় বাবুরই এক একটি পুতির নল সংযুক্ত ও রজতনির্ম্মিত কলিকা শিরাবরণভূষিত গুড়গুড়ি সকমলের জিবন্দাজে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও মুহুর্মুহু খাম্বিরা তামাক পরিবর্তিত হইয়া ভুড ভুড শব্দ করিতেছে। জ্যেষ্ঠ বাবুমহাশয় যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানেই ধুমপুঞ্জ উড়াইতেছেন, তাঁহার কাছে কাহারও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যো নাই। কনিষ্ঠ বাবু মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে স্তম্ভপার্শ্বে যাইয়া ফরসির নল ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম সংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও রকম বরকম কমটান সটান শব্দে জ্যেষ্ঠ সোদরের কর্ণ সুখসম্পাদন করিতেছেন। অমরেন্দ্র নাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন "ইহার অপেক্ষা সম্মুখে হইলে ভাল হয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চক্ষুলজ্জা উৎপত্তি হয়, নচেৎ সময়ে সময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ টান টানেন যে আমাদের জন্য কিছুই থাকে না।" পারিষদের সহিত বাবুগণ এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, ও উৎসবের উদ্যোগের সহায়তা করিতেছেন। ভৃত্য-

অনুচর যে আসিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যোড় হস্তে দাঁড়াইতেছে ও "বৈঠকখানায় চেও, পার্ব্বণী প্রস্তুত আছে" শুনিয়া সানন্দ হৃদয়ে বিদায় হইতেছে। উভয় বাবুই উদার, সকলের সমদুঃখগ্রাহী, লোকপালক, প্রিয়বাদী, ধনী, শ্রীমন্তের সন্তান তাহাতেই এত আদর। আমি বাবুগণের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিকটস্থ হইলাম। আমার বেশ ভূষা তাদৃশ পরিষ্কার ছিল না, ষষ্ঠীর দিন পার্ব্বণী বস্ত্র বাহির করিয়া আমিও বাবু সাজিবার আশয়ে সুখী ছিলাম। আমাকে দেখিবা মাত্র অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন "ওরে সেই জটা এত বড় হয়েছে, আয়রে ভাই" কহিয়া হস্ত ধরিয়া নিকটে লইলেন। "শ্যামবর্ণের উপর জটার কেমন শ্রী দেখ, "তুই বড়লোক হবি কিন্তু তোর পিতা তোরে ভাল বাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় দিতেন," এই কথা কহিতে কহিতে যেন চমকিয়া উঠিয়া ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ওরে হুঁকা লয়ে যা কর্ত্তামহাশয় আসিতেছেন।" এই কর্ত্তা মহাশয় কে? কর্ত্তা শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘুতা অন্তরিত হইল, বৃথা কথা থামিল, সব স্বর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়মান। বাবু আশুতোষ রায় কর্ত্তা বাবু মহাশয়ের পূজার বাটীতে আবির্ভাব, যেমন গৌরকান্তি তেমনি গম্ভীরভাব, তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র আমরা এক কোণে প্রস্থান করিয়া সুস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলাম ও ভাবিতে লাগিলাম, আমি ইহার মত বাবু হইতে পারিব না?

পাঠক! হেস না, আজ কাল বাবু হওয়া অতি সহজ কর্ম্ম, বোধ হয় তদপেক্ষা আর সহজ কর্ম্ম নাই; চুলে তেল দাও, তিন আনা মূল্যের কাঁকুয়ে টেরি কাট ও দশ আনা গজের কাল আল্পাকার চাপকান ঝুলাও। বাজারে সাইড স্প্রিং সংযুক্ত চকচকে পাদুকার অভাব কি? চীনেবাজারে দ্বাদশ আনা মূল্যের ফুলদার টুপি ক্রয় কর অভাব কি? আবার বাবু হইবারই বা ভাবনা কি? এখনও শ্যামলা কিনিতে পার না, সোনার চেনের বাহার দিতে পার না? নাই পরিবে? বড় বাবু নাই বা হলে, কেরাণি বাবু হও, কনেষ্টবল বাবু হও, না হও—পাচকঠাকুর বাবু হও,—না হয় রেলওয়ে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ কর "টিকিট বাবু" "ডাক বাবু" "তার বাবু" "টোল বাবু" "পাইণ্টমেন বাবু" "ঘণ্টা বাবু" হও, নিতান্ত তা না হও কনণ্ট্রাক্ট বা ঠিকার কার্য্য গ্রহণ কর, তাহাতে "শিলিপট বাবু" "ইট বাবু" না হয় "ঘুটিং বাবুও ত হইবেই হইবে?

কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্মা যে বাবু হইতে আকাঙ্ক্ষী সে বাবু এরূপ নহে—তখন বাবুর অন্য অর্থ ছিল। পাঠক! একবার চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সজ্জার কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজা ও তৎপ্রতিরূপ ভূর্জ্জিকের

কেমিনী রাজা, রঙ্গের গোলাম বিনিন্দিত বড় দরবারের শঙ্কভীত কামায়ে নাইট, বাহাদুরীহীন রায়বাহাদুর, ভূমি-শূন্য রাজা, রাজ্যশূন্য মহারাজা, এক পলের জন্য ভুল, বোধ হয় চিরকালের জন্য ভুলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। জটাধারী যে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন, সে ভদ্রের দৃষ্টান্ত স্থল, এখন বিরল, সেই বাবু সকল কেবল বেতন তালিকায় গেজেটের বাবু নহেন, এক এক বৃহৎ দেশ সেই পূর্ব্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। সেই বাবুদের অন্তঃপুরের মহিলাগণ কেবল হীরার খেলনা, বা অলঙ্কারের বা বারাণসী শাটীর গর্ব্বে গর্ব্বিত হইতেন না, তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মে, ব্রত দানে, দেবালয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রতিষ্ঠাউদ্দেশে পাগলিনীপ্রায়। আবার সেই বাবুগণ কেবল শ্বেত বস্ত্রে ও শুভ্র লম্বা কোঁচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাঁহাদের এক দিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজনপ্রতিপালনই প্রধান ধর্ম্ম জানিতেন; যাহাদের দান ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন উপকথা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের সুনাম, দানের যশ ও সুখ্যাতির স্রোত সহস্র সহস্র দরিদ্র ও অতিথের মুখে মুখে বৃন্দাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। সেইরূপ একটি বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোর মন বিচলিত হইয়াছিল—সেইরূপ রাজ্যধর ও রাজ্যপালনসক্ষম বাবুর কুল এখন লুপ্তপ্রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জনের বাজনা।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিসর্জ্জনের বাজনায় নূতন কি আছে? পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সময় হইতে ঐ বাজনা একই ভাবে বাজিয়া আসিতেছে। বাদ্যকরের হাতের জোরও কম দেখি না, শানায়ের সুরেরও খর্ব্বতা নাই, সে গলা ধরিবার নহে, ঢোল কাঁশি বরং আজ কাল শুনিতে বেশী খন্‌খনে বোধ হয়, কারণ আমরা সুমিষ্ট জয়-ঢাক ও বুগল শুনিতেছি। বাজনার সময় একবার শোকের আবির্ভাব হয়, মিত্রবিলাপ, বিচ্ছেদ ধ্বনি হৃদয় ধমনীকে বিলোড়িত করে, দুই একটি নিমজ্জিত প্রিয়তমের বিগত মলিন মুখশ্রীর ছায়ামাত্র স্মৃতিদর্পণে দেখা যায়। বিসর্জ্জনের বাজনা সাঙ্গ হইলে আমরাও দুই এক বিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করি কিন্তু দিনান্তে বাজনাও ভুলি শোকও ভুলি, ভুলিয়া আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকি ইহার নূতন কথা কি? নূতন কথা পুরাণ কথার বিস্মরণ, ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই বাজনার আনুষঙ্গী যাহা ছিল তাহা একবার মনে করে দিই, বোধ হয় তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উন্নতির প্রকৃত পরিমিতি নয়নগোচর হইবে।

ঐ শুন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে—গ্রামের ঈশানকোণে প্রান্তে উচ্চ জাঙ্গালের পদতলে একটী ক্ষুদ্র খালে শরদের জল খর খর চলিতেছে,

খালটি, আঁকা বাঁকা, একটি মোড়ে নব দুর্গা দহ, গম্ভীর ও প্রশস্ত, এক দিকে উচ্চ বাঁধ অপর পাড়ে বিস্তৃত তৃণময় হরিৎ প্রান্তর; নিকটবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ-ব্যাপী সপ্তগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক, আবালবৃদ্ধবণিতা ঐ প্রান্তরে মিলিত হইয়াছে, সকলের শিরোভূষণ স্বরূপ, প্রশস্ত প্রশান্ত অঙ্গশালী, গম্ভীরমূর্ত্তি আশুতোষ বাবু সসন্তান, আত্মীয় পারিষদ অনুগত সহ নবদুর্ব্বাদলশোভিত উচ্চ ভূমিশিরে দণ্ডায়মান; উপর্য্যুপরি পূজার তিন দিন প্রায় অনশনে যাপন করিয়াছেন, প্রত্যূষে সকলের অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রাত্রে সকলের শেষে সকল কার্য্য নির্ব্বাহান্তে ও পর দিবস প্রাতে যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হইবে তদুপদেশ প্রদান করিয়া শয্যায় গমন করিয়াছেন। কেবল কর্ম্মক্ষেত্রের আমোদে, অন্নদানে, মিষ্টান্নদানে, বস্ত্রদানে, পার্ব্বণী প্রদানে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক হইতে দিগম্বরী কাল মুচিনীর পর্য্যন্ত দুঃখহরণে তিন দিনরাত্র প্রায় অনিদ্রা অনাহারে যাপন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কোমল শরীর ক্লান্তিশূন্য মুখশ্রী প্রসন্ন, সকল বিষয়েই সম উৎসাহী মর্ম্মান্তিক ভক্তি ও ধর্ম্মবলে বলবান। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে, সকলের দৃষ্টি হইতে এই মাত্র সজ্জিত প্রতিমাখানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল, জলে উর্ম্মি রেখা আর দেখা যাইতেছে না, গগনের রাঙ্গা রঙ্গ সেই জলে প্রতিবিম্বিত, যেন আরসি উপরে সিন্দুর বিন্দু ছড়ান হইয়াছে। ক্রমে গগন আঁধারে ঘোর হইতেছে, তথাপি জনতা কমিতেছে না, দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ ভদ্র অভদ্র, সকলেই একটি তামাসা দেখিতে ঠেলাঠেলি করিতেছে, ছড়ি বেত পশ্চিমে পদাতিক 'বাবাজিদের হস্ত হইতে দরিদ্রের' পৃষ্ঠে পট্ পট্ পড়িতেছে, পড়ুক সহ্য হয়, তবু তামাসা দেখিব এই ভাবিয়া ঠেলিতেছে ভিড় আরও বাড়িতেছে। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে—গঙ্গাধর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্কন্ধে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে খেলা দেখিতেছেন। আজ কাল অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন এ আবার কিসের ভিড়? এ কিছু ইটালিয়ন অপেরা নহে, গিলবার্টের বাজি নহে, মমের পুতুলের মত যুবতী মেমদলের বল বা নৃত্য নহে, বড় সাহেবের লেভি নহে, ছোট সাহেবের দরবার নহে, ইংরেজি ছায়াবাজি নহে, তবে ছাই কিসের ভিড়? নিগারদলের হট্টগোল। পাইকদলের সর্দ্দার রঘুনীর রায় বাঁস ঘুরাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িতেছে। ভিড় ঠেলিয়া দেখ তাহার কেমন অঙ্গসৌষ্ঠব, সে মিছরির বাতাসা খায় না, সোডা এসিডের নামও জানে না, পাচক সিরপ্ দেখিলে গোচোনা বলিয়া হাস্য করে, ব্যায়াম তাহার সালসা, ঐ খালের জলই তাহার হজমের আরক, বসন্তকেও বিস্ফোটকের জ্বালায় অস্থির দেখিলে হাস্য করে ও কহে "অমার

হইলে কুস্তির সময় একটিপে বসাইয়া দিতাম," সে ডিস্‌পেন্‌সরি ডাক্তার খানার ধার ধারেনা,বৈদ্যের নাম শুনিলে গালি দেয়—তথাপি তাহার শ্রীদেখ। বক্ষদেশ বিস্তৃত লোহার কপাট—হস্তপদ কুঁদে নির্ম্মিত গোল গোল মুদ্গরপ্রায়, কেশরাশি প্রচুর, আলুথালু, তাহার কপালে ঢুলিতে ঢুলিতে নাচিতে নাচিতে আঁখি ঢাকিতেছে, সেই আঁখি রক্তবর্ণ, সেই কাল চুলের মধ্যদিয়া সিন্দুর মেঘের ন্যায় জ্বলিতেছে। রঘুবীর নাচিতেছে, লাফাইতেছে, চামর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাপরিবেষ্টিত এক খানি বৃহৎ সুপক্ক তেল চক্‌চকে রায় বাঁস ঘুরাইতেছে; তাহার উপযুক্ত তিন শত অনুচর ঢাল, তরবাল, বল্লাম, সড়কি, তীর, গদকা, রায়বাঁস, লম্বা লম্বা বন্দুক হস্তে তাহার দিকে দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে সাবাস দিতেছে। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে—অপর গ্রামের আবার একজন খেলয়ারের সর্দ্দার দুই শত অনুচরসহ খেলিতে আসিয়াছে। ইহাদের পাঁচ সাত জন পালয়ান পঞ্চু সরদারের সঙ্গে লাঠি চালাইতেছে, রঘুবীরকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দ্বাদশ জোয়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক বর্ষণ করিতেছে—কিন্তু রঘুবীরের এক রায়বাঁস ঘুরিতেছে, বন্‌ বন্‌ শব্দ হইতেছে, দর্শকের মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে বিপক্ষদলের লাঠি তাহার লোম মাত্র স্পর্শ করিতেও অক্ষম। অমরেন্দ্রনাথ বাবু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া স্কন্ধ হইতে চাদর লইয়া রঘুবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রঘুর আর খেলা আবশ্যক হইল না, শিরপা মাথায় বান্ধিয়া প্রণাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিয়া উঠিল—আবার তিরন্দাজ মুচিরাম সর্দ্দার রঙ্গভূমে প্রবিষ্ট হইল। নানা প্রকার অঙ্গুলে ফল কচি বেল তাল সেঁকুল পাবিকুল দূরে জাঙ্গালের জঙ্গলের উপরস্থিত হইল, মুচিরাম তিন চারিটী অনুচর সঙ্গে, সুসন্ধানে তির বন্‌ বন্‌ শব্দে দৌড়িল। ফল গুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল. চারি দিক্ হইতে "জিও মুচে" শব্দ গগন ভেদ করিল। চতুষ্পাঠীর তর্কালঙ্কার মহাশয় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দন্তহীন ওষ্ঠে হাসিতে হাসিতে নিজ চরণের ধূলি সংগ্রহ করিয়া মুচিরামের কপাল ভরিয়া দিলেন, মুচিরাম চরিতার্থ জ্ঞানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার জোরে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিল—আবার খেলা বড় মাতিল। ময়দানে আর জায়গা হয় না, তামাসা দেখিবার আশয়ে কেহ বটবৃক্ষশাখে কেহ তালবৃক্ষের অর্দ্ধেক উঠিয়া স্কন্ধ ধরিয়া জড়াজড়ি করিয়া খেলা দেখিতেছে। গদকা লাঠি খেলান্তে মল্লযুদ্ধে মহীতল কাঁপিয়া উঠিল। তরবাল খেলা হইবার উদ্যোগে বড় দাড়ী গোলাম সর্দ্দার দারগা সাহেব কি হুকুম দিলেন সে খেলা আর হইল না।

অমরেন্দ্র নাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই

বিশেষ ব্যায়ামপটু ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে মল্লযোদ্ধাদের বিশেষ আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। নিয়ত প্রাতে বালকগণকে কেদারায় বসাইয়া এক হস্তে এক পায়া ধরিয়া শূন্যে উঠাইতেন, যে লোক এক হস্তে ঢেঁকি ঘুরাইয়া এক বিঘা অন্তরে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিত তাহাকে একসের কাঁচা ছোলা খাইতে দিতেন, যে দুই হস্তে আড়াই মন করিয়া পাঁচ মন বস্তা উঠাইত সে একটা সব ময়দা পাইত; যে মাথা ঠুকিয়া বৃক্ষ হেলাইতে পারিত সে এক টাকা বক্সিস পাইত। যে পশ্চিমে পালয়ানকে কুস্তিতে পরাভব করিত সে উভয় হস্তে রূপার বালা পাইত। তাঁহাদের উৎসাহে বীরত্বের উৎসাহ হইত। এখন সন্ধ্যাকাল—প্রায় নিশাতে পর্য্যাপ্ত—হস্তী ঘোটক পতাকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পদাতিক সহ দাঁড়াইল। দুই একটি খেলার মাত্র সময় আছে। প্রথমতঃ নবমীপূজার বলীর মধ্যে একটি বুড় ছাগলের বৃহৎ কাটা-মুণ্ড দর্শক পাইকদলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, বলে যে পাইক তাহা দখল করিতে পারিবে মুণ্ডটী তারই হইবে, আবার একটী টাকা পুরস্কার পাইবে। পলে পলে মুণ্ডটী এক হাত হইতে অন্য হস্তে পতিত হইতে লাগিল, সমস্ত প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া আসিল, অনেকেরই মুষ্টিশক্তির পরীক্ষা হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে মুণ্ডটী লোমহীন হইল, ক্রমে তাহা রঘুবীরেরই করগত হইলে, চারিদিক্ "রঘুর জয়! রঘুরই জয়" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলের অনুরোধে অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ অশ্বারোহী হইলেন। নদীজলে দুইটি বোতল নিক্ষিপ্ত হইল, কাল মুখদ্বয়ের গোল রেখামাত্র কাল সন্ধ্যা-জলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। দূর হইতে উভয় অশ্ব দৌড়িল, নদীস্রোতসহ সমান্তরালে দৌড়িতে দৌড়িতে দুটি বন্দুক ছুটিল, ধূমপুঞ্জসহ নদীবক্ষে ঠন্ ঠন্ শব্দ হইয়া বোতলাগ্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল—একটী পশ্চিমা সিপাহী কহিয়া উঠিল "বাহবা! বাহবা। খোদা খয়ের করে! খোদা খয়ের। যব সরদার এসা হ্যায় তব তাঁবেদার লোক কাহে নাহি খেলা শিখে?" আশুতোষ বাবুর প্রফুল্ল ওষ্ঠে তাড়িতের ক্ষীণ রেখার ন্যায় হাস্য ঈষৎ খেলিল।

মুহূর্ত্তে বাদ্যস্বর পরিবর্ত্তিত হইল। সমারোহে সুসজ্জিত অশ্ব, গজ, পদাতিক, পতাকাশ্রেণীসহ শত শত রসদীপালোকে লোকস্রোত উৎসব শেষে বৈরাগ্যমনে গৃহাভিমুখে প্রবাহিত হইল, বৃক্ষশাখা হইতে স্থানে স্থানে ভীত পিককুল হুর হুর করিয়া উড়িয়া গেল, ক্রমে স্থূল জনস্রোত শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত হইয়া নানা পথে, অলি গলিতে দশ দিকে ছড়িয়া পড়িল ও ক্রমে বিলীন হইল। শত শত লোক আবার মিষ্টান্ন ও সিদ্ধিপানাশয়ে বাবুজীর গৃহাভিমুখে চলিল, অনেকে কহিতে লাগিল "আবার এক বৎসর বাঁচি ত দেখিব।"

পরদিবস গঙ্গাধরশর্ম্মা স্বহস্তে লাঠি তরবার প্রস্তুত করিয়া, নিজমুখে বাজনা বাজাইয়া সমবয়স্ক সঙ্গীসঙ্গে, বিসর্জ্জনের খেলা আরম্ভ করিলেন, সেই খেলার অভ্যাস অনেক দিন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা কারণবশতঃ গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র হইয়াছে আমরা সভ্য হইয়াছি। সতীরা পতিপূজা ত্যাগ করিয়াছেন, পুরুষ সকলে স্ত্রীর অধীন হইয়াছে—আমরা তথাপি সভ্য হইতেছি, স্ত্রী পুরুষ "উচ্চ শিক্ষার" দোহাই দিয়া পুস্তক পড়িতে সক্ষম হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসিতেছে, তরিবত মণ্ডলের ছেলে পর্য্যন্ত তরিবত পাইতেছে, কালা জেলে মৎস্য ধরে না, নাইট স্কুলে এটেণ্ড দিতে শিখিয়াছে। আন্না রাখী মুসলমানী, হেমলতা ব্রাহ্মণী, এক বেঞ্চে বসিয়া সুশিক্ষিত হইতেছে, ভবিষ্যতের একই বাঞ্ছা বৃদ্ধি করিতেছে। সাহসশিক্ষা গোঁয়ারের কার্য্য হইয়াছে, শস্ত্রশিক্ষা চোয়াড়ের ব্যবসা, পুস্তকরচনা শান্ত লোকের সার উদ্দেশ্য, সকলে আইন পড়,বাক্‌পটু হও এই সকল শিক্ষা হইতেছে, আর শিক্ষার আর উন্নতির বাকি কি? এদিকে বীরত্ব সম্বন্ধে বিসর্জ্জনের বাজনা উঠিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কোলাকোলি।

বিসর্জ্জনান্তে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ! আশুতোষ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা এখন উৎসবরবশূন্য। বাদ্যের সুরও আর এক রকম, চির প্রথানুসারে সন্ধ্যার পরে চণ্ডীবেদির কাষ্ঠনির্ম্মিত চৌকির এককোণে একটীমাত্র ক্ষীণ দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে বৃহৎ কক্ষের সীমান্তরের অন্ধকার মাত্র পরিদৃশ্যমান—ছবি কি ঝাড়ের বেলয়ারি ফুল যেন শোকসূচক নীল বস্ত্রাবৃত ঘেটাটোপে আবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির রূপান্তর নাই—সমাজসুখে প্রকৃতির মুখ বিমল করে না—দশমীর চাঁদ সমান উজ্জ্বল তাহাতে আবার পূজার বাটীর শুভ্র বৃহৎ প্রাচীরচূড় দীপ্তিমান্। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ পরে বিসর্জ্জনের বাজনা থামিয়াছে, আশুতোষ রায় স্বজন সমভিব্যাহারে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর বেদি লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন পরে, অধিষ্টাতৃগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন, তর্কালঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকোলি আরম্ভ করিলেন। অশীতি বর্ষীয় গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয় অস্থির মস্তক নড নড করিতে করিতে আসিতেছেন, পলিতকেশ সিদ্ধান্ত মহাশয় একটী মাত্র জীর্ণ দন্তে হাসি প্রকাশ করিয়া বাহু প্রসার করিতেছেন এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী গিরিধারী, গোপাল, ভূপাল বালকগণকে আশুতোষ বাবু সমসমাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন—গঙ্গাধরও একবার বড়লোকের অঙ্গস্পর্শনে আপনাকে বড়লোক জ্ঞান করিলেন। আবার আশুতোষ বাবু কাহারও দাড়ি চুম্বন করিতেছেন, কাহারও মস্তকে করপল্লব প্রদানে আশীর্ব্বাদ

করিতেছেন, যেন আত্মীয় স্বজন, ভৃত্য-শ্রেণী, গ্রামস্থ, দেশস্থ, অধীন প্রজাপুঞ্জকে, তাবৎ দেশ তাবৎ পৃথিবীকেই প্রণয়-পাশে পরিবদ্ধ করিতেছেন—সৌহার্দ্দ্য-স্রোত চারি দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। শক্তিপূজান্তে এই প্রথাটি কেমন প্রীতি কর? সভ্যতার প্রভাবে এটিও কি পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথায় আমোদ আছে কিন্তু এই আমোদের বেলা ভূমে যেন শোক উর্ম্মি স্মৃতিবায়ুতে উত্থিত হইয়া এক একবার প্রতিঘাত হইতেছে—আশু বাবু এক একবার কহিয়া উঠিতে ছেন "আজ ঈশান কৈ? থাকিলে কত হাসি হাসাইত, শুকদাস থাকিলে দশ গণ্ডা মিঠাই উঠাইত, কৈলাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমোদ উঠিয়া গিয়াছে।" সিদ্ধান্ত কহিতেছেন "তপস্যার ফল—সব স্বল্প ভোগীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।" আবার কেহ কহিতেছে "আমাদের এই কোলাকোলিই শেষ—আর বৎসর এ দিন দেখ্‌তে কি আর মহামায়া রাখ বেন্।" অমনি সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে আবার এই সময়ে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কোন হতভাগ্যের জননীর ক্রন্দনধ্বনি হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে—"সবাই নেচে খেলে বেড়াচ্চে কেবল আমার সেই নাই—" কেহ অধীরা হইয়া জগজ্জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমাকে কে দয়াময়ী বলে?" এই রূপ আমোদে শোকে সংশ্লিষ্ট হইয়া কোলা-কোলি ব্যাপার প্রায় শেষ হইল। আমি অন্তঃপুরদিকে, মহিলাগণের নিকট, আসিয়া দেখিলাম গ্রামের ভদ্রবংশের সমস্ত কুল-নারীগণ একত্রিত—চাঁদের আলোকে এ-কটী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছেন। সকলের চারু প্রতিমা অলঙ্কার ভূষণ সহ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চাঁদের হাটের কেন্দ্র স্বরূপ রাঙ্গাঠাকুরুণ বিরাজিত অল্প বয়সে বৈধব্য শোকে তাঁহার রাঙ্গামুখের রাঙ্গা আভা যেন কিঞ্চিৎ পাতলা হইয়াছে, তবু শ্বেত বস্ত্রাবৃত মুখলাবণ্য চন্দ্রকিরণে যেন শ্বেত গোলাপের ন্যায় দেখা যাইতেছে, যেন শ্বেতকিরণ শ্বেতকুমুদে আকাশের চাঁদ মর্ত্তের চাঁদে মিলিত হইয়াছে। আমি মাতার কোলে উঠিলাম। রাঙ্গাঠাকুরুণ হেসে বলিলেন "উঠিল, এত বড় ছেলে আবার কোলে চড়ে?" দাইমা কহিল "হউক চিরকাল চড়ুক।" জননী সস্নেহে চুম্বন করিলেন ও কহিলেন "ওমা আমার হৃদের গোপাল—খোকা বৈকি?" আ-বার একটি নারী কহিল "রাম খোকা।" নারীনিকরমধ্যে একটি মাতৃক্রোড়স্থ শিশু এই সময় কহিয়া উঠিল "মা আমি সটোর খোকা।" খোকার মা কহিলেন "কি মিষ্ট কথা আমার নীলমনির।" আমি নীলমনির দিকে দেখিলাম। নীলমণি এ-কটী দ্বাদশ বৎসরের গৌরবর্ণ বালক কিন্তু খর্ব্ব অশিষ্ট মুখশ্রী মোটা মোটা ভোতা অঙ্গাবয়ব, পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি ও মূল্যবান্ স্বর্ণতারবিনির্ম্মিত রত্ন-খচিত ফুলদার কিনখাপের চাপকান, পীতবর্ণ সাটিনের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প-

পুষ্প সুশোভিত পায়জামা, তাহার নীচে গোলাপী রেশমী মোজাদ্বয়ের কিঞ্চিৎ অংশ দৃশ্যমান,পদদ্বয়ের অগ্রভাগে জরির পাদুকা শোভমান। এ দিকে আবার চাপকানের উপর বক্ষঃদেশে স্থূল সুবর্ণ-নির্ম্মিত হীরাকাটা চন্দ্রসূর্য্যের আভা-প্রকাশক তারাহার। তার উপর রামধনু-প্রভাসম কোমল কেরেপের জলতরঙ্গিনী ফিনফিনে উড়ানী, মস্তকে জাজল্যমান জরির আরথ বরথ কারুকার্য্যপূর্ণ রত্ন-খচিত টুপি উভয় কর্ণে কুণ্ডল দোলায়মান, নাসাগ্রে দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ডিম্বা-বয়ব মুকুতা ঝলমল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় নীলমণি কোন হঠাৎ অবতারের আহ্লাদে ছেলে! আমি কহিলাম "এস ভাই খেলা করি।" নীলমণির মাতা কহিলেন"বাছা বড় তরাসে, সেই প্রতিমা বের হবার পূর্ব্বে বন্দুকের শব্দ শুনে পর্য্যন্ত আমার কোল ছাড়ে নাই, বাজনার শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে চক্ষু মুদে ছিল,বাছা—এই এতক্ষণে বাজনা থেমেছে তবে বাছা চেয়েছে।" নীলমনির প্রতি আমি দেখিতেছিলাম এমন সময় আশুতোষ বাবুর কয়েকটি কথা আমার কানে বাজিল "অমরেন্দ্র নাথ কোথায়?" অনুসন্ধান করিয়া এ কটী ভৃত্য আসিয়া কহিল যে কালিন্দী সরোবর ঘাটে সোপানে একক বসিয়া-ছিলেন। পরক্ষণেই অমরেন্দ্রনাথ আগত হইলেন। তিনি সকলকে মর্য্যাদানুসারে প্রণাম করিলেন,নমস্কার করিলেন, কোলাকোলি করিলেন; কিন্তু অন্যমনস্ক, কোন বিষয়ে মনোবিকার উপস্থিত হই-য়াছে বোধ হইল। যে সময়ে তিনি বিসর্জ্জনের ঘাটে গুলিতে বোতল ভাঙ্গেন সেই সময় একটী রত্ন দেখিয়া-ছিলেন দেখিয়াই আবার হারাইয়াছেন, আবার কেমন করে পাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন।

বোতল চূর্ণ হইলে, ঘোটক হইতে অবতরণসময়ে খালের অপরকূলে জাঙ্গা-লের দিকে অমরেন্দ্র নাথ নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নব তৃণময় হেলান বাঁন্ধ লোকাকীর্ণ, কেবল সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী নব্য বনতমাল তলে দেখিলেন যে সুস-জ্জিত পার্ব্বণী অলঙ্কার বেশভূষিতা কয়ে-কটি কামিনী দণ্ডায়মান; তন্মধ্যে একটী কুমুদ মুখ প্রস্ফুটিত, প্রায় কন্যাটী দ্বাদশ বর্ষ মাত্র উত্তীর্ণ, নীলাম্বরপরিবেষ্টিত তাহার সুন্দর মুখ সুনীল স্বচ্ছ সরোবরে কোমল শতদলস্বরূপ লাবণ্যময়। অম-রেন্দ্র নাথ অশ্ব হইতে অবতরণ সময়েই জাঙ্গাল হইতে লোক সঙ্কুল স্থানে হইল সেই ভিড়ে তাহার রত্নটি মিশাইয়া গেল। সেটি কে? কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোন গৃহ উজ্জ্বল করিতে চলিল? আর কি তারে দেখিব? এমন সুললিত প্রেম-ময়ী স্বর্গীয় কনক কমল কি সমলবারি স্বরূপ দুঃখিজনগৃহে দুঃখ শয্যাশায়িনী হইবে? না রাজগৃহে রাজমহিষী হইয়া বিরাজ করিবে?

অমরেন্দ্রনাথ আজ মনশ্চাঞ্চল্য প্র-

থমে অনুভব করিলেন, বাল্য সুখ আজ বিচলিত হইল। সকলের সহিত বিসর্জ্জনান্তে কোলাকোলি ও অপর আমোদে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু প্লাবিত গঙ্গাবক্ষে স্রোত চলিতে চলিতে তাঁহার বাল্যাবধি কোন নিগূঢ় আকর্ষণী গুণে জলচক্রে পাতিত হইতেছে মধ্যে মধ্যে সুগভীর হৃদয় খনিতে একটি মণি স্পর্শন জন্য পাক মারিতেছে ডুব দিতেছে।

পঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অহোরাত্র নিরম্বু একাদশীর উপবাস কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে উহা দৃষ্ট হয় না। তথায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরা ফলাহার করিয়া এ ব্রত করিয়া থাকেন। নিরম্বু উপবাস আদবে নাই এমন নহে; উহা বৎসরে কেবল এক দিবস মাত্র করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে। বিধবাদিগের একাদশীব্রত যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এ সংস্কার বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে একাদশীর উপবাস হিন্দুদিগের মধ্যে এক সাধারণ পুণ্য ক্রিয়া। ইহাতে বিধবা কি সধবা, স্ত্রী কি পুরুষ সকলের সমান অধিকার। হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা বিধবাই হউক আর সধবাই হউক, যাহার ইচ্ছা, একাদশীব্রত করিয়া থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে বিধবারা একাদশীর উপবাস না করিলে, কেহ তজ্জন্য তাহাদিগকে দোষ দেয় না। যাঁহারা এ ব্রত করেন, পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্তই করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, (পেড়া প্রভৃতি) এবং পানিফল প্রভৃতি ফলাহার করিয়া থাকেন।

পঞ্জাব প্রদেশে একপ্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। উহার নাম "চাদর ডাল্‌না"। বর ও কন্যার উপর একখানা কাপড় ফেলিয়া দিয়া উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ বিবাহে বিবাহের সকল অনুষ্ঠান হয় না। বর ও কন্যাকে কাপড় দিয়া আবৃত করা এবং ধর্ম্মশালায় উপস্থিত লোকদিগকে কড়া প্রসাদ অর্থাৎ মোহন ভোগ বিতরণ করা হয় মাত্র। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতিতে এ বিবাহ বৈধ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পরিবারে এ প্রকার বিবাহ হইলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। কেবল নিকৃষ্ট কুল বলিয়া গণ্য হইতে হয়; এবং কুলীনদিগের সহিত

আদান প্রদান করিবার অধিকার থাকে না। প্রধান নগর লাহোর ও অমৃতসরে এ প্রকার বিবাহের সংখ্যা অল্প। সেখানে কিছু বিচার অধিক। পল্লীগ্রামেই এরূপ বিবাহ অধিক ঘটিয়া থাকে। সীমান্ত প্রদেশের (Frontier) নিকট যাঁহারা বাস করেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের উদারতা অনেক অধিক। উড়িষ্যা প্রদেশেও এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। উহা কেবল দেবরের সহিত হইয়া থাকে। কিন্তু পঞ্জাবের "চাদর ডাল্‌না" বিবাহ যে কেবল দেবরের সহিতই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। স্বজাতীয় লোক হইলেই তাঁহার সহিত বিধবার বিবাহ হইতে পারে। এ বিবাহ আদালতে আইনসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

পঞ্জাবের একটি বিশেষ রীতি এই যে, সেখানে চারিবর্ণের মধ্যে অন্নের স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার নাই। শূদ্রে রন্ধন করিলে ব্রাহ্মণেরা তাহা অম্লানবদনে আহার করিয়া থাকেন। তবে যবনের স্পৃষ্ট অন্নজল তাঁহাদিগের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। "ভারতে একতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, লাহোরের বাজারে শূদ্রে মাংস রন্ধন করিয়া বিক্রয় করিতেছে, অতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণেও উহা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিতেছেন।

পঞ্জাবে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় এত অধিক নহে। পল্লীগ্রামে সর্ব্বদাই ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু লাহোর অমৃতসর প্রভৃতি নগরে বাল্যবিবাহ প্রথা অধিকতর রূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

লাহোর নগর প্রকাণ্ড প্রাচীরপরিবেষ্টিত। কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও নগর সীমা বহুকাল হইতে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। উহার নাম "আনার কলি"। আনার শব্দের অর্থ দাড়িম্ব। "আনার কলি" অর্থাৎ দাড়িম্বের কলি। জাহাঙ্গীর বাদসাহের জনৈক বেগমের নামানুসারে উক্ত নগরাংশের নামকরণ হইয়াছিল। আনার কলি অতি সুন্দর স্থান। তথায় প্রশস্ত রাজপথ ও সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী বিদ্যমান।

কিন্তু প্রাচীরের মধ্যগত নগরাংশের ভাব অন্য রূপ। অধিকাংশ পথই এমন সঙ্কীর্ণ যে, পদব্রজে ভিন্ন শকট লইয়া গমন করিবার সুবিধা নাই। পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল সেই সঙ্কীর্ণ গলির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। গলির ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। পবনদেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই বুঝি নগর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সূর্য্যদেব অতিকষ্টে ও অতি অল্পকালের জন্যই স্থানে স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বারানসী দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা অনেক পরিমাণে আমার বর্ণনার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিবেন। যেমন রাজপথ, গৃহ গুলিও তদনুরূপ। এক একটী ঘর যেন এক একটী সিন্দুক। তন্মধ্যে কোন প্রকারে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিতে পারে মাত্র। জীবাত্মার এত বদ্ধভাব আর কোথাও নাই। নগরের প্রাচীর, তৎপরে গৃহের প্রাচীর, তৎপরে দেহের প্রাচীর, এই প্রকার প্রাচীরের পর প্রাচীরে বদ্ধ হইয়া জীবাত্মাকে বড়ই জড়সড় হইয়া বাস করিতে হয়।

প্রাচীরের বাহিরে মেখলার ন্যায় সমগ্র নগর পরিবেষ্টন করিয়া অতি রমণীয় উদ্যান শোভা পাইতেছে। নগর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইলে সেই উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মহানগর লণ্ডনের উপবন সকলের ন্যায় লাহোরের এই উদ্যানকে উহার শ্বাসনালী বলিলেও চলে। জাহাঙ্গীর বাদ্সাহের সমাধি, রণজিৎ সিংহের সমাজ, ও সালিমাবাগ লাহোরে এই কয়েকটি স্থান বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। সালিমাবাগ অতি রমণীয় ও আশ্চর্য্য উদ্যান। উহা জাহাঙ্গীরের সৃষ্ট। এ প্রকার ত্রিতলউদ্যান আর কোথায় আছে কিনা জানি না।

শঙ্করাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আজি আমরা শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিব, লিখিবার পূর্ব্বে একটি কথার মীমাংসা চাই। সে কথাটি এই, শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিতের জন্য যে দুই খানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর লোকে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসের সঙ্গে বিচার করিতেছেন, অথচ বেদব্যাস তাঁহার জন্মিবার হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নিতান্ত ভক্তি-অন্ধ লোক ভিন্ন এ সকল কথা কাহারও বিশ্বাস করিবার যো নাই। এরূপস্থলে কি করা উচিত? একদল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, সত্য বাছিয়া লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। আর একদল আছেন, তাঁহাদের মতে এরূপস্থলে কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমোক্ত মতের উত্তর এই যে, কোন্ ঘটনাটী সত্য, কোন্টী মিথ্যা স্থির করিয়া উঠা যায় না। অনেক সময়ে লেখক সকলই সত্য বিবেচনা করিয়া লিখেন। অনেক সময়ে ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত হইয়া গুরুদেব বা ধর্ম্মপ্রচারককে ঈশ্বরতুল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া লিখিয়া বসেন। সেস্থলে কোন্টী লেখকের স্বকপোলকল্পিত ও কোন্টীতে কত পরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য আছে স্থির করা যায় না। সুতরাং সত্য বাছিয়া লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগের চেষ্টা বিফল। আবার এই রূপ অর্দ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে কিছুমাত্র সত্য নাই, ইহা বলাও নিতান্ত

নির্ব্বোধের কাজ। আমাদের মত এই যে, যখন শঙ্করবিজয়ের ন্যায় কোন অর্দ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমরা পাইব, আমরা এমত বিবেচনা করিব না যে উহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত জীবনচরিতের ন্যায় প্রকৃত ঘটনা সমূহ বিশেষরূপে বিচার করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা শঙ্করাচার্য্যের নিকটেও যাইব না। আমরা দেখিব, লেখকের মনে শঙ্করাচার্য্য বলিলে কিরূপ ভাব হইত অর্থাৎ তাঁহার মনে শঙ্করাচার্য্যের ideal কিরূপ। আবার যখন সেই গ্রন্থ তৎকালীন জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত দেখিব তখন জানিব গ্রন্থকারেরও যেরূপ ideal তৎকালীন লোকেরও তদ্রূপ। আমরা জানিব শঙ্করাচার্য্য যে ঐরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন ইহা এককালে অনেক লোক বিশ্বাস করিত। গ্রন্থকার যতই শঙ্করাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী কালের লোক হইবেন ততই সে ideal যথার্থ বলিয়া মনে করিব।

এই মত অনুসারে আমরা শঙ্করবিজয় ও শঙ্করদিগ্বিজয় হইতে সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিব না। যেমনটী দেখিব, ঠিক তেমনটি লিখিব। দুই গ্রন্থে অনেক স্থানে মিল হয় না, তাহার দুই একটা দেখাইয়া দিব। প্রধানতঃ শঙ্করবিজয় আমাদের অবলম্বন।

শঙ্করবিজয়ের প্রথমেই আছে, এক দিন নারদমুনি পৃথিবীতে নানারূপ অসদ্ধর্ম্মের প্রচার দেখিয়া ; কাপালিক, ভৈরব, বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক প্রভৃতি নানা মতের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপ হইতেছে দেখিয়া, ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা নারদকে লইয়া, শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরামর্শ হইল, শিব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতার হইবেন। শিব আসিয়া চিদম্বর নামক দেশে আকাশলিঙ্গ নামক শিবমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন। সেখানে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্ব্বজ্ঞ নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী কামাক্ষী চিদম্বর পুরে শ্বর শিবের আরাধনা করিয়া বিশিষ্টা নামে এক তনয়ালাভ করেন। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিশিষ্টা "আমার স্বামী বিশ্বজিৎ আর আকাশলিঙ্গ শিব দুই এক" এই ভাবনা করিবা এক সন্তান লাভ করেন, সেই সন্তানই অদ্বৈত মতের গুরু শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্করদিগ্বিজয়ে অবতারের কথা কিছু অধিক। শিব বলিলেন আমি ত অবতার হইবই, আমার সঙ্গে আরও পাঁচ জনের ত অবতার হওয়া চাই, তা কার্ত্তিক তুমি আগে ভট্টপাদ কুমারিলনামে অবতার হইয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, জৈমিনীর যে পূর্ব্বমীমাংসা আছে, তাহার টীকা কর। ইন্দ্র তুমি সুধন্বা নামে রাজা হইয়া ভট্টপাদের সহায়তা কর ও বৌদ্ধদিগের বিনাশ কর, বিষ্ণু ও শেষনাগ তোমরা সংকর্ষণ ও পতঞ্জলি হইয়া ও ব্রহ্মা মণ্ডনমিশ্ররূপ ধরিয়া ভট্টপাদের সহকারী হও। একবার

বাল্মীকি দেবতাদিগকে বিষ্ণুর দোসর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। আবার মাধবাচার্য্য কবি তাঁহাদিগকে আনাইলেন। সুধন্বা রাজা প্রথম বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিকমণ্ডলীতে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন,একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

"মলিনৈশ্চেন্ন সংসর্গো নীচৈঃ কাককুলৈঃ পিক।
শ্রুতিদূষক নির্হ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদা ভবেঃ॥

"হে কোকিল তোমার যদি শ্রুতিদূষক (বেদনিন্দক) শব্দকারী কাককুলের সহিত সংসর্গ না থাকিত তাহাহইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে।" রাজা শীঘ্রই ভট্টপাদের শিষ্য হইলেন। বৌদ্ধেরা প্রতিপদে অপদস্থ হইতে লাগিল। শেষ এই বন্দোবস্ত হইল, যে ভট্টপাদ ও বৌদ্ধেরা একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে পড়িতে হইবে, যে বাঁচিবে তাহারই মত সত্য। ভট্টপাদ পড়িলেন, বাঁচিয়া রহিলেন। বৌদ্ধেরা পড়িয়া মরিয়া গেল।*

শঙ্করের বংশাবলী সম্বন্ধে দুই গ্রন্থে বিশেষ গোলযোগ। দিগ্বিজয় বলেন, কেরল দেশে পূর্ণানদীর পুণ্য তটে বৃষাদ্রি নামক স্থানে মহাদেব অধিষ্ঠান করিয়া একজন রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, সে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। সেই রাজার অধীনস্থ ব্রাহ্মণদিগের কালটি নামে একজন প্রধান ছিলেন, কালটীর অধীনে বিদ্যানিবাস নামে একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র শিবগুরুও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি প্রথমে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজীবন গুরুকুলে বাস করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে পিতামাতার দুঃখে কাতর হইয়া বিবাহ করিলেন, তিনি বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যান নাই। কন্যাই কন্যাযাত্র লইয়া বরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিল। এই নূতনতর বিবাহের ফল শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করবিজয়োক্তবংশাবলীর কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

গোবিন্দ ভগবৎপাদের নিকট শঙ্করাচার্য্য বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পঞ্চম বৎসরে বিদ্যারম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন। গুরুর আজ্ঞা লইয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ব্রহ্মাসনে উপবেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা অদ্বৈত মত। চৈতন্য একমাত্র, সমস্ত জড়পদার্থের পরিচালক বা অধিষ্ঠাতা। অথচ দেখিতেছি সকল মনুষ্যই চৈতন্যবান্ অতএব সকল মনুষ্যের চৈতন্যই এক। অতএব ব্রহ্ম ও আমি এ দুইএ অভেদ। নৈয়ায়িকেরা যে জীবাত্মা বলিয়া এক জাতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন সে টুকু সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, যখন সকল চৈতন্যই এক, তখন এ জীবাত্মগত চৈতন্য, ও পরমাত্মগতচৈতন্য এইরূপ

* আধুনিক পণ্ডিতগণকে এইরূপ পরীক্ষা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে ভাল হয় না? তাহা হইলে অনেক কুতর্ক মিটিয়া যায়। বং সং।

প্রভেদই হইতে পারে। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশ ও বাক্সমধ্যবর্ত্তী আকাশ এ দুইয়ে অভেদ আছে এইরূপ। কিন্তু জীব স্বতন্ত্র পদার্থ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা কদাপি সম্ভব নহে।

শঙ্করের পিতা শিবগুরু অনেক চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই কিন্তু শঙ্কর প্রথম বয়সেই সন্ন্যাসী হইলেন। সন্ন্যাসী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ব্যাসোক্ত বেদান্ত সূত্রের টীকা করিলেন। তৎপরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

দিগ্বিজয় শব্দে কি বুঝায় প্রাচীনলোক অনেকেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু একালের কেহই বুঝিবেন না। সেকেন্দর তৈমুরলঙ্গ, জঙ্গিস যেমন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এ তেমন দিগ্বিজয় নহে। ইহাতে দিগ্বিজয়ীর সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ হয় না। বরং যাহা থাকে, তাহাও দুরন্ত দায়াদেরা বেদখল করিয়া দেয়। প্রথম দিগ্বিজয়ের অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত, দ্বিতীয়টির অস্ত্র, কণ্ঠনিঃসৃত গালি-বালি-শাণিত উড়িয়াদিগের মত দ্রুত উচ্চারিত বচন পরম্পরা। এরূপ বিদ্যা অস্ত্রে দিগ্বিজয় শুদ্ধ আমাদেরই দেশে ছিল। ইহার আদি জানা যায় না এবং আজিও "আমার ছেলে যেন দিগ্বিজয়ী হয়" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দিবানিশি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। সেকালে যেমন এক নাইট আর এক নাইটের নিকট "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইলে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত; সেইরূপ একজন পণ্ডিত আর একজনের নিকট "বিচার কর" বলিয়া দাঁড়াইলে যদি শেষোক্ত পণ্ডিত ইতস্ততঃ করিতেন, তখনি তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীতে অপদস্থ হইতেন। এইরূপ দিগ্বিজয় বহুকাল প্রচলিত ছিল, আজিও আছে। শঙ্করাচার্য্য সেই দিগ্বিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য।

তিনি চিদম্বরপুর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ, হস্তামলক, বিষ্ণুগুপ্ত, আনন্দগিরি প্রভৃতি শিষ্য সমভিব্যাহারে মধ্যার্জ্জুন নামকস্থানে উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর মধ্যার্জ্জুনেশ্বর শিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্ দ্বৈতবাদ সত্য না অদ্বৈতবাদ সত্য?" শিব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে তিন বার বলিলেন, "সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং!" তত্রত্য লোকদিগকে অদ্বৈত মতে আনিয়া শঙ্কর সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর শৈবদিগের এক প্রধান আড্ডা। সাত প্রকারের শিবোপাসক তাঁহার সহিত বিচারার্থ উপস্থিত হইল। শঙ্কর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক অনন্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তশয়ন বৈষ্ণবদিগের কেন্দ্রস্থান। সেখানে ছয়প্রকারের বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহারাও হারি-মানিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল।

তাহাব পব একদল কর্ম্মহীন বৈষ্ণবকে স্বীয়ধর্ম্ম গ্রহণ কবাইয়া পনব দিন পশ্চিমাভিমুখে গমন কবিলেন। সুব্রাহ্মণ্য স্থানে কুমাবধাবা নামক নদীতটে তাঁহাব বাসা হইল। সেখানে হিরণ্যগর্ভ অগ্নি ও সূর্য্য উপাসকদিগের সহিত তাঁহাব ঘোবতর বিচাব হয়। এই সময়ে শঙ্কবাচার্য্যের তিন সহস্র শিষ্য। শঙ্খ-ঘণ্টা করতালাদি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পবিপূর্ণ কবিয়া চামবাদি দ্বাবা গুরুদেবকে ব্যজন কবিতে করিতে শিষ্যগণ ক্রমাগত বায়ুকোণে যাত্রা করিতে লাগিল। কৌমুদী নদীতীববর্ত্তী গণেশের মন্দিরে তাহাবা এক মাস বিশ্রাম করে। এই সময়েই পদ্মপাদাদি পাঁচ জন প্রধান শিষ্য দিগ্‌গজ বলিয়া অভিহিত হন এবং এই খানে সকলে মিলিয়া মহাসমাবোহে গুরুব স্তুতি করেন। ছয় প্রকাব গণপতি উপাসক এইখানে স্বীয়ধর্ম্ম ত্যাগ কবিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করে। এখান হইতে ভবানীনগরে পৌঁছিয়া শঙ্কবাচার্য্য দুর্গা,লক্ষ্মী,শারদা উপাসক ও কতকগুলি বামাচারী শাক্তকে শিষ্য কবিয়া লয়েন। বামাচারীদিগের বাস ঠিক্ ভবানীনগর নহে,তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়াছিল।

ভবানীনগর হইতে শঙ্কবাচার্য্য উজ্জয়িনীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহুসংখ্যক কাপালিক ভৈরবোপাসক আসিয়া আচার্য্যকে কহিল, "তুমি অতি সৎপাত্র, কাপালিক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি কেন সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াও।" আচার্য্য কহিলেন, "পাজী মাতাল লম্পট তোর আবার ধর্ম্ম? আজ তোকে মারিয়াই ফেলিব।" বলিয়াই মাব। কাপালিক গুরু মারি খাইয়া তিনবার হুঁ হুঁ হুঁ করিয়া শব্দ করিল, অমনি খড়্গ-কপাল-ঘণ্টা শূলপাণি দিগম্বব সংহাব ভৈবব উপস্থিত। ভৈবব শঙ্কবকে প্রণাম করিয়া কাপালিকগণকে শঙ্করের শিষ্য হইতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ইহার পব উন্মত্ত ভৈরব সংবাদ (বঙ্গ ৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৪৩) ও চার্ব্বাক এবং সৌগত,কাল,জৈন,বৌদ্ধ মত নিবাকরণ। এই বৌদ্ধ মত প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে অনেক ভিন্ন। (২৮ অধ্যায় শং বিং) উজ্জয়িনী পবিত্যাগ কবিয়া আচার্য্য অনুমল্ল, মরুন্ধ, মাগধ, ইন্দ্রপ্রস্থ, যমপ্রস্থপুরে গমন করত মল্লারিমত, বিষ্যক্‌সেনমত, মন্মথমত, কুবেরমত, ইন্দ্রমত, যমমত নিবাকবণ করতঃ গঙ্গাযমুনামধ্যবর্ত্তী প্রয়াগনগরে উপস্থিত হইয়া বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, উপাসকদিগকে স্বদলাক্রান্ত কবিয়া লইলেন। প্রয়াগে একজন শূন্যবাদী আসিয়া বলিল, "স্বামিন্ এ সকলি ফাক, সবই শূন্য, আমার নাম নিরালম্ব, পিতার নাম কল্পিতরূপ,মাতার নাম নির্ভরিতা। সবই শূন্য,ব্রহ্মও নাই।" আচার্য্য ইহাকেও নিজমতে আনয়ন করিলেন। প্রয়াগে বরাহমত, লোকমত, গুণমত, সাংখ্যমত, যোগমত এবং কাশীতে পীলুমত, কর্ম্মমত, চন্দ্রমত, গ্রহমত, কালব্রহ্ম

বাদী ক্ষপণকমত, পিতৃমত, শেষ ও গরুড় মত, সিদ্ধমত, গন্ধর্ব্বমত, তালবেতালমত খণ্ডন করেন। কাশীতে একদিন ভগবান্ মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া নিদিধ্যাসন করিতেছেন; এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি না ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছ? বল দেখি কোথায় অর্থ করিতে তোমায় বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে?" শঙ্কর বলিলেন "তুমি কোথায় ঠেকিয়াছ বল আমি অর্থ করিয়া দিই।" বৃদ্ধ বলিল "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং" এই সূত্রের অর্থ কি? দুই জনে দুইপ্রকার অর্থ করিলেন। কেহই ছাড়িবার পাত্র নহেন। এক কথায় দুই কথায় দুইজনেই মহাগরম। শঙ্করাচার্য্য বৃদ্ধের গালে এক চড়। চড় মারিয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন "বুড়াটার পাদুটা উপরপানে করিয়া ঝুলাইয়া দূর করিয়া দিয়া আইস।" বৃদ্ধ বেগতিক দেখিয়া আপনা হইতেই সরিয়া গেল। তখন পদ্মপাদ আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া কহিলেন।

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎব্যাসো নারায়ণঃস্বয়ং।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিংকরঃ কিংকরোম্যহং॥

তখন শঙ্কর অনেক করিয়া ব্যাসকে ফিরাইলেন। তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্যাস অদ্বৈত বাদের সর্ব্বত্র জয় হইবে ও ১৬ বর্ষ পরমায়ু হইবে বলিয়া শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, কেদার লিঙ্গ নামক শিবদর্শন করিয়া শঙ্কর কুরুক্ষেত্র দিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শীতজলে স্নান করায় আচার্য্যের বড় কষ্ট হয়, এই জন্য নারায়ণ তাঁহার জন্য উষ্ণজলের নদী সেইখান দিয়া প্রবাহিত করিয়া দেন। তাহার পর আচার্য্য অযোধ্যা, গয়া, দ্বারিকা, জগন্নাথ ভ্রমণ করিলেন। রুদ্রাখ্যপুরে ভট্টাচার্য্য নামক এক জন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সে ব্রাহ্মণ উত্তর দেশ হইতে রুদ্রাখ্যপুর অঞ্চলে আসিয়া বৌদ্ধদিগকে জয় করেন। তিনি তাহাদের শিরচ্ছেদ করেন এবং অনেককে উদূখলে চূর্ণ করেন। শেষ জৈনাচার্য্যের নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ হওয়াতে মনে করিলেন "কি সর্ব্বনাশ জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে ত আমি গুরু বধ করিয়াছি।" এই ভাবিয়া বিজন প্রদেশে হোমাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। জানু পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিচারার্থ ভট্টাচার্য্যকে আহ্বান করিলেন। ভট্টাচার্য্য কতকগুলি গালি দিয়া বলিলেন "যদি এত কণ্ডূয়ন বাসনা হইয়া থাকে, আমার ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও। আমি মরিলাম, এই বলিয়া তিনি গতাসু হইলেন।"

মণ্ডনমিশ্র কর্ম্মকাণ্ডে অতি স্বদক্ষ।

তিনি জ্ঞানকাণ্ডাবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেষী। নিবাস হস্তিনাপুর হইতে অগ্নি কোণে, বিজিলবিন্দু নামক বিদ্যালয়ের অতি নিকটে, একটি বিস্তৃত তালবনে। তিনি এই সময়ে পুরদ্বার রোধ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে ছিলেন। স্বয়ং ব্যাস নারায়ণ মন্ত্রবলে আহূত হইয়া তথায় রহিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্রের অধ্যাপনার এমনি আশ্চর্য্য গুণ, যে, তাঁহার দাস দাসী সারিশুক পর্য্যন্ত বড় বড় সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারে।

শঙ্কর পুরদ্বার বদ্ধ দেখিয়া যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়াই মিশ্রঠাকুর চটিয়া লাল। ক্ষণেক বচসার পর ব্যাসের কথায় বন্দোবস্ত হইল,যে,আহারান্তে বিচার আরম্ভ হইবে, যিনি হারিবেন তিনি জেতার মত অব লম্বন করিবেন। সারসবাণী—মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী– মধ্যস্থ থাকিবেন। প্রত্যহ মিশ্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন কত দূর। শত দিন বিচার। শত দিনের দিন সারসবাণী বলিলেন, নাথ, চল ভিক্ষা করি গিয়া। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্ন্যাসী হইলেন। পতিব্রতা সারসবাণী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্ব্বেই স্বামী জীবিত থাকিতে বিধবা হইতে হইল, দেখিয়া আকাশপথে ব্রহ্মলোক অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, সারসবাণী যাও কোথা, আমার কাছে তোমারও পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। সারসবাণী তথাস্তু বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্র আলাপ আরম্ভ করিলেন। শঙ্করের চক্ষুঃস্থির। শঙ্করাচার্য্য একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "মাতঃ আপনি ছয়মাস এই ভাবে থাকুন আমি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসি।" এই বলিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষার্থ বহির্গত হইলে। যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইতেছে। অমনি মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে রাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বদেহ রক্ষার্থ চারিজন শিষ্যকে নিযুক্তকরিয়া গেলেন। রাজদেহমধ্যবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য রাণীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। কিন্তু রাণী অতি চতুরা, রাজার আচার ব্যবহার তাঁহার কাছে ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কেমন একটুকু সন্দেহ হইল। তিনি হুকুম দিলেন "নিকটে কোথায় মৃতদেহ আছে খুঁজিয়া দাহ কর।" কর্ম্মচারীরা শঙ্করের দেহ দাহ করিতেছে। চিতা ধূধূ করিয়া জলিতেছে এমন সময়ে শঙ্কর রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ স্বদেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চিতাহইতে লাফাইয়া পড়িলেন। নৃসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাঁহার আরোগ্য সাধন করিলেন। শঙ্কর ত্বরান্বিত হইয়া সারসবাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সারসবাণী দেখিলেন অশ্লীল আলাপ হইবার সম্ভাবনা। আপনিই বলিলেন আমি পরাস্ত হইয়াছি।

এই বলিয়াই সারসবাণী ব্রহ্মলোক

শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করাচার্য্য যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সারসবাণী স্বয়ং ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। শঙ্কর সরস্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। শৃঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে। সেখানে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলিলেন, তুমি এইখানে চিরকাল স্থির থাক। শৃঙ্গগিরিস্থ শিষ্যমণ্ডলীর নাম হইল ভারতীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে মূর্খ লোক ছিল না এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। কিন্তু এক্ষণকার ভারতীদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, অনেকে ভারতী লিখিতে ভারথি লিখিয়া থাকেন।

বিদ্যামঠে অনেক দিন বাস করিয়া পরমগুরু সুরেশ্বর নামে একজন শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভার দিয়া আবার স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। অহোবল নামক স্থানস্থিত নৃসিংহ উপাসকদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়া বৈকল্যগিরি পার হইয়া কাঞ্চী নগরে উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চীনগরে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের নিকটে আচার্য্য শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামক নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করিলেন এবং উপাসকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন। কাঞ্চীনগর ত্যাগ করিয়া বহুকাল গুহাবাসিনী বিদ্যাকামাক্ষী নাম্নী রুদ্রশক্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। নগর নির্ম্মাণের পর শ্রীচক্রনির্ম্মাণ। তান্ত্রিকদিগের নিকট চক্র অতি আদরণীয়। শ্রীচক্র নয়টি ক্ষেত্রে নির্ম্মিত। ত্রিকোণ চতুষ্কোণ অষ্টকোণ দশকোণ বিন্দু ইত্যাদি। বেদান্তিকেরা মনে করেন, এই নবটী ক্ষেত্র প্রকারবিশেষে সংস্থাপন করিলে হরগৌরীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়। শ্রীচক্রনির্ম্মাণের পর মোক্ষধর্ম্মোপদেশ।

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শঙ্করাচার্য্যের মতই সর্ব্বত্র চলিত থাকিবে, কিন্তু অল্পদিনেই জানা গেল যে লোকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। আবার অনেকেই পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের মনে বড়ই আশঙ্কা হইল আবার বুঝি নানা অসৎ মতের প্রাবল্য হয়। তিনি নিজশিষ্য পরমত কালানলকে ডাকিয়া কহিলেন,"কলিতে লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই আমার অদ্বৈত মত কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই, অতএব তুমি অদ্বৈত ধর্ম্মের অবিরোধে শৈব মত প্রচার করত দিগ্বিজয় কর।" পরমত কালানল তাহাই করিলেন, এইরূপে আবার শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের সঙ্গে যোগ হইয়া চলিত হইল, এবং এই ভাবেই আজিও চলিয়া আসিতেছে।

কাঞ্চীনগরেই শঙ্করাচার্য্য অলীক দেহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময়ে

বিলীন হন। শিষ্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি করিল।

এতদূরে শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত শেষ হইল। শঙ্করদিগ্বিজয়ের সঙ্গে উপযুক্ত জীবনী অনেক স্থানে মিলিবে না। না মিলিলেও এইটুকু পড়িয়াই বুঝা যাইবে যে শঙ্করাচার্য্য কি প্রকারের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনীর সার এই, তিনি একজন অতি বড়, ভট্টাচার্য্য ও একজন প্রধান মোহন্ত এই দুইয়ের সমষ্টি।

শৈশবসহচরী।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি তবে কে? বিনোদিনী?"

যখন বিবাহ রাত্রে বিনোদিনী বিধুর সঙ্গে এয়ো ডাকিতে খিড়কির দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন সেইখানে রতিকান্ত প্রেরিত নৃশংসেরা অপেক্ষা করিতেছিল। বিধুকে এবং তার সঙ্গে একটী যুবতীকে দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হইল এবং বলপূর্ব্বক বিনোদিনীর মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। বিনোদিনী প্রথমতঃ অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন; যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন এক নিবিড় বনমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া ছুটিতেছে। বিনোদিনীর প্রথমতঃ মনোমধ্যে ভয় সঞ্চার হইল, এবং দুষ্টেরা কি অভিপ্রায়ে এবং কোথায় তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই ব্যক্তি কানন মধ্যে এক মন্দিরের নিকট তাঁহাকে নামাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল। বিনোদিনী দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মধ্যস্থলে পাষাণময়ী এক কালী মূর্ত্তি, তৎসম্মুখে পিত্তলের ছেপায়ায় একটি শালগ্রামশিলা, তাঁহার সম্মুখে দুইখানি আসন, এবং তাহার পার্শ্বে একস্থানে একটি তাম্রপাত্রে কতক গুলি ফুল ও চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে ও মন্দিরের এক পার্শ্বে দুই তিন ব্যক্তি বসিয়া আছে। তন্মধ্যে একজন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে, ভূমিতে দৃষ্টি করিতে করিতে কতক কথা বলিতে পারিল কতক পারিল না। তাহার মর্ম্ম এই যে "তোমায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনাতে তুমি রাগ করিও না। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী না হইলে আমার এ জীবন বৃথা, এবং সেই জন্য তোমায় ধরিয়া আনিয়াছি। সে জন্য তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে,

কিন্তু এক্ষণে ক্ষমা কর—তোমার দাস আমি, আমার বিয়ে কর। এ জীবন তোমায় দিলাম।" বিনোদিনী আস্তে আস্তে বক্তার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, বক্তা শরৎকুমার। ভাবিলেন শরৎকুমার কবে পাগল হল—কই আমি ত শুনি নাই—বোধ হয় অনেক দিন হইতে সূচনা হইয়াছে—যখন বিষয় দান করিয়াছিল বোধ হয় সেই সময় হইতে। বিনোদিনীর মনে মনে বড় দুঃখ হইল, ভাবিলেন ইহাকে কোন কৌশলে বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "আচ্ছা তোমার জীবন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু বাড়ী গিয়া গ্রহণ করিব। এখানে গ্রহণ করিতে পারিব না, এস বাড়ী যাই।"

শ। বাড়ী গেলে কি আমার সহিত তোমার বিয়ে দিবে? আজ যে তোমার অন্যের সহিত বিয়ে হবে।

বি। সে আমার দিদির—কুমুদিনীর বিয়ে। এতক্ষণ হয় ত হয়ে গেছে।

এই কথায় শরৎকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন,

"তুমি তবে কে? বিনোদিনী?"

বিনোদিনী বলিল, "হাঁ আমি বিনোদিনী। চিনিতে পারিতেছ না কি?"

বিনোদিনী তখন বুঝিল তাঁহাকে কুমুদিনী ভাবিয়া শরৎকুমার কথা কহিতেছিল—কেন না কুমুদিনীরই আজ বিয়ে। কুমুদিনীতে শরৎকুমার যে অতিশয় অনুরক্ত বিনোদিনী তখন এই পর্য্যন্ত বুঝিল, এবং তাঁহাকে কুমুদিনী ভাবিয়াই শরৎকুমার বিবাহ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু আর কিছুই ত বুঝিতে পারিল না। বলিল,

"তোমার পাগলামি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি বিনোদিনীকে কুমুদিনী ভাবিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছ, এইটুকু বুঝিতেছি। কিন্তু দিদিকে আজ তুমি ত ঘরে বসিয়া পাইতে। কোথায় বর সাজিয়া আমাদের বাড়ী গিয়া বিবাহ করিবে—না কোথায় ডাকাতি করিয়া আমাকে ধরিয়া আনিলে?"

শ। আমি তোমাকে ধরিতে পাঠাই নাই, কুমুদিনীকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম।

বি। তাই বা কেন? সেও ত তোমারই জন্য ছিল। ধড় পাকড় টানাটানি কেন।

শরৎকুমার অতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "সে যদি আমারই জন্য থাকিত তা হলে আমার এ অধঃপতন কেন?"

যে স্বরে শরৎকুমার এই কথা বলিলেন তাহাতে বিনোদিনীর অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল। বলিলেন, "তোমার অধঃপতন যে হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তুমি যে ঘরে বসে দিদিকে পাইতে না তাহা বুঝিতেছি না।"

শরৎকুমার উত্তর করিলেন না। অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে হঠাৎ বলিলেন,

"বিনোদিনি, তোমার ভগিনীর মন কখন তুমি জানিতে পারিয়াছ?"

বি। পেরেছি—কেন?

শ। বল দেখি তবে কুমুদিনী কাহাকে বিবাহ করিলে সুখী হইবে?

বি। রজনীকান্তকে।

শ। সেই রজনীকান্ত আজ তাহাকে ঘরে বসে পাবে অথবা এতক্ষণ পাই য়াছে—আমি ত নয়।

এবার বিনোদিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে বিনোদিনী বলিল,

"এখন আপনার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। আমায় আর আবশ্যক কি? আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দিন।"

শ। চল। আমার সহিত একা এই রাত্রিকালে যাইতে সঙ্কোচ করিবে না?

সরলা বিনোদিনী উত্তর করিল,

"কেন? কি জন্য?"

শরৎ বলিল "তবে চল।" এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বন-মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দাড়াইতে বলিল। উভয়ে দাড়াইলেন, এবং দেখিলেন যে রতিকান্ত অতি দ্রুতপদে তাহাদিগের দিকে আসিতেছে, নিকটবর্ত্তী হইয়া শরৎকে বলিল "ভাই তোমার মনস্কা-মনা সিদ্ধ হইয়াছে এখন আমার মন স্কামনা সিদ্ধ কর।"

শ। আমার মনস্কামনা কি প্রকারে সিদ্ধ হইল।

রতিকান্ত ভ্রূভঙ্গি করিয়া চক্ষু রাঙ্গা-ইয়া বলিল,

"আমার সহিত অসৎ ব্যবহার করি-বেন না। আমি উহার প্রতিশোধ করিতে জানি।"

শ। আমি ত কোন অসৎ ব্যবহার করি নাই—

রতিকান্ত অতিবেগে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল "তোমার সহিত কি কথা ছিল? কুমুদিনীকে ধরে এনে দিলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ তুমি তোমার সমু দায় বিষয় আমাকে দান করিবে। কই দানপত্র কৈ?" এই বলিয়া দানপত্র তাহার বসনের ভিতরে বলপূর্ব্বক খুঁজিতে লাগিল, ইত্যবসরে শরৎকুমারের বসন-চ্যুত হইয়া একখানি কাগজ পড়িল। রতিকান্ত কি শরৎকুমার তাহা দেখিতে পাইল না। বিনোদিনী তাহা দেখিতে পাইয়া পদ দ্বারা চাপিয়া দাড়াইয়া রহি-লেন। রতিকান্ত ও শরৎকুমার উভয়ে ক্রোধে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত বলপূর্ব্বক দানপত্র কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত, শরৎকুমার উহা নিবারণ করিতে চেষ্টিত। বিনো-দিনী এই অবকাশে কাগজ খানি যত্নে অঞ্চলে বাঁধিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দ্রুত আসিয়া রতিকান্ত ও শরৎকুমারকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিনো-

দিনি কোথায় ?" রতিকান্ত এবং শরৎ-কুমার আগন্তুককে রজনীকান্ত বলিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগের চির-শত্রু বিবেচনায় অতি বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রজনীকান্ত কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু শত্রুদিগের অপেক্ষা আপনাকে হীনবল দেখিয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু দূর আসিতে লাগিলেন,পশ্চাতে এক বৃহৎ গহ্বর ছিল তাহাতে ভগ্ন মন্দিরের ইট ও বন্যলতা ও কাঁটা ছিল, অন্ধকারে পশ্চাৎ হটিতে হটিতে ঐ গহ্বর মধ্যে পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন হইলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"আর একবার এসো।"

যখন রজনীকান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন যে তিনি একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কুটীরে একখানি জীর্ণ তক্ত-পোষে শয়ন করিয়া আছেন। পূর্ব্ব-দিকের গবাক্ষ দিয়া উষার মুকুটজ্যো-তিতে কুটীরের অন্ধকার অপেক্ষাকৃত অপনীত হইয়াছে, মন্দান্দোলিত বৃক্ষ শাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে,পশ্চিম দিকের গবাক্ষও মুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্য দিয়া এক বিস্তীর্ণ বহুজলপূর্ণ বিল দেখা যাইতেছে; জলচর বিহঙ্গমকুল নিঃ-শব্দে তাহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে। উষার সুমন্দ বায়ু সরসীরুহগণকে দো-লাইয়া এবং বিস্তৃত তড়াগবক্ষে অস্ফুট অসংখ্য বীচিমালা প্রক্ষিপ্ত করিয়া গবাক্ষ দিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কুটীর মধ্যে নিঃশব্দ; যেন কেহ নাই। কেবল অপর পার্শ্বে একটি ইতর জা-তীয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নিদ্রিত আছে, তাহার নাসিকা গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। রজনী-কান্ত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক তাঁহার শিয়রে নীরবে বসিয়া তাহার অঙ্গের ক্ষত সকলে সাবধানে ঔষধি লেপন করিতেছে। রজনী পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারি-লেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। রমণী রজনীর উদ্যম দেখিয়া অতিমধুর এবং অস্ফুট স্বরে বলিল "স্থির থাক, চঞ্চল হইও না।" কিন্তু রজনী তাহা শুনিল না; সবলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখনি ক্ষত হইতে দর-বিগলিত রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল, এবং ক্রমে চেতনারহিত হইল। সেই দিবস বেলা দুইপ্রহরের সময় রজ-নীর অতিশয় জ্বর হইল, জ্বরে জ্ঞানশূন্য হইলেন,মধ্যে মধ্যে এক একবার চৈতন্য হইতেছে এবং রমণীর প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন "বিনোদিনি! তুমি এখানে কেন? বাড়ী যাও।" এমত অবস্থায় একদিন এক রাত গেল। দ্বিতীয় দিনে অনেক দূর হইতে একটি কবিরাজ আ-সিল। কবিরাজ মহাশয় রজনীর নাড়ী

টিপিবামাত্র মুখ গম্ভীর করিষা এবং দুই ওষ্ঠ লম্বিত করিয়া মাতা নাড়িতে লাগি-লেন। যে রমণী রজনীর শিয়বে বসিয়া অনুদিন তাঁহার সুশ্রূষা করিতে ছিল,তিনি উহা দেখিয়া ভয়সূচক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁগা বড জ্বর কি?" ভিষকের দৃষ্টি ভাল নহে এই জন্য কুটীর প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে ভাল রূপে দেখিতে পায় নাই, এখন ভালরূপে দৃষ্টি কবিতে লাগিল। দেখিল একটি স্ত্রীলোক নীলাম্বরে বালেন্দুব জ্যোতিব ন্যায় কুটীব আলো কবিয়া রহিয়াছে। কবিবাজ মহাশয় সেই ভুবনমোহিনী সুন্দবীকে এক দৃষ্টে দেখি-তে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে তাঁহার ঠোট দুখানি আরও ঝুলিয়া পড়িল,গোল নয়নদ্বয় আরও গোল হইল, দন্ত পাটিদ্বয় পৃথক্‌ হইয়া গেল, এবং মুখগহ্বরের সৌন্দর্য্য নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইল। বমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বড জ্বর কি গা?" ভিষক্‌ উত্তব করিল "হাঁ জ্বব হইয়াছে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দবী চমকিত নেত্রে ভিষকের প্রতি চাহিয়া বহিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভিষক্‌ পুনর্ব্বার বলিল "জ্বর হইয়াছে মাবা যাইবে আমিই মেরে দিব" সুন্দরী অতি কঠিন স্বরে বলিলেন "আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতেছি না।" ভিষক্‌ অতিতীব্র দৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না—কিন্তু যুবতীর বিরক্তিব্যঞ্জক ভঙ্গি দেখিয়া ভীত হইয়া উত্তর করিল "জ্বব হইয়াছে বটে, মারা যাবে, আমিই মেরে দিব।" সুন্দরী কিছু বুঝিতে না পারিয়া কুটীর অধিকারিণী তাহার মাকে কহিলেন "হাঁগা কেমন বৈদ্য আনিলে—কি কথা বলিতেছে।" তারাব মা বলিল "ঠাকুরুণ ভয় পেওনা,যে জ্বর হইযাছে, ও জ্বর মারা যাবে ঐ বদ্দি মেবে দিবে।" যুবতী তখন বুঝিতে পা-রিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। তৎ-পবে কবিরাজ গুটি কতক বড়ি দিয়া গেল। যুবতী সেই বড়ি সেবন করাইতে লাগিলেন; সে ঔষধে কিছু হইল না, জ্বব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবতী তাঁহার অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি তারাব মাব হাতে দিয়া বলিল, এদে-শের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিরাজ, তাহাকে আন। সপ্তম দিবসের প্রাতে সেই কবিরাজ আসিল। আসিয়া,রজনীর নাড়ী টিপিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী ধরিয়া রহিলেন, কবিরাজের মুখ ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, অর্দ্ধঘণ্টা এই প্রকারে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "বিকার সম্পূর্ণ—অদ্য রাত্রে দুই প্রহরে জ্বর ত্যাগের সময় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, যদি সেইসময় সুধরাইয়া যান তবে বাঁচি-লেন—ইতিমধ্যে এই তিনটি বড়ি খাওয়া-ইবেন—ইহাতে রক্ষা হইতে পারে। আমি পুনরায় বৈকালে আসিব।" এই বলিয়া কবিরাজ অন্তর্হিত হইল। কোন প্রকারে সে দিন কাটিল। রজনীকান্ত মধ্যে মধ্যে এক একবার নয়ন উন্মীলিত করিতেছেন

আর যুবতীর প্রতি চাহিতেছেন, যেন কি বলিবেন আর বলিতে পারিতেছেন না। যুবতী আপনার উরুপরে তাঁহার মস্তক রাখিয়া অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করিতেছেন। যখন রজনীকান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার প্রতি চাহিতেছেন, যুবতীর অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এবং কাঁদিয়া উঠিতেছেন। ক্রমে দিনমণি অস্তে গেল—সন্ধ্যা হইল, যুবতীর যদি প্রাণ দিলেও সূর্য্যদেবের গতি রহিত হইত তাহাও তিনি করিতেন—কিন্তু তাহা হইল না—সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন। সেই বিস্তৃত বিলের চতুঃপার্শ্বস্থ বনরাজির অগ্রভাগ সোনার বর্ণে রঞ্জিত হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইল, কোমল নীলাকাশে দুই একটি তারা উঠিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল—কিন্তু রাত্রিকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল—কুটীরাধিকারিণী তারার মা কোন মতেই রাত্রিতে রজনীকান্তকে তাহার কুটীর মধ্যে মরিতে দিবে না। যুবতীকে বলিল "আমি দুঃখীলোক কাট কুড়াইয়া গুজরাণ করি আমার এই এক বৈ দুই কুঁড়ে নাই। এ কুঁড়ের মধ্যে যদি তোমার বাবু মরে তবে আমি কি আর ভূতের দৌরাত্ম্যে বাস করিতে পারবো—" যুবতী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "ওগো আমায় এ বিপদে নিরাশ্রয় করো না, তুমি আজ আমায় যদি আশ্রয় দাও তবে কাল তোমার এ কুঁড়ে কোটা করিয়া দিব।" যুবতীর অঙ্গে আর কোন আভরণ নাই দেখিয়া তারার মা সে কথা বিশ্বাস করিল না। অকাতরে তাহাদের বহিষ্কৃত করিল। তারার মার সাহায্যে যুবতী রজনীকে বুকে করিয়া কুটীরের সন্নিকটে সেই বিস্তৃত অন্ধকারময় বিলের ধারে একটী বৃক্ষমূলে একটী মাদুর পাতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয়ন করাইলেন। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া রজনীর জন্য যে গাত্রবসন কিনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা রজনীর দেহ আবৃত করিয়া তাহার মস্তক নিজক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, নিকটে একটি দীপালোক রাখিলেন। রাত্রি অধিক হইল, আজ রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না, কিন্তু নীলাম্বরে অসংখ্য তারা উঠিল, এবং বিলের স্বচ্ছবারিতে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। তথাচ গাঢ়, অনন্ত সর্ব্বাবরণকারী, অন্ধকারে পৃথিবী আবৃত হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল সেই বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত বিলের জল নক্ষত্রালোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল, আর উহার অপর পার্শ্বে বহুদূরে অন্ধকারময় বনরাজির মধ্য হইতে কোন কুটীরের দীপালোক প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সেই তড়াগকূলে, অন্ধকারে, নিরাশ্রয়ে, যুবতী রজনীকে ক্রোড়ে লইয়া একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেছেন, অবিশ্রান্ত নয়নবারি পড়িতেছে, কত প্রকার রাত্রিচর হিংস্র জন্তু সেই স্থানে আসিতেছে এবং দূর হইতে কত প্রকার ভীষণ রব করিতেছে। বিলের মধ্য এবং চতুষ্পার্শ্ব হইতে

কত প্রকার শব্দ হইতেছে, শিরোপরি বৃক্ষের ডালপালা নড়িতেছে, এবং ক্ষীণ দীপালোকে বৃক্ষতলে নানারঙ্গে খেলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই রমণী ভীতা হইতেছেন না। বিধাতা আজ যে ভয়ে তাঁহাকে ভীতা করিয়াছেন তাঁর কি আর কোন ভয় আছে? রমণী ঘন ঘন নাড়ী টিপিতেছেন, সাত দিন সাত রাত রজনীর নাড়ী টিপিয়া নাড়ী চিনিয়াছিলেন। নাড়ী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। গাত্রে হস্ত দিলেন, দেখিলেন, অনবরত ঘামিতেছে, কবিরাজ এক প্রকার ইংরেজি আরোক সেই সময়ে খাওয়াইতে দিয়া গিয়াছিল, তাহা খাওয়াইলেন, আবার গায়ে হাত দিলেন। অবিশ্রান্ত ঘামিতেছে, রমণী ভাবিলেন আর কি? সময় উপস্থিত—কত রাত্রি হইয়াছে? একবার আকাশ পানে চাহিলেন। আজ আকাশে চাঁদ উঠে নাই—চারিদিক্ অন্ধকার—অন্ধকারে ভীমতরু সকল যেন যমদূতের ন্যায় রজনীকে রমণীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইবার মানসে দাঁড়াইয়া আছে। রমণী রজনীকে হৃদয়ে টিপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আজ হইতে আকাশে আর চাঁদ উঠিবে না—আর চাঁদ উঠিবে না, আর তারা জ্বলিবে না,—কেবল, অন্ধকার — অন্ধকার —অন্ধকার—চিরকাল অন্ধকার—হাঁ মা—অন্ধকারে কি মানুষ থাক্‌তে পারে? বলিতে বলিতে তাহার আর্ত্তনাদ বন্ধ হইল, রজনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে পাশ ফিরিলেন, এবং রমণীর হস্ত ধরিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন "বিনোদিদি, ভয় কি? আমি মরিব না—আর ভয় নাই—তুমি অমন করে কেঁদো না—বড় তৃষ্ণা—" বিনোদিনী চকের জল মুছিয়া রজনীকে ক্রোড় হইতে উপাধানে রাখিয়া অল্প অল্প করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে লাগিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে রজনী ভালরূপে কথা কহিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিদি, আমরা এখানে কেন?"

বি। তোমার কি কিছু মনে পড়ে না—বিবাহ রাত্রে তুমি যখন সেই বনে পড়িয়া অজ্ঞান হইলে, রতিকান্ত ও শরৎকুমার সেই অবস্থায় তোমাকে এবং সেই সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে এক নৌকায় তুলিল, এবং একখাল দিয়া এই বিলে আসিয়া এই স্থানে উঠিল, এবং আমাদের বরাবর সঙ্গে লইয়া যাইত, কিন্তু উপরে উঠিয়া নিভৃতে শরৎকুমারকে আমি তাহার কৃত দানপত্র তাহাকে দিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলাম এমত সময়ে রতিকান্ত উহা দেখিতে পাইয়া কাড়িয়া লইবার মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে উভয়ে অদৃশ্য হইল, আর আসিল না, আমরা এই কুটীরে আশ্রয় লইলাম।

র। তোমার অলঙ্কারসকল কোথায়? বিনোদিনী কোন উত্তর করিল না—মস্তক নত করিয়া রহিল।

র। বুঝেছি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আমায় বাঁচাইয়াছ।

এই বলিতে বলিতে রজনীর চক্ষে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল। পুনরায় বলিলেন "সুবর্ণপুরে সংবাদ পাঠাও নাই কেন?"

বি। লোক পাই নাই, কুটীরবাসিনী তারার মা অনেক খুঁজিয়াছিল, তবু পায় নাই।

র। এখান হতে সুবর্ণপুর কত দূর?

বি। প্রায় এক দিনের পথ।

র। কাল কবিরাজ আসিবে?

বি। আস্‌বে।

এই কথোপকথনের পর রজনী কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন,

"বিনোদিনি, আমি এখন একটু ঘুমাই তাহাতে ভয় পাইও না। আমি ভাল হইয়াছি।"

এখন রজনী রক্ষা পাইয়াছে। এখন বিনোদিনীর সেরূপ দারুণ মনঃপীড়া নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর এক যন্ত্রণা উপস্থিত—সে যন্ত্রণা লজ্জা—লজ্জা এই যে, রজনীকে মৃতপ্রায় ভাবিয়া কত কথা বলিয়াছেন—কত আদর করিয়াছেন—রজনী ত তাহা শুনিয়াছে—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—লজ্জায় বিনোদিনী রজনীর শিয়র হইতে সরিয়া বসিলেন—লজ্জায় রজনীর নিদ্রিত মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন—আকাশ প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন—দেখিলেন পূর্ব্বদিকে একটি বড় উজ্জ্বল তারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—ভাবিলেন শুকতারা উঠিয়াছে—আর রাত নাই—এখনি ফরসা হবে, তিনি কেমন করে রজনীকে মুখ দেখাইবেন? কিঞ্চিৎ বিলম্বে পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল, বিহঙ্গমকুল কলরব করিয়া উঠিল, বিলের বক্ষ হইতে অন্ধকার অন্তর্হিত হইল, দূরপ্রান্তে বনরাজি সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হইতে লাগিল, রজনীকান্তের নিদ্রা ভাঙ্গিল, তারার মা কুটীরের আগড় খুলিয়া তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল, এবং পুনরায় কুটীরমধ্যে যাইতে অনুরোধ করিল। অনুরোধের আবশ্যক ছিল না, আগড় খুলিবামাত্র বিনোদিনী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষে বিছানা করিলেন, এবং পরক্ষণেই রজনীকান্তকে সেইখানে লইয়া শয়ন করাইলেন। বেলা হইলে কবিরাজ আসিল, কবিরাজ রজনীকে বলিল আপনি নির্ব্যাধি হইয়াছেন। রজনী তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে সুবর্ণপুরে ত্বরায় তাঁহার অবস্থার সংবাদ পাঠান। কবিরাজ আগামী কল্যই সংবাদ পাঠাইবেন, স্বীকার করিয়া গেলেন। রজনী দিন দিন, আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ কুটীর মধ্যে থাকিতেন। একাকী থাকিতেন। বিনোদিনী আর তাঁহার শিয়রে বসিয়া থাকিত না। বিনোদিনীকে এক্ষণে দিনান্তে দুই তিনবার মাত্র দেখিতে পাইতেন। পথ্য দিবার সময়ে, এবং ঔষধি দিবার সময়ে। বিনোদিনী লজ্জায়

আর তাঁহার নিকট আসিত না, সেই বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া আপনার চিন্তায় একাকিনী দিন যাপন করিত। বিনোদিনীর আর সে কেশবিন্যাস নাই, তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সকল গণ্ডদেশে পড়িয়াছে. সে কর্ণাভরণ নাই, কর্ণাভরণ কি কোন আভরণ নাই. বিধবার ন্যায় অলঙ্কার হীন—অতিদীন দুঃখীর ন্যায় পরিধানে মলিন এবং জীর্ণ বসন। আরোগ্য লাভের পর এই রূপ দুই তিন দিন গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় হরি নাথ বাবু অনেক দাসদাসী দুই তিনখান পাল্কি সহিত আসিলেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা সুবর্ণপুর যাত্রা করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে রজনী পূর্ব্ববৎ সবল হইয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার মনন করিলেন। এক দিন অতি প্রত্যূষে রজনীকান্তের নৌকা বসুন্ধরার ঘাটে লাগিল, তাহাতে দাসদাসী জিনিষ পত্র সকল উঠিল, কেবল কুমুদিনী ও রজনীকান্ত উঠে নাই। কুমুদিনী সকলের নিকট বিদায় হইয়া বিনোদিনীর নিকট গেলেন। ভগিনীদ্বয় গলা ধরাধরি করিয়া অনেক কাঁদিল, বিনোদিনী ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ খিড়কিদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। তৎপরে কুমুদিনী স্ত্রীলোকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে রজনীকান্ত বিদায় লইবার মানসে বিনোদিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে রজনী নৌকায় আসিলেন, দেখিলেন, স্ত্রীলোকগণ কুমুদিনীকে নৌকায় তুলিয়া দিতে আসিয়াছে। তন্মধ্যে বিনোদিনী নাই। নীরবে নৌকায় বসিয়া হরিনাথ বাবুর সৌধমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। হঠাৎ মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। দেখিলেন, সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর একটি স্ত্রীলোক আকাশপটে চিত্রবৎ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দেখিতেছে। রজনী অমনি নৌকা ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলেন, এবং মুহূর্ত্তেক মধ্যে সেই ছাদে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদিনী আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। বিনোদিনী পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, রজনীকান্ত। অমনি চক্ষু [illegible] আবরণ করিয়া আধ ঘোমটা [illegible] নলেন, এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। সফল হইলেন না। গিরিচ্যুত নির্ঝরিণীর রুদ্ধ বেগের ন্যায় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রন্দন উছলিয়া উঠিল। ঘোমটা টানিয়া কুলবধূর ন্যায় মুখাবরণ করিয়া রজনীকান্তের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া রজনীকান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন. নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর রজনী বলিল "বিনোদিনি, অনেক দিন আর দেখা হবে না, যাবার সময় আমার সঙ্গে একটা কথা কও।" বিনোদিনী উত্তরে কেবল মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিম্ন হইতে এক জন চেঁচাইয়া বলিল, "রজনী বাবু শিগ্‌গির এস; বার বেলা হলো।" পুনঃপুনঃ সেই ব্যক্তি ডাকাতে রজনী বলিল "তবে আমি এখন যাই, তুমি ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না।" এই বলিয়া সেইস্থান হইতে রজনী চলিলেন। সিঁড়ির নিকট আসিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দিকে আসিতেছেন, যেন কি বলিবেন। রজনী দাঁড়াইল। বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার এস।"

রজনী। এলে তুমিত আমার সঙ্গে দেখাও করিবেনা, কথাও কহিবে না। এসে কি কর্‌বো?

বালিকাস্বভাব বিনোদিনী গদ্‌গদস্বরে বলিল "কথা কব, তুমি আর একবার এস।"

রজনী তদ্রূপ স্বরে উত্তর করিল, "তবে আস্‌বো।" এই বলিয়া দ্রুত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নৌকায় কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল "অত অন্যমনস্ক কেন? রজনী কহিলেন "জানি না।"

একচত্ত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

"মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?"

"কই আমার মালা কই? আমার মালা? আমি যে কত দুঃখে গাঁথিলাম—আমি যে কত কষ্টে ফুল তুলিলাম—কত যত্নে একটি একটি করিয়া গাঁথিলাম—তাঁকে পরাইব বলে—কই আমার মালা—হাঁ মা—আমার মালা কি হলো?"

গভীর যামিনীতে হরিনাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত কক্ষে ষোড়শবর্ষীয়া একটি যুবতী, অতিশীর্ণ, অতিমলিন, শয্যায় মিশাইয়া জ্বরে এপাশ ও পাশ করিতেছে আর অতি মৃদু অথচ মধুরস্বরে প্রলাপ বাক্য বলিতেছে।

"হাঁ মা—আমার মালা?"

নিকটে একটী দীপ জ্বলিতেছে আর শয্যোপরে একটী অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে আর এক একবার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে।

"হাঁ মা—আমার মালা কি হলো?"

অর্দ্ধবয়সী বলিল, "বিনোদিনি, কেন মা—এত বকিতেছ?" আবার কক্ষ নিস্তব্ধ হইল—বিনোদিনী চেতনরহিত হইলেন।

রজনীকান্তকে বিদায় দিয়া অবধি বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, প্রবল ঝটিকাপীড়িত অপরিস্ফুটিত গোলাপ কুসুমের ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগিলেন, সে রূপ, সে যৌবন, সে লাবণ্য, সে বসন্ত-পবন-মেঘ-খণ্ডবৎ গতি, সে সহৃদয়তা, সে উল্লাস সকলই লোপ হইল, কেবল সেই মাধুর্য্য, সেই ভুবনমোহিনী হাঁসি ছিল। বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ এবং শীর্ণ হইতে লাগিলেন, চতুর্থ মাসে শয্যাশায়ী হইলেন। কাস, এবং

তৎসহিত জ্বর, এই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। অনেক ভাল ভাল চিকিৎসক দেখিল, কিন্তু সকলে একবাক্যে বলিল "শিবের অসাধ্য—রক্ষা নাই।"

অদ্য রাত্রিতে বিনোদিনীর বড় জ্বর—এ পাশ ও পাশ করিতেছেন আরও এলোমেলো বকিতেছেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ—থাকিয়া আবার বলিলেন—"আর এক বার এস, আমার মরবার আগে আর একবার এস—কথা কব—দেখা দিব—আমি কি আগে কথা কইতাম না? দেখা দিতাম না? কিন্তু এখন—এখন যে বড় লজ্জা করে—লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিব—আর কথা কইতে পারবো না।"

বিনোদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"কি বলিতেছ মা—কেন অত বকিতেছ, স্থির হও।"

বিনোদিনী আবার চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপে সে রাত কাটিল। পর দিবস প্রাতে জ্বরবিচ্ছেদ হইল। হর্ম্ম্যতলে অনেক গুলিন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, শয্যোপরে বিনোদিনীর মাতা বসিয়া আছে, বিছানায় বিনোদিনীর নিকটে একটী পাত্রে স্তূপাকার ফুল রহিয়াছে, গোলাপ, বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, চামেলি নানাপ্রকার ফুল রহিয়াছে—যেন তাহারা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রিয়সখী বিনোদিনীকে দেখিতে আসিয়াছে, বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে সে কুসুমস্তূপ-পংক্তি চাহিতেছেন, এক একটি করিয়া পৃথক্ করিতেছেন, তৎপরে সূঁচ সুতা লইয়া শয়নাবস্থাতেই মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারিটি ফুল গাঁথিয়া আর পারিলেন না। হাত কাঁপিতে লাগিল, শরীর ঘামিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার অপরাজিতা—তাঁহার সমবয়স্কা এক যুবতী—আসিয়া তাঁহার নিকট বসিল, এবং বিনোদিনীর আদেশানুসারে সেই মালা গাঁথিল। মালা ছড়াটি বিনোদিনী কখন তাহার গলদেশে, কখন হৃদয়ে, কখন নাসিকারন্ধ্রের নিকট রাখিতে লাগিল। সেই সদ্যগ্রথিত পুষ্পমালা স্পর্শ করিয়া, তাহার ঘ্রাণ লইয়া বিনোদিনী অনেক দিনের পর সুখানুভব করিলেন, মনে মনে আশার উদ্দীপন হইল, ভাবিলেন "আমি মরিব না—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে এ অল্পবয়সে মরবো।" আবার ভাবিলেন, "না—কতটী ত না ফুটিতে ফুটিতেই গাছ থেকে শুকাইয়া যায়—আমিও ফুটিতে পাইলাম না।" আবার ভাবিলেন "কোন কোন ফুল তো শুকাইতে শুকাইতে আবার পরিস্ফুটিত হয়—কিন্তু তাহারা যে বাঁচে সে তাহাদের কোন ভালবাসার লোকের আদরে, যত্নে বাঁচে—আমায় কে বাঁচাবে? আমায় কে আদর করিবে? আর কাহার আদরেই বা বাঁচিব?—যে আমায় বাঁচাইতে পারে তিনি দেশান্তর—তিনি কি আমার পীড়া শুনিয়া দুঃখিত? কখন না? যদিই দুঃখিত হয়ে থাকেন—

আচ্ছা—কুলীনের দুই মেয়ের কি এক বরের সহিত বিয়ে হয় না? হয় বই কি—কত। আচ্ছা আমার কি—"চক্ষু মুদিলেন। যে সুখ সকলের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটে, তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সেই আক্ষেপে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন। বেলা হইলে স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া গেল কেবল তাঁহার মাতা তাঁহার নিকট রহিল। বিনোদিনী বলিলেন "মা সংবাদ পাঠাইয়াছ?" তাঁহার মাতা উত্তর করিল,

"কোথায় পাঠাব মা?"

বি। বজ—দিদির কাছে।

মা। পাঠাইয়াছি।

বি। মা—কবিরাজের কথা মত আমি আর কত দিন পরমায়ু বাঁচিব।

তাহার মাতা কাঁদিয়া উত্তর করিল "কেন মা—অমনকথা কহিতেছ? বালাই, বালাই—বাঁচিবে বই কি—কি হই য়াছে যে মরবে—"

বিনোদিনী আবার সেই ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া তাঁহার মাতার গলা জড়াইয়া বলিলেন "বালাই আমি মরব কেন—মা—তুমি কেঁদোনা—মা কেঁদ না।" এই বলিয়া উভয়ে গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নানা প্রকার মানসিক ক্লেশে উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনী মোহ গেলেন। সেইদিন বিনোদিনীর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন।

দুই প্রহরের সময় বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"হ্যাঁ মা, মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?" তাহার প্রসূতি একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, "চুপ কর না মা, তোমার সে সকল কথায় কায কি।"

বিনোদিনী আবার সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,

"বল না মা, তাতে দোষ কি?"

এক বৃদ্ধা রুদ্মাতলে বসিয়া তুলসীর মালা ঘুরাইতেছিল,—বিনোদিনীর মাতাকে চুপি চুপি বলিল, পরকালের কথা কহিতে দোষ কি? তৎপরে বিনোদিনীকে বলিল, "যারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে মরে, তারাই স্বর্গে যায়—আর সেখানে অক্ষয় সুখ পায়।"

বি। আচ্ছা, যাদের আমি বড় ভাল বাসি—দেখিতে বড় সাধ করি, তাহার সঙ্গে কি সেখানে দেখা হয়?

প্রাচীনা। হয়।

বিনোদিনী ভাবিতে লাগিলেন, "তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—হে পরমেশ্বর তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—তা হলে তাঁর সহিত আমার দেখা হবে—চিরকাল দেখা হবে।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হ্যাঁ মা, সেখানে কি চিরকাল দেখা হয় গা?"

প্রাচীনা উত্তর করিলেন "চিরকাল।" বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন "তবে যেন আমি স্বর্গে যাই—কিন্তু কেমন করে যাব—আমি ত কোন ধর্ম্ম

কর্ম্ম করি নাই, কখন কোন ব্রতনেম কবি নাই—কোন পূজা কবি নাই—কোন তীর্থ কবি নাই—কেবল একবার কাশী গিয়াছিলাম—আর একবার তৃবেণীতেও স্নান কবিয়াছি—আব সকল যোগে গঙ্গাস্নান কবিয়াছি—ও পুন্নিপুকুব যমপুকুব ও সেঁজুতি কবিযাছিলাম—আচ্ছা,এতে কি স্বর্গে যেতে পাবে না?” আবার ভাবিলেন “এই সকল কাজকে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে—আমাব বড় সন্দেহ হচ্ছে।” ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলেন। তাব পব আর কথা কহিলেন না। সন্ধ্যাব পব অবস্থা অতিশয মন্দ হইল, ক্ষণে ক্ষণে, মুহুর্মুহু সেই অন্তিমকালেব নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রম কবিয়া রাত্রি হইল, বিনোদিনীব জ্বব আসিল, কিন্তু জ্বরে সেরূপ ছট্‌ফট্ কবিতেছেন না—নিঃশব্দে বিছানায় মিশাইয়া আছেন। আব মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন “একবাব এলে হোত—দেখ্‌তে বড় সাধ হয়েছে।” আবাব নীরব হইলেন। ক্ষণেক পরে হঠাৎ বালিস হইতে মাথা তুলিয়া যেন দূরনিঃসৃত কোন শব্দ শুনিতে লাগিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন,

“মা, কে আস্‌চে?”

উ। কৈ কেহ না।

বিনোদিনী তাহা বিশ্বাস কবিলেন না, সেইরূপ মাথা তুলিয়া শুনিতে লাগিলেন,জুতার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। বিনোদিনী তাহা শুনিয়া (কি জানি কি জন্য) অবিবত ঘামিতে লাগিলেন, অতি দুর্ব্বল হইলেন, যেন মোহ যান যান,—কিন্তু একদৃষ্টে দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে জুতার শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল, এবং পরক্ষণেই কে কক্ষেব দ্বাব খুলিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে বজনীকান্ত বিনোদিনীর নিকট দাড়াইয়া—কিন্তু বিনোদিনী মুমূর্ষু বং।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বিনোদিনী প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র আবাব সেই লজ্জা আসিল, সেই চির-শত্রু লজ্জা নয়ন উন্মীলন করিতে নিষেধ কবিল—রজনীব সঙ্গে কথা কহিতে নিষেধ করিল—বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, মুখ ঢাকিয়া, শয্যায় মিশাইয়া রহিলেন, কেবল নয়নের নিকটের অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসৃত কবিয়া রজনীকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। এবার বিনোদিনীর সেরূপ ক্রন্দন নাই, বাহ্যিক চাঞ্চল্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই—স্থির হইয়া একদৃষ্টে রজনীকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনী বিনোদিনীর শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া চক্ষের জল সম্বরণ কবিতে পারিলেন না—ধারার উপর ধারা পড়িতে লাগিল। জামাতাব কান্না দেখিয়া, বিনোদিনীর মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। জামাতার সম্মুখে—এবং রোগিণীর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে তিনি না পারিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

রজনী রোদন সম্বরণ কবিয়া বিনো-

দিনীর কাছে বসিলেন। বিনোদিনী কাঁদিতে ছিল—রজনী কাছে বসিল দেখিয়া প্রফুল্লমুখে হাসিল--উৎক্ষিপ্তনয়নে রজনীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সেই স্নেহময়, আহ্লাদবিস্ফারিত কটাক্ষ শেলের মত রজনীর বুকে বিঁধিল—তখন প্রকৃত কথার কিছু কিছু বুঝি রজনী বুঝিতে পারিলেন।

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, " বিনোদিনি, কেমন আছ ?"

বিনোদিনী অতি মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন বেশ আছি—তুমি কেমন আছ ?"

রজনী কিছু উত্তর না করিয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"দিদি কেমন আছে ?"

র। ভাল আছে।

তার পর কথা বলিতে বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িল—বলিল, "দিদিকে বলিও, আমি মরিবার সময়ে দেবতার কাছে কামনা করিতেছি—দিদি যেন আমার মত সুখী হয়—আমি যেমন তোমার কোলে মরিলাম—দিদিও যেন তোমার কোলে তেমনি মরে।

তখন রজনীকান্ত সকল বুঝিয়া, কপালে করাঘাত করিলেন।

বিনোদিনী তাহা দেখিলেন, রজনীর হাত ধরিলেন; বলিলেন, "ছি। অমন করিও না। দিদিকে ভাল বাসিও—আমি যে তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিলাম, ইহা যেন দিদি কখনও না জানিতে পারে।"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পরকালে তুমি সুখী হইবে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "আজ আমাকে দেখা দিয়া, তুমি আমায় ইহকালে সুখী করিলে। আমি তোমায় দেখিয়া মরিলাম।"

এই বলিয়া বিনোদিনী নীরব হইল। অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি না মিলাইতে মিলাইতে বিনোদিনী রজনীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিল।

সমাপ্তঃ।

কমলাকান্তের পত্র।

পলিটিক্‌স।

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কিজন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে এক্ষণে নয় আইনে

অন্যত্র কিছু পলিটিক্‌স কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্‌স ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে পলিটিক্‌স সবজেক্ট রূপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্‌স লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিক্সের চাপ কেন? আমি রাজা, না খোষামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোষামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই, যে পলিটিক্স লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই, যে কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শনসম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরি টাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটীতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স নাই! এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্সবিকার শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেণপ্রসাদপ্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্‌সপ্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটী গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
　　　　ইচ্ছা বটে—ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স—হপ্তায় হপ্তায়, রোজ রোজ, পলিটিক্‌স; কিন্তু বোবার বাকচাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুত গমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিকসওয়ালারা! আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুর বাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে

জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। "জয় রাধেকৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো।" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁশি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটী শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংশ্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্রসর হইল; এক একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেণ প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স,—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকল এজিটেশ্যন সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহসহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন, এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যানের মনে হইল, যে আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যান আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোররবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুরপানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটী bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যান, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট

ভবে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই —একমুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিলেন উলসি বা কার্ডিলেন দেবেজ যে সুখে কার্ডিলেনের টুপি পরিয়াছিলেন কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষকষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ, অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে এও পলিটিক্স। দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যান—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম দাস বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যান।

বৃত্রসংহার।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

বিংশ অধ্যায়ে রুদ্রপীড়ের রণ। রণে রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাভূত করিলেন। দেবগণ স্বর্গদ্বার হইতে তাড়িত হইয়া ভগ্নোৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন—বৃত্র এবং বৃত্রপুত্র ইন্দ্রেতর দেবের অজেয়—অতএব ইন্দ্র যতদিন

না আসেন, ততদিন রণক্লেশ বৃথা সহা।

হেন কালে শূন্যে ভৈরব নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে,—যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পুরে শূন্য দূর,
ঘন সিংহনাদে পুরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্যেতে চায় :

দেখে—ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল,
চির পরিচিত সুনীল তনু।

একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী, এবং ত্রিদেব ইহার অভিনেতৃগণ। রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণীর অপমানে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া বৃত্রবধের পরামর্শ জন্য ব্রহ্মার সদনে গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ :—

দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়,
অদ্ভুত আলোকে! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া।
চারি দিকে।
ঘেরি সে মহামণ্ডল—কিরণ-পূরিত—
পার্শ্বে নিম্ন ঊর্দ্ধ দেশে অপূর্ব্ব যুবতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত!
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে,
কত দিকে, কত রূপে, কত শোভাময়!
ভেদি সে ভানুমণ্ডল প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
সদৃশ বিস্তার—স্রোত-পারাবার ঘোর ;
তরঙ্গিত সদা,—ঘূর্ণমান ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার,
নির্ব্বাণ,নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতঃ ঊর্ম্মির সিন্ধু, ঊর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী,
আবর্ত্ত ভিতরে কোটী আবর্ত্ত যেন বা!
জনমি তাহার মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত-তনু—কেন্দ্র আভাময় ;
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে : দূরতর যত
তত গাঢতর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু মৃৎ পিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ-ভুবন মোহময়!
বিরাজে সে ঊর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে!
চারি ধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে

উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে,
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে. বিধি পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতমালা জীবনমণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ।
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা মণ্ডলী; হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর প্রাণি দেহে স্নেহ-সুধাধার।

লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ধৃত করিলেন, হর্বট স্পেন্সর তাহার বিচিত্র ব্যাখ্যা করিলেন। সুশিক্ষিত বঙ্গদেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধা সিঞ্চিত করিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গেলেন; এবং বিষ্ণু ও উমার সহিত কৈলাশে উপস্থিত হইলেন। কৈলাশের ফলবেঙ্কে হুকুম হইল যে অকালে বৃত্রের নিধন হউক।

দ্বাবিংশ স্বর্গের আরম্ভে,—

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুর-ভামিনী;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গ রহে যেন স্থির!
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন!

ঐন্দ্রিলা একটু সোহাগ আরম্ভ করিলেন।. ইন্দ্রাণী জিতিয়া গিয়াছে, সেই ঝালে গা জ্বলিতেছিল। বৃত্রাসুর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভাব কেন? মহিষী তখন দুঃখের কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। "শচী আমায় নাতি মারিয়া, বো কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।" অসুর বড় রাগিয়া উঠিল। তখন ঐন্দ্রিলা যথায় সুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী নির্ব্বিঘ্নে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহা দেখাইতে লইয়া গেল। বৃত্র দেখিতে অমরার প্রাচীরে উঠিলেন।

তখন দেবদৈত্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়াছে। রুদ্রপীড় অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়া, দেবসেনা বিমুখ করিতেছে। এমত সময়ে বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন।

দেখিল অসুর সুর প্রাচীর শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।

চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর কুণ্ডল
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রশস্ত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা-পরশ।

সুর পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত করিলেন;

"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিল দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণকাল নিবার এ সুর রথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।"

বৃত্রাসুর চলিয়া গেলে, রুদ্রপীড় সকল দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দেবরাজের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ, ত্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণারসে। রুদ্রপীড়ের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ হিংসাপূর্ণা ঐন্দ্রিলার তেজোগর্ব্ব অমর্ষসূচিত রোদন উভয়ই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল। আমরা এই কাব্যের প্রথমভাগ হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছি এজন্য, আমরা আরও উদ্ধৃত করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ঐন্দ্রিলাবিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিলে ঐন্দ্রিলার চরিত্রের সুসঙ্গতি স্পষ্টীকৃত হয় না:—

"কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী!
নহিলে সে দেখা'তাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?
জ্বালা'তাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্ত তার
জ্বালা'তাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর।
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজ-বামার
রুদ্রপীড় রণ-সাজে; হেরি পুত্র সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার!
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া!

এই ঘোর রণবাদ্যের সঙ্গে নারীহৃদয়ের মধুরনাদিনী বীণাতন্ত্রীও বাজে,—

"কে হরিলা? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি?—হৃদয় মাণিক্!
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার—
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড় মম!
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রু-নীরে
সেই চারু চন্দ্রানন। দৈত্যকুলমণি
দেখিব হে একবার। জীবন পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ!—এ জগত মাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর
'ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে'
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি এনে দেও সে ধন আমার।"

পুত্র শোকাতুর বৃত্র

স্ফুরিত-নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
"সাজো রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।"

এই রণসজ্জা অতিশয় ভয়ঙ্করী। পরদিন সূর্য্যোদয়ে রণ হইবে—দানবপুরীতে সেই কালরজনীতে ভীষণ রণসজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল ধ্বংস হইবে। আমরা সেই ভয়ঙ্করী রণসজ্জার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—দুঃখ রহিল। কৃতান্তের কালছায়া আসিয়া সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে—গভীর মানসিক অন্ধকারে অসুরপুরী গাহমান হইয়াছে—কালসমুদ্র উদ্বেলনোন্মুখ দেখিয়া কূলস্থ জন্তুসমূহের ন্যায়

অসুরপুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠিযাছে। আগামী বৃত্রসংহারের করাল ছায়া অসুরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গে বজ্রাঘাতে বৃত্রবধ এবং কাব্যসমাপ্তি। দেবদানবের আশ্চর্য্য রণ।

লহরে লহরে
সাগর তরঙ্গ তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া, ভাঙিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার,
চলিল দনুজদল সেনানী চালনে।
দৈতধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকার।
ঝক্‌ ঝক্‌ কিরণ চমক্‌ অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া।

উভয় দলের সমবেত সেনামধ্যে যখন ইন্দ্র রণসজ্জা করিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠ আরোহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে সর্ব্বহাসিনী, সর্ব্বভাষিণী, সর্ব্বনাশিনী চপলা সুমেরুহইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এতবলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্ল মতি; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন! ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ বদনে বামা মুদিল নয়ন,
রাঙিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর।
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরেছে অপূর্ব্বমূর্ত্তি—বিধি-হরি-হর
তেজে নিত্য সচেতন! হেরিছে সঘনে
স্থিরসৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে।
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম; কহিলা "চপলে,
পুরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুররণভূমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে,
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে; বিবাহ উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিলা পুষ্পমালা
দিলা সুখে ইন্দ্র করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা বজ্রে সে কুসুমদাম।
স্বয়ম্বরা হইলা চপলা মনসুখে,
বরিল লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর সমর ক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে!

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এ বিবাহে বঙ্গদর্শন ঘটক। রূপ ও তেজের পরিণয়ে বঙ্গদর্শন চিরকাল ঘটকালি করে, আমরা বঙ্গদর্শনকে এই আশীর্ব্বাদই করি।

তুমুল সংগ্রাম বাজিল। বাসব ও জয়ন্তের পরাভবার্থ বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন—

ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে। হেনকালে, হায়,
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে!
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে!

শূল ব্যর্থ দেখিয়া বৃত্র

ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ।
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ বেণুপ্রায়!
সে চীৎকারে,সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ,ব্রহ্মলোকে।—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন। মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে। কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে।
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার। ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি,দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"

তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন।

ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে, সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!

বজ্রাঘাতে বৃত্র প্রাণত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ।

কাল বৃক্ষ।

১

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল্ল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

২

সকলি যেতেছে—সকলি যাইবে
এ জগত মাঝে রবে না কেহ
আশার আনন্দ—নিরাশা বেদনা—
ধূলাতে লুটাবে সোণার দেহ।

৩

এই যে তখন দেখিনু প্রভাতে
রঞ্জিয়া গগন অপূর্ব্ব রাগে
উঠিল তপন সোণার বরণ
সে চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে।

৪

কোথা সে ঊষার সুষমা এখন
কোথা সে ললিত লোহিত বিভব,
দেখনা ভুবন ভরিছে আঁধারে
নিশিতে বিলীন হতেছে দিবা।

৫

এই যে সে দিন হৃদয়মাঝারে
বোপিলে যতনে আশাব তরু
না ফলিতে ফল শুকাল পাদপ
সে হৃদি এখন হইল মরু।

৬

এই যে সে দিন খোদিলে কাননে
সুন্দর সরসী সলিলে ভরা,—
নিদাঘ আইল শুকাল সলিল
নীরস হইল সরস ধরা।

৭

ভালবেসে তারে প্রাণেরো অধিক
সুখ আশে আমি সঁপিনু প্রাণ ;
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে—
এ হৃদি করিয়ে চির শ্মশান।

৮

ভেবেছিনু আমি সখার সহিত
যাপিব যামিনী জাগিয়া থাকি
নিদ্রিত দেখিয়া গেল সে চলিয়া—
জনমের মত দিলেক ফাঁকি !

৯

জাগ্রতের দুঃখ কহিব কাহারে
যদি কভু পাই সখার দেখা
আর না ঘুমাব হয়ে অচেতন
আর ত নারিবে করিতে একা।

১০

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

১১

ক্রমশঃ যেতেছে—ক্রমশঃ আসিছে
ক্রমশঃ ছুটিছে অণুতে অণু,
নূতন হতেছে পুরাতন ক্রমে
পুরাণ ধরিছে নূতন তনু।

১২

মেঘেতে মেঘেতে মিশায়ে যেতেছে
আলোকে আলোক হ'তেছে লীন
সিন্ধুর সলিল শোষিছে তপন,
নিশি পাছে পাছে ছুটিছে দিন।

১৩

চির আবর্ত্তন—চির চঞ্চলতা
নাহিক বিরাম তিলেক তরে,
কেবলি ঘুরিছে—কেবলি ঝরিছে
দেখিলে প্রাণ যে কেমনি করে !

১৪

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

১৫

বহিছে সমীর ঝরিছে পল্লব
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিটপীতলে
অমনি ধরণী জগত জননী
ধরিছে টানিয়া কোমল কোলে।

১৬

দেখিতে দেখিতে হল স্তূপাকার
আর যে দেখিতে পরাণ কাঁদে,
অমনি করিয়া গিয়াছে ঝরিয়া
যত আশা মোর আছিল হৃদে।

১৭

অমনি করিয়া পড়িবে ঝরিয়া
রবি শশী তারা দেখিছ যত,—
অমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পড়িবে বিটপী-পত্রের মত।

১৮

অমনি করিয়া এ তনু আমার
পড়িবে ঝরিয়া পত্রের কাছে—
অমনি করিয়া খসিবে আমার
যত কিছু প্রিয় জগতে আছে!

১৯

বেলা গেল, রবি ডুবিছে ক্রমশ:
কাল মেঘে কিবা করিয়া আল
এখনি সে রাগ বিলীন হইবে
ঘেরিলে সন্ধ্যার তিমির জাল।

২০

এখনো নীরবে ঝরিছে পল্লব
কতই এখনও ঝরিবে আর,—
এ চির পতন না জানি কখন
কবে সমাপন হইবে তার!

২১

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশ: যেতেছে জীবের আয়ু।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

সংযুক্তা।*

১। স্বপ্ন।

১

নিশীথে শুইয়া, রজত পালঙ্কে
পুষ্পগন্ধি শির, রাখি বামা অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন, শিহরে সশঙ্কে
মহিষীর কোলে, শিহরে রায়।
চমকি সুন্দরী নৃপে জাগাইল
বলে প্রাণনাথ, এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে, যে না চমকিল
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

২

উঠিয়ে নৃপতি কহে মৃদু বাণী
যে দেখিনু স্বপ্ন, শিহরে পরাণি,
স্বর্গীয়া জননী চৌহানের রাণী
বন্যহস্তী তাঁরে মারিতে ধায়।
ভয়ে ভীত প্রাণ রাজেন্দ্রঘরণী
আমার নিকটে আসিল অমনি
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী
বন্যহস্তিশুণ্ডে প্রাণ বা যায়॥

৩

ধরি ভীম গদা মারি হস্তিশুণ্ডে,
না মানিল গদা, বাড়াইয়া শুণ্ডে,
জননীকে ধরি, উঠাইল মুণ্ডে;
পাড়িয়া ভূমেতে বধিল প্রাণ।
কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি
কি আছে বিপদ কপালে না জানি
মত্তহস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ॥

৪

শুনিয়াছি নাকি তুরুস্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়।
জননী রূপেতে বুঝিবা স্বদেশ;
বুঝি বা তুরস্ক মত্ত হস্তী বেশ,
বার বার বুঝি এই বার শেষ,
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়॥

* পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জ রাজার কন্যা।

৫

শুনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়—
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,
আসে আসুক না নর বা অমর
কার সাধ্য তব শকতি সয়?
পৃথ্বীরাজ সেনা অনন্ত মণ্ডল
পৃথ্বীরাজ ভুজে অবিজিত বল
অক্ষয় ও শিরে. কিরীট কুণ্ডল
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥

৭

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি জয় জয় বলি
ভূষণে শিঞ্জিনী, নয়নে বিজলি
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ
নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি॥

২। রণসজ্জা।

১

রণসাজে সাজে চৌহানের বল,
অশ্ব গজ রথ পদাতির দল,
পতাকার রবে পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ।
ধূলিতে পূরিল গগন মণ্ডল
ধূলিতে পূরিল যমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ॥

২

দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন—
খড়্গী বর্ম্মী চর্ম্মী ধানুকী ধীর।
মদবার* হতে আইল সমরা
আবু হতে এলো দুরন্ত প্রমর
সিন্ধু বারানসী প্রয়াগ ঈশ্বর;
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর॥

৩

গ্রীবা বাঁকাইয়া চলিল তুরঙ্গ
শুণ্ড আছাড়িয়া চলিল মাতঙ্গ
ধনু আস্ফালিয়া—শুনিতে আতঙ্ক—
দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতায়নে কনৌজনন্দিনী
দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী
ভারত ভরসা, ধরম রক্ষিণী—
ভাসিলা সুন্দরী নয়ন জলে॥

* মেবার অমর সিংহ।

৪

সহসা পশ্চাতে দেখিল স্বামীরে,
মুছিলা অঞ্চলে নয়নের নীরে,
যুড়ি দুই কর বলে "হেন বীরে
রণ সাজে আমি সাজাব আজ।"
পরাইল ধনী কবচকুণ্ডল
মুকুতার দাম বক্ষে ঝলমল
ঝলসিল রত্ন কীরিটি মণ্ডল
ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ॥

৫

সাজাইয়া নাথে যোড় করি পাণি
ভারতের বাণী কহে মৃদু বাণী
"সুখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি
এ বাহিনীপতি, চলিলা রণে।
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী,
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী
মথিবে সে সিন্ধু নিয়ত প্রহারি
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে॥

৬

আমি অভাগিনী জনমি কামিনী
অবরোধে আজি রহিনু বন্দিনী
না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী,
অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে।
যবে পশি তুমি সমর সাগরে
খেদাইবে দূরে ঘোরির বানরে
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে,
তব বীরপনা! না রব কাছে॥

৭

সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ
তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ
হানি শত্রু শিরে বাসবের বাজ
ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু হয়েন নির্দ্দয়
যদি হয় রণে পাঠানের জয়
না আসিও ফিরে;—দেহ যেন রয়
রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রু রুধিরে॥

৮

কত সুখ প্রভু, ভুঞ্জিলে জীবনে!
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে?
নয় গেল প্রাণ, ধর্ম্মের কারণে?
চিরদিন রহে জীবন কার?
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ
গৌরবে পূরিত হবে দিগ দশ
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স
স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার॥

৯

করিলাম পণ শুনহে রাজন
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ
নাহি যতক্ষণ কর আগমন,
না খাইব কিছু, না করি' পান।
জয় জয় বীর জয় পৃথ্বীরাজ!
লভ পূর্ণ জয় সমরেতে আজ
যুগে যুগে প্রভু ঘোষিবে এ কাজ
হর হর শম্ভো কর কল্যাণ॥

১০

হর হর হর! বম বম কালী!
বম বম বলি রাজার দুলালি,
করতালি দিল—দিল করতালি
রাজ রাজপতি দুরু হৃদয়।
ডাকে বামা জয় জয়পৃথ্বীরাজ
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ
জয়, দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয়।

১১

প্রসারিয়া রাজা মহা ভুজদ্বয়ে,
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে,
পড়ে অশ্রুধারা চারি গণ্ড বয়ে,
চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে।
স্মরি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীর,
মহা গজপৃষ্ঠে শোভিল শরীর
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর,
কে জানে এতই জল নয়নে।

১২

লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে
জয় জয় বলে,—নয়নের জলে
জয় জয় কথা না পায় ঠাঁই।
কবি বলে মাতা মিছে গাও জয়
কাঁদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ বয়,
ও কান্না বহিবে এ ভারতময়
আজিও আমরা কাঁদি সবাই॥

৩। চিতারোহণ।

১

কত দিন রাত পড়ে রহে রাণী
না খাইল অন্ন না খাইল পানি
কি হইল রণে কিছুই না জানি,
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে—
কেহ নারে কারে ফুটিয়া বলিতে,
হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয়॥

২

মহারবে যেন সাগর উছলে
উঠিল রোদন ভারত মণ্ডলে
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান।
আসিছে যবন সামাল সামাল!
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল?
পৃথ্বীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল,
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ॥

৩

ভূমি শয্যা ত্যাজি উঠে চন্দ্রাননী।
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি,
সম্মুখ সমরে বীর শিরোমণি
গিয়েছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে,
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া পূজিব প্রভুরে,
পুরাও রে সাধ, দুঃখ যাক দূরে
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে॥

৪

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে
সে নহে বিজিত; অপ্সরে কিন্নরে,
গায়িছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে জয় জয় বল,
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া চল
অনন্ত চিতায় প্রচণ্ড অনল,
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয়।

৫

চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি
কুসুমের হার যোগাইল দাসী
রতন ভূষণ কত পরে হাস
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে।
আয় আয় সখি, চড়ি চিতানলে
কি হবে রহিয়ে ভারতমণ্ডলে?
আয় আয় সখি যাইব সকলে
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে॥

৬

আরোহিলা চিতা রাজ্ঞিনীর দল
চন্দনের কাষ্ঠে জ্বলিল অনল
সুগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল—
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে।
বলে সবে বল পৃথ্বীরাজ জয়
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচয়
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠ বাসে॥

৭

কবি বলে মাতঃ কি কাজ করিলে
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা, পাঠান ভয়ে।
সেই চিতানল, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারত মণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে॥

গঙ্গাধর শর্ম্মা

অথবা

জটাধারীর রোজনামচা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশুতোষ বাবুর কাছারি।

আমাদের শ্রীনগরাধিপতি মহাত্মা আশুতোষ বাবুর নাম চিরপ্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল যখন তিনি প্রায় সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হন আপামর সকলে আপন আপন আয়ুর কিয়দংশ কাটিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য গ্রামের দেবমন্দিরে একত্র হইয়া কেন আরাধনা করিয়াছিল? দরিদ্রের কুটীর হইতে আমার জন্য—হে সমতাবাদী সুজন। তোমার জন্য এরূপ প্রার্থনা কেন না গগনে উঠে? আশুতোষ বাবু উচ্চতর রাজপুরুষদের নিকট তাদৃশ পরিচিত নহেন। সংবাদপত্রে, কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে বা বৎসরান্তে সাধারণ উপকারের কার্য্য তালিকায় নাম বাহির করিবার জন্য তাদৃশ অভিলাষী ছিলেন না। হয়ত

অনেক সাহেব তাঁহার নামও শুনেন নাই; কিন্তু যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি কখন তাঁহাকে ভুলিবেন না, তাঁহার বাঙ্গালিজাতির উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রবীণ সজ্জন ডাক্তর ইটওয়াল সাহেব, আশুতোষ বাবুকে আত্যন্তিক সম্মান করিতেন ও অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন কিন্তু সাহেব কখন তাঁহাকে নগরে যাইয়া কোন রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলে, আশুবাবু হাসিয়া কহিতেন "আমি ওমেদার নহি।" যদি ধনপুত্রে স্বচ্ছন্দতায়, বিস্তৃত রাজ্য খণ্ডের স্বামিত্বে, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা খনন, জাঙ্গালনির্ম্মাণ, দেবালয়স্থাপন, দেবসেবা, অতিথিসেবা, ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে স্থাপনায়, যশকীর্ত্তির গৌরবে কাহাকেও সুখী করিতে পারে তবে বোধ হয় আশুতোষ বাবু মর্ত্ত্যে একজন নিতান্তই সুখী পুরুষ ছিলেন। যেমন একদিকে তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবী অনুকূল প্রকৃতি সুন্দরীও তাঁহাকে সেই রূপ সুন্দরপ্রকৃতি দিয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক বা শারীরিক সৌকুমার্য্য অধিক সুন্দর এইরূপ বিতর্ক সতত উপস্থিত হইত। একদিকে তাঁহার রাজীবলোচনের সুপ্রভা, হাস্যময় সুকুমার ওষ্ঠ, চাম্পকপুষ্পের ন্যায় বিলোড়িত অঙ্গুলিনির্দ্দেশ আর একদিকে সুমধুর শোকনিবারণকারী সুবচন যখন তোমার হৃদয়কে শীতল করিত তখন নিজ অনুতাপ ভুলিয়া বিলক্ষণ বোধ হইত যে এই মহাজন যথার্থই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

সূর্য্যোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রতিদণ্ডেই প্রায় তাঁহার উদারতার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইত। সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই দেখ চারিদিক্ হইতে তাঁহার কপোতপাল পালে পালে উড়িয়া সূর্য্যের কিরণ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেছে, খর্ব্ব খর্ব্ব পাতিহংস, বৃহত্তবকায় লম্বগ্রীব রাজহংসগণ কাকলি রবে তাঁহার চরণ নিকটে আহার প্রার্থনা করিতেছে, দৈনিক সর্ষপ বা তণ্ডুল বিতরণ হইতেছে; ইহারা উদর পূরণ করিয়া চলিয়া গেল, বাবু মহাশয় বৈঠকখানার স্বীয় আসনে বসিলেন, চারি পার্শ্বে কতকগুলি পিঞ্জরে শ্যামা, ময়না, শারিকা, হলুদগুঁড়ি, তুঁতি, মুরি, হিরামোহন, একটি চল্লিশ বৎসরের হরিৎ শিক্ষাধারী কাকাতোয়া, বেষ্টন করিয়া বসিল। একটি বড় পিয়ালাপূর্ণ দুগ্ধ, কতকগুলি হিঙ্গুলে পুত্তলের মত সুশ্রী স্বর্ণালঙ্কৃত বালক বালিকা আসিয়া জুটিল। বাবু মহাশয় বেদানা ভাঙ্গিতেছেন, সাদরে শিশুদের মুখে প্রদান করিতেছেন। আবার একদিকে ক্ষুদ্র চামচে ভরিয়া পক্ষীর মুখেও দুগ্ধ দিতেছেন, পণ্ডিতে কহিতেছেন; আবার মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যের উপদেশ দিয়া মন্ত্রী ভৃত্যবর্গকে পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে অতিথের একটি বৃহৎ দল আসিয়া উপস্থিত, আহা-

দের সহিত কতকগুলি টাট্টু, একটি উট, কতকগুলি তুরি ভেরী, শঙ্খ ও ছালা ছালা শালগ্রাম ও বিগ্রহ ছিল। অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ভেরী বাজিয়া উঠিল; শিশু সকল ভয় পাইয়া অন্তঃপুর দিকে পলায়ন করিল, কেহ ভেরির সঙ্গে সঙ্গে আপন রোদনধ্বনি মিশাইল, ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য আশুতোষ বাবু একটী শিশুকে স্বক্রোড়ে লইলেন। এদিকে ঋত্তির সর্দ্দার বিভূতিভূষণ জটাধারী রুদ্রাক্ষমালা ঘুবাইতে ঘুবাইতে দোল গুড়ের হাঁড়ির মত স্ফীত উদরে উচ্চরবে একটি আশীর্ব্বাদ বচনে ধনপুত্র স্বচ্ছন্দতা দান করিলেন, পরে কোন মহাপুরুষের ন্যায় হেলিতে দুলিতে, কোন সৈন্যদলের অধিনায়কের চালে চলিতে চলিতে, স্পর্দ্ধাসহকারে বাবু মহাশয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার জনৈক চেলা একটি রাঙ্গা বনাতের আসন পাড়িয়াদিল, আর একজন অনুচর দূর হইতে কহিয়া উঠিল।

সাধুকো চড়াও টাট্টু, খিলাও লাড্ডু।

ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অনুচর খাদস্বরে জলদতানে

লাম দেও, লাদায় দেও লাদন হারা সঙ্গত দেও,

বৃন্দাবন মে পৌঁছা দেও, কহিয়া উঠিল।

বাবু মহাশয় এসকল ভণ্ডামি বিলক্ষণ বুঝিতেন, হিন্দুধর্ম্মের কি সার অসার সকলই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দশজন প্রতিপালনের জন্যই ভগবান্ একজন বড় লোকের সৃজন করিয়া থাকেন, তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল না নেড়ানেড়ী বাউল দাসের উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না, বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রশংসা করিলে দুই একটি বৈষ্ণবী বারাঙ্গণার নাম উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মের গৌরব প্রমাণ করিতেন। সে যাহা হউক তিনি সাধুর সহিত বিতর্ক করিলেন, সাধুকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, তাঁহার নিকট ক্রোধনিবারণী ঔষধও ছিল। দুই ছিলিম গঞ্জিকা, কয়েকটী আফিঙ্গের বড়ি ও আহারোপযোগী ঘৃত ময়দা দান করিবার আদেশ দিয়া সাধু সর্দ্দারকে ঋত্তি সহ বিদায় করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন একটি ভদ্র প্রজা কাচা গলায় দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আশুতোষ বাবু কহিয়া উঠিলেন "কে বাপু পরিক্ষিৎ? কবিরাজকে যে পাঠাইয়াছিলাম কোন উপকার হইল না? তোমার পিতাকে বাঁচাইতে পারিল না? সৎকার কেমন করে হল? কাল রাত্রে যে বড় বর্ষা হইয়াছিল, গোলা হইতে গোমস্তা গড়ে কাট দিয়াছিল কি না?" পরিক্ষিৎ উত্তর কি দিবে, কান্দিয়াই অস্থির হইল। বাবু মহাশয় আবার কহিলেন "ঐ সকলের পথ দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ মাত্র যদি সুসন্তান হও এখন শ্রাদ্ধাদির উপায় কর।"

প। শ্রাদ্ধের কর্ত্তা, মহাশয়।

কর্ত্তামহাশয় তখনি ভাণ্ডারিকে ডাকাইলেন, পরিক্ষিতের অবস্থানুযায়ী শ্রাদ্ধের সমস্ত উপকরণের তালিকা প্রস্তুত হইল, কোন হাম্বার হইতে ধান, কোন গোলা হইতে চাল, কোন উদ্যান হইতে উদ্ভিজ্জ তরু তরকারি, কোন মালের পুষ্করিণী হইতে মৎস্য লইবার অনুজ্ঞা দিলেন। আবার ভাগীদের আপত্তি আশঙ্কায় নিম্নস্বরে কহিলেন, যদি আবশ্যক হয় বায় বাঁদের বায়ুকোণে সেই পুরাণ পাকুড় গাছটি কাটিয়া লইও, জ্বালানের সুসার হইবেক। এই কথা শেষ না হইতেই সভাপতি তর্কালঙ্কার মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপকের সহিত বাবু মহাশয় সতত পরিহাসে অনুরক্ত। দেখিবা মাত্র কহিলেন ইংরেজেরা অনেক ক্রিয়া রহিত করিতেছে, গঙ্গাসাগরে সন্তান সম্প্রদান করা বন্ধ করিল, সতীর আগুন খাওয়া উঠাইল, শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্বন্ধে একটি নিয়ম হইলে দরিদ্রেরা ব্রাহ্মণ গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়। "মাসত্রয় মাত্র সেই রেমরায়ের" (মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম অধ্যাপক এই প্রকার উচ্চারণ করিতেন)—"মাসত্রয় রেমরায়ের পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন এখনও সেই কুমন্ত্রণা ভুলিলেন না?" অমনি জানুদেশে হস্তাঘাত করিতে করিতে "সব উচ্ছন্ন গেল।" বলিতে বলিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, ক্রোধভরে এক পা চালনা না করিতেই তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাবলীটি খসিয়া পড়িল। এ একটি কুলক্ষণ মনে করিয়া স্তব্ধ হইলেন। অমনি একটি কর্ম্মচারী কহিয়া উঠিল "মহাশয় প্রস্থানের কর্ম্ম নয়—এ দিকে পলাইবেন ঐ দিকে ধরিবে; ঐ দেখুন ইনকমটেক্সের পিয়াদা মহাশয়ের নামে বিজ্ঞাপন জারি করিতে আসিয়াছে—" কম্পিতকলেবর অধ্যাপক মহাশয় ইনকমটেক্সের নাম শুনিয়াই বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন "ব্যাপার কি?"

কর্ম্মচারী বলিলেক "মহাশয়ের সম্বৎসরের আটচল্লিশ টাকা মাত্র কর ধার্য্য হইয়াছে—এই বিজ্ঞাপনটি লইয়া রাখিয়াছি— এই মোহর এই দস্তখৎ।

ত। "মোহর দস্তখত তোমরা দেখ শুটিস আর আমি দেখির না, এখন উপায়? কর্ত্তা এই সম্মুখে। মহাশয় একখানি গাম নিষ্কর করিয়া দিলেন, সকলে জানিল, কথা রাষ্ট্র হইল, তাহাতে এই জ্বালা বাড়িল—কি বিপদ। কোথা রাজা ব্রাহ্মণে দান দিবে, না দানের অংশ আতপ তণ্ডুল, কলা, মূল, কাচকলায় পর্য্যন্ত হস্ত নিক্ষেপ! পিয়াদা কোথায়?" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন "ভাল স্মরণ হয়েছে সে দিন চান্দ্রায়ণের পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা আমার প্রাপ্তি আছে। মহাশয়!" স্মরণ করিয়া দিবা মাত্র আশুতোষ বাবু আদেশ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় পঞ্চ মুদ্রা পাইলেন, হস্তে লইলেন ও মস্তক হেলাইয়া কহিলেন পঞ্চ মুদ্রা পঞ্চ আনা "বটি শতাধিক সহস্রং স্বর্ণদক্ষ মূল্যম্" সঙ্গে

সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয় একটী শিকি ও চারিটী পয়সা পাইলেন। শিকিটি আবার কর্ম্মচারীর হস্তে দিয়া কহিলেন "বাপু! পিয়াদাকে এইটী দিয়ে বিজ্ঞাপনে রূপস লিখে দেও, অরুপস্থানকে রূপস বলনা তোমরা? আমি শ্রীহরি বলিয়া প্রস্থান করি।" ইঙ্গিত মাত্রে এই সময় একটি সাজান পিয়াদা কহিয়া উঠিল "ও তর্কালঙ্কার মহাশয় রসিদ দিয়ে যান।" তর্কালঙ্কার পশ্চাতে অবলোকন করিলেন না দ্রুতগতি বৈঠকখানার পশ্চাতে যাইয়া করসংগ্রাহককে অভিসম্পাত দিয়া উদ্যান বনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দেখা কে পায়?

এখন বিষয়কার্য্য আরম্ভ হইল। আশু বাবু পকেট বুক, মেমো কেশ, পেনশিল, হাতচিটি, সংবাদ পত্রের কলম কাটা, সরকুলার হুকুমের শ্লিপ রাখিতেন না, কিন্তু কার্য্য সময়ে বাল্মীকি, ব্যাস, পঞ্চতন্ত্র, নীতি, আনওয়ার সোহেলির কেসসা, সাদির বয়েত, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতাবলী, তুলসী দাসের কহত, কবীরের দোহা, সময়ে সময়ে অনর্গল ব্যাখ্যা করিতেন, আবার রাজহাঁসের খাঁচার ভগ্ন দ্বার মেরামত হইয়াছে কি না তাহাও এক মুখে প্রশ্ন করিতেছেন। অপর মুহূর্ত্তে পার্লমেণ্ট সভায় আয়কর সম্বন্ধে মন্ত্রিগণের বক্তৃতার যে অনুবাদ ভাস্করপত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহা মুখে মুখে কহিয়া সকলের কৌতুক হরণ করিতেছেন—এমন সময় নিকটস্থ কণকপুর গ্রাম হইতে একটী হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিল। তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে কুলনারীগণ নিজ নিজ গৃহে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অন্নের হাঁড়ি অগ্নিস্পর্শ করে না, পথে লোক চলে না, ঘাটে জল নড়ে না—কেবল বাঙ্গা পাগড়ী মেহুদী রঙ্গরঞ্জিত বৃহৎ বৃহৎ দাড়ি, রক্ত চক্ষুর নিম্নভাগে ঝোপের মত বড় গোঁফ লয় বরকন্দাজ দল গ্রামের তলমাটি উপর করিতেছে। কণকপুর রঘুবীরের ঘর গ্রাম, রঘুবীর আপন স্ত্রী সোনা বাগ্দিনীকে কুচরিত্রা সন্দেহে বিলক্ষণ প্রহার করে, সোনা অভিমানে আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়া গলায় ফাঁশি লাগাইয়াছিল, রঘু ভাগ্যক্রমে সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাঁচায়, এই ছটি কথা দারগা সাহেবের কর্ণগোচর হয়, এখন রঘু স্ত্রী সহিত অভিযুক্ত। প্রথমতঃ দারগা সাহেব একদায় খুনের অভিযোগ করেন; পরে রঘু ফেরার হইলে আত্মহত্যার উদ্যম জন্য তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালাইতেছেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ জন্য সমস্ত গ্রাম উৎসন্ন যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। সাক্ষী রাখিয়া কে আত্মহত্যার উদ্যোগ করে? কিন্তু সাক্ষী সংগ্রহ জন্য একদিকে রাজকর্ম্মচারিগণ যেমন তৎপর অন্যদিকে সমস্ত গ্রামস্থ লোক সদ্ভাবপুত্রকে রক্ষা করিতে যত্নবান্। কি হইবে কে উদ্ধার করিবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া গ্রাম্যমতে যিনি ভবের ভাবনা ভাবিয়া থাকেন—আশুতোষ বাবুর

নিকট গ্রামস্থ মুখ্য মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোণাই মণ্ডল সকলের অগ্রসর, স্থূলকায় খর্ব্বকলেবর মাথায় টাক—সোণাই মণ্ডলের কপালের মধ্য ভাগে গোলাকৃতি একটী আধুলি প্রমাণ ধূলার দাগ, ব্রাহ্মণগণকে ঘন ঘন প্রণাম করিয়া তিনি পরমগৌরবে এই চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন—সোণার হস্তে কয়েকটি আম্রপত্র. ব্রাহ্মণ দেখিলে সেই পত্রে পদরেণু লইয়া নিজ ওষ্ঠে সম্প্রদান করেন কারণ এইরূপ ধূলা খাইয়াই তাঁহার শূলরোগ আরাম হইয়াছে। তাঁহার পশ্চাতে, বামুরায় ফৌজদারির গোমস্তা. লম্বাকৃতি, বক্রপৃষ্ঠ, অতিশয় টেরা চক্ষু ও উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় বক্রভাবে পাদুকার চর্ম্ম কাটিয়া বাহির হইয়া মিলিত—জুতা পরিবার বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। পায়ের গোড়ালি যেন হালি মেটে দেওয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে, ফাটা সমূহ মোমে ও ঘুটের ছাইয়ে আবদ্ধ, উপরে, জানুস্থলপর্য্যন্ত লোমরাজি ধূলায় ধূসর. উভয়ে পাদুকাদ্বয় ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন, ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইলেন। প্রকৃত ঘটনা ক্ষণমধ্যে আশুতোষ বাবুর কর্ণগোচর হইল তাঁহাকে কথা অতি সহজ বোধ হইল। "ভ্রষ্টা স্ত্রী আত্মাভিমানে আত্মহত্যা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল?" আশু বাবু কহিলেন "এই কি বড় গুরুতর কথা, যদি গুরুতরই হয় সে জন্য রগু দিতে এত ঔৎসুক্য কেন? 'আইন' 'আইন' করিয়াই সকলে ব্যস্ত হতেছে।—যে আইনে যে পুলিসে একদিন সিঁধ চুরি বন্ধ হইল না, যাহারা আমাদের ধন মান ডাকাইত হস্ত হইতে ও বড় শাঁকোর লাঠিয়ালের লাঠি হইতে রক্ষা করিতে পারে না তাহারা আমাদের নিজের প্রাণ নিজ হাতহইতে রক্ষা করিতে এত ব্যস্ত কেন?" সোণাই মণ্ডল খাদ স্বরে কহিয়া উঠিল—"বড় গম্ভীরের কথা—এই কথা শুনিবার আশায় এই আশ্রয়ে এই শ্রীচরণ তলে আমাদের এতদূর আগমন, এখন রক্ষা করুন।"

আশুতোষ বাবু কহিলেন তোমাদের কথাগুলি দেওয়ানজী গজাননের নিকট যাইয়া কহ—নিষ্পত্তি জন্য তোমাদের মোকর্দ্দমা তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিলাম। তিনি দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তোমরা স্নান আহার কর, পরে আরাম করিয়া দেওয়ানজির নিকট যাইবে, সকল কথার নিষ্পত্তি মুহূর্ত্তে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান্ গজানন চৌধুরী।

গজাননের প্রকৃতির প্রকৃত বর্ণনার্থ দুই সরস্বতীর বর প্রার্থনা করি। কপটতা চাতুর্য্য তাঁহার শত্রুদমনের প্রবল অস্ত্র, বাক্‌পটুতা, চাটুকারিতা, প্রিয়বাক্য, মাটির মত অচলতা তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র। তাঁহার সত্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে একটী গল্প সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। শুনা

যায় জাহ্নবীস্রোতে কয় নৌকা বিলাতী মিথ্যা কথা ভাসিয়া আসিয়াছিল, দেশের কয়েকটী লোকে তাহা ভাগাভাগি করিয়া লয়। ব্যবস্থাজীবী কেহ বাকি ছিলেন না, মোক্তার বলুন আরও উচ্চ লোক বলুন, গোমস্তা, কুঠিয়াল, মহাজন, সওদাগর অনেকে পড়িয়া কাড়াকাড়ি করেন, কেহ বেশি কেহ কমত গ লইবা কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। গজানন তখন কার্য্যান্তরে অর্থাৎ একটি দলিল স্বহস্তে কাটকুট করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়া দেখিলেন দেশের লোকের ভাগাভাগিতেই সব কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। গজানন হতাশ হইয়া, ব্যাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে বসিলেন, দেবীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন, ধরনা দিলেন—অবশেষে আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করায় জাহ্নবীদেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। দেবী কহিলেন "বাছা! মিথ্যাকথার ভাগ পাও নাই বলিয়া তুমি কাঁদিতেছ—তোমার ভাগে আবশ্যক? ষোল আনা রকম মিথ্যা তোমায় দিতেছি—অদ্যাবধি তুমি যাহা কহিবে মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। যা কহিবে তাহাই মিথ্যা হইবে।" সেই পর্য্যন্ত গজানন মিথ্যা রচনায় সম্পূর্ণ পটু হইলেন। কিন্তু এই অসরল লোক সরলস্বভাব আশুতোষ বাবুর নিকট অনেক দূর প্রতিপন্ন ছিলেন। ঋজুচিত্ত আশুতোষ সময়ে সময়ে গজাননের চক্রভেদ করিতে অশক্ত হইতেন বা অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন; কারণ আশুতোষ বাবুর রাজ্যোন্নতিসাধন গজাননের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে উপায়ে হউক কার্য্য উদ্ধার করিতেন, কিন্তু আশু বাবু ফলমাত্র বিজ্ঞাত, উপায়চক্র গজাননের গভীর মনকূপেই বদ্ধ থাকিত। এ দিকে মোকদ্দমা গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে, কাঁচাইতে, পাখা দিতে, উড়াইতে দেওয়ানজি অদ্বিতীয় গুণাধার, সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, তাঁহার চক্ষে সব সমান, গোময় চন্দন সমানজ্ঞান। গজানন মিথ্যার মহাদেব। নয় শ উননব্বয়ের জোড়াটী সহস্র টাকা পূর্ণ করাই তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য—ঐহিকের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল। যেমন ঔষধগুণে ফণাধারী সর্প নতশির, সেইরূপ গজাননের মন্ত্রে দন্তশালী দারগা, ভীষণমুখ জমাদার সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী সমনত্র। ইঙ্গিত মাত্রে সোণাই মণ্ডল, ও রামু রায় সঙ্গে গজানন কণকপুরে উপস্থিত হইলেন। একটী স্বতন্ত্র গোলাবাটীর ঈশানকোণাংশে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বসিলেন। দুই দণ্ডের মধ্যে স্বয়ং দারগা সাহেব দাড়ি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে তথায় উপস্থিত ও ক্ষণকাল মধ্যে পরামর্শ, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ, অঙ্গুলি বিক্ষেপণের দ্বারা পরস্পর গাত্রে লিখন ও কাণাকাণি করিয়া কমিটীর কার্য্যারম্ভ ও মজলিস গরম হইল। রঘুবীর আর ফেরার নাই; পচা পুখুরের পাণি সেওলা লেপিত অঙ্গ-

সহ রঘুবীর বৈঠকসম্মুখে করযোড় হইয়া বসিয়াছে, মধ্যে মধ্যে আসনের নিকটে তলব হইতেছে ও নিলামের ডাকের মত দারগার দাবি চড়িতেছে, বাড়িতেছে। দেওয়ানজি মহাশয়ের নিঃস্বার্থ মধ্যস্থলী। রঘুবীর জানিতেছে তিনি পরম শুভকারী, দারগা জানিতেছেন তিনি কেবল শতকরা ১০ টাকা অংশের অংশী। এখন এক দুই, একশ রূপেয়া তিন—ডাক থামিল। রঘুবীরকে চঞ্চল দেখিয়া দেওয়ানজী কহিলেন "ডাক বন্ধ হইলে আর ফিরে? সরকারের হুকুম? বলে হাকিম ফিরে তবু হুকুম ফিরে না।" রঘুবীরের চক্ষু স্থির, তাহার কুঁড়ের চার কোণ খুঁজিলে ত এক কড়া কাণা কড়ি পাইবার যো নাই—কিন্তু এ দিকে টাকাতেই কলম চলে, টাকাতেই মথ খুলে, টাকাতেই সত্য ঢাকে, মোকদ্দমা উড়ে, টাকা না হইলে রিপোর্ট কেমন করে খতম হয়? দেওয়ানজি রঘুবীরকে লইয়া আবার আর এক ঘরে উপস্থিত। "টাকার কি?" "ওরে টাকার কি?" "টাকা?" "টাকারে?" "ওরে টাকা?" এরূপ কয়েকটী গোল গোল কথাতেই রঘুবীরের মাথাটী টাকা টাকায় সম্পূর্ণ হইল, টাকা টাকা করিয়া ঘুরিতেছে বোধ হইল—কহিল "দেওয়ানজী মহাশয়, আপনি রাখুন দেওয়ানজি মহাশয়?" দেওয়ানজি কহিলেন তোর কয় বিঘা জায়গির?

রঘু। ৩২ বিঘা।

দেওয়ানজি বলিলেন তবে ভাবনা কি? আমিই টাকা দিচ্ছি, আমার খাতায় লিখে পড়ে নিচ্ছি, তুই একটা সৈ করে দে, আর না দিবিই বা কেন? আমি কি পর? পর রে পর? তোর মিত্র না শত্রু? এক দিকে রঘুবীরের জায়গিরটে দেওয়ানজির হস্তগত অন্য দিকে সে চির অনুসারী ক্রীত দাস হইল।

এই সময় আর একটি ব্যাঘাত উপস্থিত। দারগা সাহেব রিপোর্ট করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি একটী সংবাদ পাইয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল। রঘুবীরের বুড় শ্বশুর শঙ্কর সর্দ্দার বাঁকিয়া বসিয়াছে কন্যাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া "খুন" "খুন" বলিতেছে, তাহার মাথায় খুন চড়িয়া গিয়াছে, পূজা করিয়া স্নিগ্ধ করিতে হইবেক, মন্ত্র বলে খুন ঝাড়িতে হইবে, তবে খুন নামিবে, না হইলে দারগা যাহা ধরন সে খুন খুন করিয়া খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে উপস্থিত হইবেই হইবে। একজন পদাতিক আসিয়া এই সংবাদ কহিতে কহিতে আর একজন আসিল। দারগা কহিলেন "খবর কি?"

প। খবর! শঙ্কর সর্দ্দার জলপান বেঁধে নদী পার হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ কোলার মাঠ পাছু করলে।

দেওয়ানজি শঙ্করকে কখন দেখেন নাই। জিজ্ঞাসিলেন "লোকটা কেমন?"

প। কেমন? তাল পাতের সিপাই, এক চক্ষু অন্ধ, উদরপীড়ায় বিব্রত কিন্তু কথার বড় আঁট, স্থির লোক হুজুর।

সে। উদর পীড়ায় বিব্রত! মার দিয়া। যখন বেদনায় কাতর হবে শর্ম্মার হাতে আস্‌বে—এই এল আর কি, এল—লাউসেন দত্তকে ডাক, আর উদরাময়ের পাক তেল এনে রাখ—তবে রে এক জন দৌড়! ঔষধের নাম করে ফিরিয়ে আন। আর তাতে না আসে—দৌড়, পথে যেখানে পাবি ধরবি, বগলে দাবিয়ে ধরবি আর হাজির করবি—যা দৌড়—দেখ্‌বো ধ'রে চিস্ কি, হাজির করেচিস। হাজির করলি?

পদাতিক দৌড়িল, দারগা সাহেব ও দেওয়ান্‌জি পাশাপাশি করিয়া বসিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে আমাদের গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তও পৌঁছিলেন। তিনি কেবল শিক্ষক নহেন, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তাঁহাকে কেহ শুভঙ্কর জানিত, কেহ ধন্বন্তরি বলিত, লম্বাকার দত্তজ মহাশয় লতিয়ে লতিয়ে আসিলেন, গজাননের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইলেন, একপার্শ্বে বসিলেন। যেমন অপরাপর গৃহরাজিমধ্যে জগন্নাথের মন্দির, নগরের অট্টালিকামধ্যে নূতন পোষ্ট আফিস গৃহের চূড়া, তেমনি অপর লোকের মধ্যে দত্তজ মহাশয়ের পক্ক কেশসংযুক্ত উন্নত মস্তক; আর সকলের মস্তক তাঁহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে রহিল, দত্তজ মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে হইলে সকলকে আকাশের দিকে চাহিতে হইল। দত্তজ মহাশয় বসিবা মাত্র উড়ানির এক কোণের একটি বড় পুটলি খুলিলেন, তাহাতে জড়িবড়ি খল নুড়ি ও কতকগুলি পুরাণ কাগজের মোড়ক খুলিয়া সামনে সাজাইলেন, আবার এখনকার এবালিসি ঔষধ পানের রস, তুলসি পাতা, আদা ও মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে দূরে একটী চীৎকার শব্দ শুনা গেল। "দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের" "দোহাই মেজেষ্টার সাহেবের রক্ষাকর।" দেওয়ান্‌জি শব্দ শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন—এই শব্দ তাঁহার জয়সূচক ধ্বনি। মনে জানিলেন শিকার হস্তগত, শিকার শঙ্কর সর্দ্দার পদাতিকের বগলে শূন্যে শূন্যে আসিতেছে, চলিতে হইতেছে না, ঔষধ খাইয়া আরাম লাভ করিবে তাহাও জানিয়াছে, মোকর্দ্দমা রফা হইবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; রাণী পটিবে, টাকা গাঁটে বাঁধিবে, সকল মনে মনে জানিতেছে গুণিতেছে, তবু চীৎকারে গগন ভেদ করিতেছে, এ চীৎকারের মানে আছে, দর বাড়াইতেছে। যখন যাহাকে দরকার তখন তার দর বাড়ে, দর বাড়াইতে কে ত্রুটি করে? যাহা হউক কিঞ্চিৎকাল মধ্যে দেওয়ান্‌জির নিকট শঙ্কর সর্দ্দার আনীত হইল। দেওয়ান্‌জি দত্তজ মহাশয়কে ইঙ্গিত করিলেন। লাউসেন মহাশয় শঙ্করের সর্ব্বাঙ্গে ধূলা ছড়াইয়া দুই একটী ফুঁক দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাকতেল মাখাইতে কহিলেন ও শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিলেন ও পরে কহিয়া উঠিলেন, আমি দেখ্‌চি তুই ভাল হবি; তবে কি না "উপচার বিনা ব্যাধি ঔষধ সেবনং বৃথা"

কেবল ঔষধে কিছু হবার নয় এতে গন্দচাই, পদচাই, ঝাড়নচাই ফুকনচাই! দেওয়ানজি কহিলেন সব হবে, শঙ্কর বাহাদুর এত দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে হয় না? পেটের পীড়া আবার ছার পীড়া। কয় দিন থাকে! দুদিন মাখ থাক, পুরাণ চালের অন্ন খাও, মদগুর সৎস্যের ঝোল আহার কর। ব্যাম? গেল রে গেল এই গেল আর থাকে? লাউ-সেন সেই স্বপ্নাদ্য ঔষধটা ভুল না—ওকে খাওয়াব ভাল করব করবই করব। দেওয়ানজি কার্য্যসাধন জন্য সকলের স্তুতি করিতেন তাহাতে তাঁহার অপমান জ্ঞান ছিল না। মুহূর্ত্তে শঙ্কর তাঁহার দাস হইল মোকর্দ্দমা আর উড়াইবার দেরি কি?

বৃত্রসংহার।

তৃতীয় সংখ্যা।

এখন আমরা বৃত্রসংহার বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বৃত্রসংহারে প্রবেশ করিয়াই আমরা কাব্যের দ্বারে শক্তির বিশাল মূর্ত্তি দেখিতে পাই। চতুর্দিকে শক্তির বিকাশ। সম্মুখে, মনুষ্যের শক্তির অতীত দৈবশক্তি—সূর্য্য, বহ্নি, মরুৎ, পাশী, স্বয়ং দণ্ডধর কৃতান্ত। তদুপরি দৈবশক্তি-বিজয়ী, আসুরিক বল। অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শফরীর ন্যায়—আমরা এই শক্তিসাগরে ডুবিয়া, অস্থির, দিশাহারা হই; কাব্যের মর্ম্মার্থ কিছুই গ্রহণকরিতে পারি না। যেমন সমুদ্রস্থ ক্ষুদ্র মৎস্য সাগরবেলার ক্ষেম সন্ধান পায় না—আমরা এই কাব্যমধ্যে প্রথমে শক্তির সীমা দেখিতে পাই না। শক্তিই শক্তির সীমা স্বরূপ দেখিতে পাই—অন্য সীমা দেখিতে পাই না। দেখি, দৈবশক্তির শেষ আসুরিক শক্তিতে, আসুরিক শক্তির বোধ দৈবশক্তিতে। তবে বাহুবল কি এই জগতে অপ্রতিহত? কি মর্ত্ত্যে, কি স্বর্গে বাহুবলই কি বাহুবলের শেষ দমন কর্ত্তা? এরূপ সিদ্ধান্তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—জগৎ কেবল দুঃখের আগার বলিয়া বোধ হয়, এবং স্রষ্টার সৃষ্টি কেবল নিষ্ঠুরের পীড়নকৌশল বলিয়া বোধ হয়।

এই প্রশ্নের উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞান সহজে দিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের সামান্য ভাগ দর্শন ও বিজ্ঞানের আয়ত্ত। তাহাদিগের ক্ষমতা ক্ষুদ্র পরিধিমধ্যে সঙ্কীর্ণীভূতা—তাহারা প্রমাণের অধীন। যতদূর প্রমাণ আছে—ততদূর দর্শন বা বিজ্ঞান যাইতে পারে; প্রমাণরজ্জু ফুরাইলে, তাহাদিগের গতি বন্ধ হয়। তাহারা বলে ঈশ্বর নাই; ধর্ম্ম নাই; উভয়েরই প্রমাণাভাব, বাহুবলই বাহুবলের সীমা!

এইখানে কাব্য আসিয়া, আপনার উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যাহা বিজ্ঞান ও দর্শনের অতীত,তাহা কাব্যের আয়ত্ত। যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান বা দর্শন দিতে অক্ষম,কাব্য তাহাতে সক্ষম। যাহা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কবি নিজপ্রতিভাবলে, দূরপ্রসারিণী মানসী দৃষ্টির তেজে, তাহা পরিষ্কার দেখিতে পান। সে দৃষ্টি ভ্রান্তিশূন্যা, কেন না তাহা নৈসর্গিক—ঈশ্বরপ্রেরিত। কবিরাই প্রধান শিক্ষক—জগৎগুরুশ্রেণীর মধ্যে গেলেলিও বা বেকন অপেক্ষা সেক্ষপীয়রের উচ্চ স্থান, লাপ্লাস বা কোমৎ অপেক্ষা ওয়াল্‌টার স্কটের অধিক মহিমা।*

এই দৈব এবং আসুরিক শক্তির ভীষণ অবতারণা নূতন নহে। এবং বৃত্রবধও নূতন নহে। বাল্যকাল হইতে আমরা এ সকল জানি। পুরাণ,উপপুরাণ দেবাসুরের শক্তিমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ—বৃত্রসংহার কাব্য সেই মহাবৃক্ষের একটি পল্লব মাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। কেন রচিত হইল? বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্য কি? অনেকের বিবেচনায় এরূপ কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্য, কয়েকটি উজ্জ্বলচিত্রের একত্র সমাবেশ—কতকগুলি সুপদ্যের একত্রে সঙ্কলন মাত্র। আমরা বিগত দুই সংখ্যায় যে কবিতা পুষ্পহার গাঁথিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছি, অনেকের বিবেচনায় তাহাই কাব্যের উদ্দেশ্য এবং সফলতা। এরূপ অনেক কাব্য আছে। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ ভিন্ন অপরে সচরাচর এইরূপ কাব্য প্রণয়নে ব্যস্ত। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যও আছে। "পলাশির যুদ্ধ" একটি উদাহরণ। এখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, কিন্তু কতকগুলি সুমধুর, ওজস্বী গীতিকাব্যের সঙ্কলন মাত্র। বৃত্রসংহারের লক্ষ্য মহত্তর—সুতরাং উচ্চতর স্থান ইহার প্রাপ্য।

প্রথমে কাব্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অপরিমেয় দৈব ও আসুরিক শক্তির "ঘাত প্রতিঘাতে" কিছু ব্যতিব্যস্ত হই—কোন্ পথে কাব্যস্রোত চলিতেছে,শীঘ্র বুঝিতে পারি না। প্রথম যখন নৈমিষারণ্যে অসহায়া শচীকে অসুরগণ ধরিতে যায়, তখন একটু আলো দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, শক্তির অত্যাচার। প্রথম খণ্ডের শেষে গিয়া, যখন শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা স্বর্গীয়

* কাব্যের উদ্দেশ্য যে শিক্ষা ইহা সচরাচর বোধ হয় স্বীকৃত নহে। বিলাতি সমালোচকদিগের প্রচলিত মত এই যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ছাড়িয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কাব্য অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য বটে এবং অসত্যও বটে। কি প্রকারে সত্য এবং কি প্রকারে অসত্য, শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ, উভয়ের সঙ্গে কাব্যের কি সম্বন্ধ, সবিস্তারে তাহা বুঝান নহে। তাহা বুঝাইতে আর একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। স্থানান্তরে সে তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচন করা গিয়াছে।

বাহুস্তম্ব জ্বলিতে দেখি, তখনই বুঝিতে পারি কাব্যের মর্ম্ম কি—শক্তির অত্যাচারেই শক্তির অধঃপতন।

বাহুবলই কি বাহুবলের সীমা? এ প্রশ্নের এখন উত্তর পাইলাম। বাহুবল বাহুবলের সীমা নহে। বাহুবলের অসদ্ব্যবহার বা অত্যাচারই বাহুবলের সীমা। বাহুবল ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে স্থায়ী, অত্যাচার বা অধর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে বিনষ্ট হয়। মনুষ্যজীবন ইহার নিত্য উদাহরণস্থল। সমাজের গতি ইহার উদাহরণে পরিপূর্ণ। ইতিহাস কেবল এই কথাই কীর্ত্তন করে—হস্তিনার কুরুগণ হইতে পুনার মহারাষ্ট্রগণ পর্য্যন্ত—টার্কুইনের রোম হইতে অদ্যকার টর্কি পর্য্যন্ত, এই মহাতত্ত্বের ঘোষণা করে। কথা পুরাতন, কিন্তু আজিও মনুষ্য ইহা বুঝিল না। মনে করে শক্তিই অজেয়, কেন না শক্তি শক্তি। কিন্তু কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে পান শক্তি অকিঞ্চিৎকর অনিত্য,—শক্তিও অশক্ত। ধর্ম্মই নিত্য, ধর্ম্মই বল—শক্তি তাঁহার সহায় মাত্র।

এই নৈতিকতত্ত্বের উপর আরোহণ করিয়া, মনুষ্যজীবনের এই সমস্যার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, কবি বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ না ভাবেন, যে এই নৈতিকতত্ত্বের একটি উদাহরণ অলঙ্কারবিশিষ্ট করিয়া ছন্দোবন্ধে উপাখ্যাত করা তাঁহার উদ্দেশ্য। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্যও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্দর্য্য? কোন্ আকার ধরিয়া সৌন্দর্য্য কাব্যমধ্যে অবতরণ করিবে? যদি কাব্য না হইয়া ভাস্কর্য্য বা চিত্রবিদ্যা হইত, তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইত। রতির রূপ বা কন্দ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত—নন্দনকাননের শোভা, বা সুমেরুর মাহাত্ম্য পটে বিকসিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নহে—মনের সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্য। কেবল পর্ব্বতের শোভা, রমণীর রূপ, বা আকাশের বর্ণ, ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য গঠিত হইতে পারে না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশ্য। মানসিক বা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব কার্য্যের বিবৃতি লইয়া এসকল কাব্য গঠিত করিতে হয়। যে কার্য্য সুন্দর, তাহাই কাব্যের বিষয়। কিন্তু কোন্ কার্য্য সুন্দর? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে "সৌন্দর্য্য কি?" তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তাহার স্থান নাই—তাহার সময় এ নহে। তবে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কোন মহদ্ধর্ম্মের সঙ্গে যে কার্য্য কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। কার্য্যটি নীতিসঙ্গত না হইলেও হইতে পারে, তথাপি কোন সুপ্রবৃত্তি বা সুনীতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা চাহি। সুন্দর কার্য্যই সুনীতি সঙ্গত। অতিভীষণ কার্য্যও

এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা যায় যে কেবল ধর্ম্মানুরোধেই পরশুরাম মাতৃহত্যারূপ মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই মহাপাপও সুন্দর হইয়া উঠে।

কার্য্য অনেক সময়েই স্বতঃ সুন্দর হয় না। অন্য কার্য্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর হয়। রাম কর্ত্তৃক সীতা ত্যাগ স্বতঃ সুন্দর নহে, অনেক ইতরব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু রাম সীতার পূর্ব্ব প্রণয়, রামের জন্য সীতা যে দুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যে কারণে রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াই সীতাত্যাগ সুন্দর কার্য্য।—"সুন্দর" অর্থে "ভাল" নহে। অতি মন্দ কার্য্যও সুন্দর হইতে পারে। এই রামকৃত সীতাবর্জ্জন ও পরশুরামকৃত মাতৃবধ ইহার উদাহরণ। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্য্যের সৌন্দর্য্য, তখন সে সৌন্দর্য্য ঐ সম্বন্ধের। আরও বিবেচনা করিতে হইবে যে কার্য্যপরম্পরার যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য। যে গুলি নিত্য সম্বন্ধ সে গুলি নিয়ম বলিয়া পরিচিত। ঐ নিয়ম গুলিই নৈতিকতত্ত্ব। যদি কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধটি সৌন্দর্য্যের আধার হয়, তবে ঐ নৈতিকতত্ত্ব গুলিও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক অনেক গুলি জটিল ও দুরূহ নৈতিকতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমাময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য নৈতিকতত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।

মনুষ্যজীবন* সৌন্দর্য্যের উৎস—অতএব মনুষ্যজীবনই কাব্যের বিষয়। কোটিরূপধারী মনুষ্যজীবন কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না—এই জন্য কাব্যমাত্রে মনুষ্যজীবনের এক একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয়। রামায়ণে রাজধর্ম্ম— মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে ক্রোধ, এবং মিলটনে অপরাধ। রোমিও জুলিয়েটে যৌবন, মাকবেথে লোভ, শকুন্তলায় সরলতা, উত্তরচরিতে স্মৃতি। সকল গুলিই নৈতিক বা মানসিকতত্ত্ব। তদ্বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই।

হেমবাবু মনুষ্যজীবনের যে মূর্ত্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর। বাহুবলের শাস্তা ধর্ম্ম; ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য; পুণ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে দেখ, আলোকসম্মুখী রত্নের ন্যায় ইহা জ্বলিতে থাকে। হেমবাবু এই তত্ত্বকে

* কাব্যের নায়ক মনুষ্যকল্প দেবতা হইলেও এ কথার কোন ব্যত্যয় নাই।

এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, যে ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল। ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের আলয়ে নর্ম্মদার অপমান দেখিয়া, ত্রিদেব—ত্রিমূর্ত্তিতে পরমেশ্বর—অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।

বাহ্য বা মানসিক জগতে এমন কোন নিয়মই নাই, যে তাহা অবস্থাবিশেষে একাই কার্য্য করে। কি বাহ্যিক কি মানসিক নিয়ম অনুক্ষণ অন্য কোটি নিয়ম কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত, সংযত, নিষ্ক্রিয়, নিষ্ফলীকৃত, বিকৃত হইতেছে। অতএব একমাত্র নিয়মের অধীন যে কাব্যের কার্য্য তাহা মনুষ্যজীবনের অনুরূপ চিত্র নহে—অনুরূপ না হইলেই অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক হইলেই অসুন্দর। এ কথা বৃত্রসংহারেও প্রমাণীকৃত। ধর্ম্মের সঙ্গে বাহুবলের যে সম্বন্ধ তাহা কাব্যের স্থূল-চর্ম্ম—মেরুদণ্ড। কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর কতকগুলি বিষয় আছে। প্রথম, দেশবাৎসল্য, দেবগণের স্বর্গোদ্ধারের ইচ্ছায় পরিণত, চিত্রিত, এবং বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় তত্ত্বটি, আমরা লেডিমাকবেথে দেখিয়াছিলাম—বৃত্রসংহারেও দেখিলাম। লোকে যাহাকে সচরাচর বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—সেক্ষপীয়রে তাহা লেডি ম্যাকবেথ—বৃত্রসংহারে তাহা ঐন্দ্রিলা। উভয়েই একটি অপরিবর্ত্তনীয় সামাজিক শক্তির প্রতিমা। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বটে, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য্য সচরাচর গৃহীত হয় কি না সন্দেহ। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থূল বলিয়া প্রলয়ঙ্করী নহে; স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থূল নহে—পুরুষের বুদ্ধি দূরগামিনী কিন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অধিকতর সুতীক্ষ্ণা। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অমার্জ্জিতা বা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রলয়ঙ্করী নহে; যে দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে তুল্য শিক্ষিত, উভয়ের বুদ্ধি যে সকল দেশে তুল্য রূপে মার্জ্জিত, যে সকল দেশে মিসেস্ মিল, মাদাম রোলন্দ বা মাদাম দেস্তাল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সকলদেশেও স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। লক্ষ্মী চঞ্চলা; সরস্বতী মুখরা, সতী আত্মঘাতিনী, রুদ্রাণী রণোন্মত্তা, বিবসনা। বাল্মীকির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জগতে, দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতা, সুবর্ণমৃগের জন্য অধীরা। যিনি পরে রাবণের ঐশ্বর্য্যের লোভ সম্বরণ করিলেন, অশোকবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন, তিনি একটি মৃগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। ঐন্দ্রিলা স্বর্গের সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও শচীকে অপমান করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের দয়া অল্প নহে, কিন্তু প্রতিযোগিনীর উপর স্ত্রীলোকে যেরূপ নিষ্ঠুর, বন্যপশুও তাদৃশ নহে। এই সকল কথা হেমবাবু ঐন্দ্রিলাতে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক। এই কাব্যে প্রথমতঃ শক্তি, অচিন্তনীয়, অপরিমেয় কিন্তু অনন্ত শক্তি নহে। দেবগণ ভুবনসংহারে সক্ষম, তথাপি বৃত্র

ও বৃত্রপুত্রের বীর্য্যের অধীন। বল দেবগণকেও পীড়িত করিতে সক্ষম, তথাপি মরণাধীন। বৃত্রের শক্তি পুণ্য জাত, ঈশ্বরপ্রেরিত—ঈশ্বরেরই শক্তি। ত্রিশূল তাহার রূপ, স্বর্গের আধিপত্য তাহার ফল। এই শক্তির তিন শত্রু। প্রথম শত্রু সর্ব্বসংহর্ত্তা কাল. ব্রহ্মার দিবস বৃত্রশক্তির জীবন, তদবসানে সে শক্তি অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু কাল এখনও সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃত্র-শক্তির নিকট উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় শত্রু দেবতার স্বর্গবাৎসল্য, কিন্তু দেবতা ঈশ্বরসৃষ্ট ঈশ্বরপালিত, ঐশীশক্তির নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। তৃতীয় শত্রু অধর্ম্ম; ধর্ম্মরূপী ঈশ্বর, অধর্ম্মের সহিত ঐশীশক্তি—শিবের ত্রিশূল—একত্রে থাকিতে পারে না। ঐন্দ্রিলার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অধর্ম্ম প্রবেশ করিল, অমনি শিবশূল গগনপথে শ্বেত-বাহু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, ত্রিদেবশক্তি ইন্দ্রায়ুধে প্রবেশ করিল। অধর্ম্মে অকালে বৃত্রশক্তি বিনষ্ট হইল।

বৃত্রসংহারের নায়কনায়িকা সকলে অমানুষিক হওয়াতে ইহার ফলসিদ্ধি আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গভূমে বলই অধিনায়ক—ক্ষুদ্র মনুষ্যের বলের অপেক্ষা দেবাসুরের বল সে কল্পনাস্পষ্ট তর করিয়াছে। কিন্তু কেবল অমানুষিক শক্তিই তাঁহার প্রয়োজনীয়। যে সকল তত্ত্ব কাব্যের বিষয় তাহা মানবচরিত্রে নিহিত; অতিমানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি না। এই জন্য যেখানে মনুষ্যপ্রণীত কাব্যে দেবগণের অবতারণ দেখা যায় সেইখানেই দেবগণ মনুষ্য কল্প,—মানুষের ছাঁচে ঢালা। মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, পারাডাইজ লষ্টে, সর্ব্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মনুষ্যোপম, মানুষিক রাগ দ্বেষ দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। হেম বাবুর সুরাসুর সুরী অসুরীগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য। বাহ্যচিত্র মনুষ্যালোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মানবানুকারী। তাঁহার সুরাসুরগণ অতি প্রকাণ্ড শরীরী ও শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র।

সকল নায়ক নায়িকার মধ্যে শচীর চরিত্রই মনুষ্যচরিত্র হইতে কিছু দেবতা-প্রকৃত,—এইখানেই দৈব চরিত্রের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই শচীচরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মহিমা সমালোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর ন্যায় পুত্রবৎসলা—মানুষীর ন্যায় দুঃখবিবশা, স্মৃতিপীড়িতা—অবনীর কঠিন মাটী তাঁহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের সহিত মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমিষারণ্যে তাঁহার মর্ম্মদাহ করে—তথাপি শচী বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢ়সংস্থাপিতা, ধৈর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে মহামহিমাময়ী। সকল নায়ক নায়িকাদিগের মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ উন্নত স্ত্রীচরিত্র কোথাও নাই—মেঘ-

নাদবধের প্রমীলা ইহার সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্শ্বে ইন্দুবালা দেবদারুতলায় নব মল্লিকার ন্যায়, সিংহীর অঙ্কলালিত হরিণশিশুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় সুকুমার। শচীর পর, ইন্দুবালার চরিত্রই মনোহর। বস্তুতঃ কাব্যমধ্যে, নায়িকাদিগের চরিত্র গুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। শচী, ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলা এবং চপলা সকলেই সুচিত্রিত এবং সুরক্ষিত। নায়কদিগের মধ্যে কেবল রুদ্রপীড়ের চরিত্রই পরিস্ফুট, তাহাও অভিমন্যু ও হেক্‌টরের ছাঁচে ঢালা। বাঙ্গালি কবিরা প্রায়ই স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুপটু; প্রমীলাই মেঘনাদবধের প্রধান গৌরব। বস্তুতঃ বাঙ্গালি লেখক যে স্ত্রীচরিত্রে অধিক নিপুণ, পুরুষচরিত্র প্রণয়নে তাদৃশ নিপুণ নহে, তাহার কারণ সহজে বুঝা যায়। বাঙ্গালার স্ত্রীগণ, রমণীকুলের গৌরব; বাঙ্গালার পুরুষগণ পুরুষ নামের কলঙ্ক। অন্য কোনদেশেই বাঙ্গালিমহিলার চরিত্রের ন্যায় উন্নত স্ত্রীচরিত্র নাই—অন্য কোন দেশেই বাঙ্গালি পুরুষের মত ঘৃণাস্পদ কাপুরুষ নাই। কবিগণ জন্মাবধি উন্নত স্ত্রীচরিত্র আদর্শ প্রত্যহ দেখিতে পান, জন্মাবধি প্রত্যহ কাপুরুষ মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন। যে সকল সংস্কার মাতৃদুগ্ধের সহিত পীত হয়, তাহা চেষ্টা করিলেও জয় করা যায় না। বাঙ্গালি লেখক স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুনিপুণ, পুরুষচরিত্রে অনিপুণ কাজে কাজেই হইয়া পড়েন। তবে যখন বাঙ্গালি পুরুষের দোষমালা গীত করিতে হইবে, তখন বাঙ্গালি কবির পুরুষচিত্রে নৈপুণ্যের অভাব থাকে না; পুরুষ বানরের চিত্র প্রণয়নে বাঙ্গালির তুলী অভ্রান্ত,কেন না আদর্শের অভাব নাই। দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত পুরুষচরিত্র সকল অসাধারণ উজ্জ্বলতাপূর্ণ। বাবুরাম বাবু, রাম দাস, বা জলধরের চরিত্র আকাঙ্ক্ষার অতীত। বানরকে সম্মুখে রাখিয়া সুনিপুণ ভাস্কর উত্তম বানরমূর্ত্তি গড়িতে পারে, কিন্তু কখন দেবতা গড়িতে পারে না। দেব গড়িতে বানর হয়, বাঙ্গালাদেশে ইহা প্রাচীন কথা। হেম বাবু যে নায়ক চরিত্রে কৃতকার্য্য হয়েন নাই, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই। জীবন্ত আদর্শের অভাবে, বিদেশী পুরাবৃত্তে তাঁহাকে আদর্শ খুঁজিতে হইয়াছে। রুদ্রপীড়ের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ পড়িতে ইন্দ্রের চরিত্রে বেয়ার্ড বা অন্য ইউরোপীয় মধ্যকালিক অশ্বারোহী বীরকে মনে পড়ে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে যে সকল দেশে পুরুষচরিত্র বলবত্তর, সে দেশের সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষচরিত্র প্রবলতর হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় সাহিত্য এ কথার সমর্থন করে। হোমর হইতে সদ্যঃপ্রসূত নবেল খানি পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ। আমরা কেবল ইং-

রেজি সাহিত্যেরই বিশেষ উল্লেখ করিব কেন না অন্য দেশের সাহিত্যের বিষয়ে কথা কহিবার বিশেষ অধিকারী নহি। ইংরেজি সাহিত্যের কথা পাড়িলে আগে সেক্ষপীয়রের নাটক ও স্কটের উপন্যাস গুলি মনে পড়ে। এই দুই কাব্যশ্রেণীই প্রকৃত চিত্রাগার—আর সকলই ইহার কাছে সামান্য। স্কটের উপন্যাসে পুরুষ-চরিত্র প্রবল—স্কট যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়নে সুদক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রণীত চরিত্র গুলি স্ত্রী পুরুষে বিভাগ করিলে দেখা যাইবে কোন দিগ্‌ ভারি। একা রিবেকা পঁচিশখানা কাব্য আলো করিতে পারে না। সেক্ষ-পীয়রের কথা স্বতন্ত্র; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বক্ষম। তাঁহার তুল্য সর্ব্বজ্ঞতা মনুষ্য-দেহে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার লেখনীর কাছে স্ত্রীপুরুষ তুল্য হওয়াই সম্ভব। বাস্তবিক তাদৃশ তুল্যতা আর কোথাও নাই। তথাপি তাঁহারই স্বদেশী কবি কর্তৃক কথিত হইয়াছে—

"Stronger Shakerpeare felt for
man alone."

বৃত্রসংহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে বাকি রহিল। অবকাশ হয় ত সময়ান্তরে বলিব।

তর্কসংগ্রহ

চতুর্থ তর্ক—অদৃষ্ট।

আমরা জগতের জনক ও উপাদান কারণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মতগুলি এক প্রকার সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে যাহার সাহায্যে এই বিশ্বরাজ্যের বৈচিত্র সম্পাদিত হইতেছে জগতের সেই প্রধান সহকারী কারণ অদৃষ্টের বিষয় নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে কথিত হই-তেছে।

নৈয়ায়িকদিগের মতে এই জগৎনির্ম্মাণ কার্য্যে অদৃষ্ট ঈশ্বরের একটি দক্ষ ও সুনিপুণকার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ। ইহা দ্বারাই বিশ্বে এতাদৃশ মনোহর বৈচিত্র সম্পা-দিত হয়, ইহার কৌশলেই তেজোরাশি সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণ, হিমালয় প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত এবং সুতীক্ষ্ণ কণ্টক প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সকল যথা-নিয়মে সৃষ্ট হয়। অধিক কি রজঃকণা হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত, জলবিন্দু হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে দিক্‌হস্তী পর্য্যন্ত, সফরী হইতে রাঘব পর্য্যন্ত, বিস্ফুলিঙ্গ হইতে সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত এবং মক্ষিকা হইতে গরুত্মান্‌ পর্য্যন্ত জগতে যে সকল পদার্থ আছে তৎসমুদায়ই অদৃষ্ট-প্রভাবে নির্ম্মিত। অদৃষ্ট প্রভাবেই জীবগণের হৃদয়ে রাগদ্বেষাদিবৃত্তির উদয়

হয়। অহি নকুল, অশ্ব মহিষ প্রভৃতি জন্তু-গণের মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈরিতা, তাহার প্রতি একমাত্র অদৃষ্টই কারণ। মনুষ্য-বালকের কি নিমিত্ত প্রথমেই অন্নেতে রুচি হয়? মৃগশিশুরা কাহার দ্বারা শিক্ষিত না হইয়াও কি কারণে স্বয়ং তৃণ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এরূপ সকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দেখা যায় না। নৈয়ায়িকগণ বলেন কর্ম্ম মাত্রের যেরূপ এক একটি কারণ আছে সেইরূপ কর্ম্ম মাত্রের এক একটি ফল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে লোকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কিন্তু অনেক স্থলে কর্ম্মের ফল লক্ষিত হয় না। অতএব যে স্থলে কর্ম্মের ফল লক্ষিত হয় না সেই স্থলে অদৃষ্টরূপ ফল কল্পনীয়। অর্থাৎ ইহলোকে যে সকল ফল দৃষ্ট হয় না তাহারা অদৃষ্ট রূপে পরি-গণিত হইয়া স্বর্গাদি ভোগ ও পরজন্মে সুখ দুঃখাদির কারণ হয়। তথাচ বৈশে-ষিক দর্শনকার কণাদমুনি বলিয়াছেন।*

"দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজন মভ্যুদয়ায়। বৈ ৬অ প্র আ ১সূ।

কার্য্য দুই প্রকার প্রথম। যাহাদের ফল দৃষ্ট হয় যেমন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি, দ্বিতীয় যাহাদের ফল দৃষ্ট হয় না যেমন যজ্ঞ দান প্রভৃতি। যেখানে কোন ফল দৃষ্ট হয় না সেইখানে অদৃষ্ট রূপ ফল কল্প-নীয়। যদি বল যজ্ঞাদি এজন্মে সম্পন্ন হইল তাহার ফল পরলোকে হইবে এ বড় অসঙ্গত কথা। সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে জানিতে পারিবে যে, সকল ক্রিয়ার ফল সদা উৎপন্ন হয় না। বীজবপন, ভূকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া সকল যেমন বিলম্বে ফল উৎপাদন করে তেমনি দান যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া সকলও যে বিলম্বে ফল উৎপাদন করিবে তাহাতে নূতনতা কি? ফল কথা যাগাদির সহিত তাহার ফল স্বর্গাদির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। যাগাদি নাশ হইবামাত্র একটি অপূর্ব্ব† উৎপন্ন হয় সেই অপূর্ব্ব হইতে স্বর্গাদি ফল জন্মে।

যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে অদৃষ্টরূপ ফলের উৎপত্তির বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় উদয়-নাচার্য্য এই যুক্তি দিয়াছেন যে—

"বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো ন দুঃখৈক-
ফলাঽপিবা।
দৃষ্টলাভফলা বাঽপি বিপ্রলম্ভোঽপি
নেদৃশঃ।" কু, প্র, স্ত, ৮কা।

যদি যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্ফল হইত তবে পরলোকার্থী মনুষ্য মাত্রেই কি নিমিত্ত

---

* নৈয়ায়িক আর বৈশেষিকদিগের মধ্যে অল্পই বিভিন্নতা; এমন কি বৈশে-ষিক দর্শনকে উন্নত ন্যায়দর্শন বলিলে হয়; সুতরাং এখানে বৈশেষিক সূত্রের দৃষ্টান্ত অন্যায় হয় নাই। পরেও অনেক স্থলে দেখান যাইবে।

† আমরা অতিদুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অপূর্ব্ব শব্দের সদৃশ প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় দেখা গেল না এবং ইহার অর্থও প্রকাশ করা গেল না। পাঠকগণ ইহাকেও অদৃষ্টের সমান বুঝিবেন।

এতাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। যদি বল যজ্ঞাদি নিষ্ফল কেন? অর্থনাশ শারীরিক ক্লেশ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহা অতি অযৌক্তিক কথা। কারণ,সকলেই অভীপ্সিত সুখাদি লাভের জনাই আযাসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অনভিমত দুঃখাদি লাভের জন্য নহে। ঐহিক সম্মানাদি প্রাপ্তিকেও যজ্ঞাদি কার্য্যের ফল বলিতে পার না। কারণ, যাহাদিগের অণুমাত্র ঐহিক সম্মানাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা নাই এরূপ মনস্বী ব্যক্তিকেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা গিয়াছে। যদি বল কোন বঞ্চক ব্যক্তি লোককে ক্লেশ দিবার জন্য এই রূপ যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিযাছে। তাহাও হইতে পারে না। দেখ, যে ব্যক্তি প্রথমে যজ্ঞাদির সৃষ্টি করিযাছে সে স্বয়ং অবশ্য ইহাদিগের অনুষ্ঠান জন্য শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। এখন বল দেখি পৃথিবীতে এমন বঞ্চক কে আছে যে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য আপনার নাসিকা ছেদ করে?

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, ভাল, যাগাদি, স্বর্গাদির হেতু হউক, কিন্তু কি নিমিত্ত তাহারা পরজন্মের সুখ দুঃখাদির কারণ অদৃষ্টের প্রতি হেতু হইবে। ইহার উত্তরে উদয়নাচার্য্য বলেন

"চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।
সম্ভোগো নির্ব্বিশেষাণাং ন ভূতৈঃ সংস্কৃতৈ রপি॥"

চিরবিনষ্ট যাগাদি হইতে যদি স্বর্গ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের দ্বারা পরজন্মের সুখ দুঃখের হেতু অদৃষ্টেরও উৎপত্তি হইতে পারে। আরও দেখ প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর তুল্যরূপ ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও তাহারা যখন পৃথক্ পৃথক্ সুখদুঃখাদির ভোগ করিতেছে তখন পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট ভিন্ন ইহার কারণ আর কিছুই দেখা যায় না।

ন্যায়মতে স্বর্গাদি ভোগরূপ যজ্ঞাদির অদৃশ্য ফল কেবল অদৃষ্ট নয়, নরকাদি ভোগের কারণ হিংসাদির অদৃশ্য ফলের নামও অদৃষ্ট। ভাষা পরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ বলেন—

"ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ ধর্ম্মঃ স্বর্গাদি সাধনং।
গঙ্গাস্নানাদি যাগাদিব্যাপারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ"

অদৃষ্ট দুই প্রকার, প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় অধর্ম্ম। ধর্ম্ম, গঙ্গাস্নান ও যজ্ঞাদির ফল স্বরূপ এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু। অধর্ম্ম, গর্হিত কর্ম্মের ফল ও নরকাদি প্রাপ্তির হেতু।

মহর্ষি গৌতম শরীরোৎপত্তির বিচার স্থলে এইরূপে অদৃষ্টের প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন।

" পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ"। ৩অ, ২আ, ৬৪সূ

" পূর্ব্ব শরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগ্বুদ্ধি শরীরারম্ভ লক্ষণা, তৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলস্যানুবন্ধঃ, আত্মসমবেতত্বেনাবস্থানং তেন প্রযুক্তেভ্যোভূতেভ্য স্তস্য (শরীরস্য) উৎপত্তিঃ" ভাষ্যম্

পূর্ব্বশরীরের বাক্য, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে সমবায়* সম্বন্ধে অবস্থান করে। সেই আত্মসমবেত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলকর্ত্তৃক প্রযুক্ত পঞ্চভূতের সংযোগে দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয়।

"পূর্ব্বকৃতস্য যাগদান হিংসাদেঃ ফলস্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপস্য অনুবন্ধাৎ (সহকারিভাবাৎ) তস্য শরীরস্যোৎপত্তিঃ" সূত্রবৃত্তিঃ।

পূর্ব্বশরীর কৃত দান যজ্ঞ হিংসাদির ফল যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহার সহায়তায় দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয়।

বৈশেষিক সূত্রকার আর একস্থলে বলিয়াছেন—

"অপসর্পণমুপসর্পণ মশিত পীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তর সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্ট কারিতানি॥" ৫অ ২আ ১৭ সূত্র।

অদৃষ্টবশেই মন আর প্রাণ একদেহের অপায় হইলে অপর দেহে প্রবেশ করিয়া তদুপযুক্ত ভোজন পান এবং কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। অর্থাৎ যতদিন অবধি অদৃষ্ট থাকিবে ততদিন অবধি এক দেহের নাশ হইলে অপর দেহের উৎপত্তি হইবে এবং তদুপযুক্ত ভোগও হইবে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে কর্ম্মানুসারে দেহান্তর প্রাপ্তি হইতে থাকে, কর্ম্মবশে মনুষ্যদেহের পর শৃগালদেহের প্রাপ্তি হইতে পারে এবং কর্ম্মবশেই শৃগালদেহ হইতে মনুষ্যদেহ হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এবিষয়ের বিশেষ নিরূপণ হইয়াছে।† ক্রমশঃ ভোগ করিতে করিতে অদৃষ্টের অভাব হইলে আর শরীরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, শরীরযন্ত্রণা নিবৃত্তির নামই মোক্ষ।

এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে অদৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্ম্মের ফল, এবং সেই অদৃষ্টবশে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে বিবেচনা কর দেহের সহিত সংযোগ লাভ করিয়া জীব অবশ্যই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় সুতরাং অদৃষ্টের নাশ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইল, আর অদৃষ্টের নাশ না হইলে মোক্ষপ্রাপ্তিও দুর্ঘট। ইহার

---

* সমবায় এক প্রকার নিত্য সম্বন্ধ (*Intimate Relation*) পরে ইহার স্বরূপ দেখান যাইবে। এই সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত বস্তুর নাম সমবেত।

† "ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা। প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপ বিপর্য্যয়ম্।" মনু।
কোন কোন মনুষ্য ইহজন্মকৃত পাপের দ্বারা কেহ কেহ বা পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের দ্বারা রূপের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়।

উত্তরে বৈশেষিক দর্শনকার বলিয়াছেন, যোগবলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের (সাংসারিক মায়ার) ধ্বংস হয়, মায়ার বিনাশ হইলে তৎপ্রসূত রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি দোষের অপায় হয়, এবং ঐ সকল দোষের নিবৃত্তি হইলে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয় না; এইরূপে কর্ম্মের অভাবে দেহোৎপত্তির অভাব, এই দেহোৎপত্তির অভাবের নামই মোক্ষ।

এই সকল কথাগুলি বলিতে বেশ সহজ, শুনিতেও বেশ মিষ্ট, কিন্তু গোল উঠাইলে আবার মহাগোল উপস্থিত হইতে পারে। আমরা এখানে তত গোল যোগ না উঠাইয়া এইমাত্র বলিতেছি যে "* বীজাঙ্কুরের ন্যায়" সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াই মহর্ষিগণ এই কথা বলিয়া থাকিবেন। যেমন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং সেই বৃক্ষের ফল হইতে বীজের উৎপত্তি, এখানে দেখা যাইতেছে যেরূপ বীজের উৎপত্তির প্রতি বৃক্ষ কারণ, সেইরূপ বৃক্ষের উৎপত্তির প্রতি বীজও কারণ কিন্তু বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে ইহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তেমনি অদৃষ্ট সৃষ্টির প্রতি কারণ এবং সৃষ্টি না থাকিলে কর্ম্ম হয় না কর্ম্ম না হইলে অদৃষ্ট কি রূপে জন্মিবে?

নৈয়ায়িকদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্যহইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে তাঁহাদের মতে সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টির আদি নাই কিন্তু ইহার ধ্বংস আছে অর্থাৎ অদৃষ্টের লোপ হইলে ইহারও লোপ হইবে। এক্ষণে আমাদের সংশয় এই যে, যদি এমন সময় উপস্থিত হয় যে সকল অদৃষ্টের নাশ হইয়া গেল একটীও অদৃষ্ট রহিল না যে পুনরায় সৃষ্টি হইবে সুতরাং অপুনরাগমনের জন্য সৃষ্টিও একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহার পর ঈশ্বর থাকেন কি না? যদি থাকেন তবে নিষ্প্রয়োজন, যদি তাঁহার কোন কার্য্যই থাকিল না তবে তাঁহার থাকা না থাকায় তুল্য। যদি না থাকেন তবে তাঁহার নিত্যত্ব ভঙ্গ। এইরূপ অপর নিত্য বস্তুরও নিত্যত্বের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

যাহাহউক বোধ হয় নৈয়ায়িকগণ নিম্নলিখিত দুইটী যুক্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের ফলকে অদৃষ্ট বলিয়া থাকিবেন। প্রথম কার্য্য মাত্রের অবশ্য একটী কারণ আছে, কারণ না থাকিলে কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না; দ্বিতীয় কর্ম্মমাত্রের এক একটি ফল অবশ্য স্বীকার্য্য, ফল না থাকিলে কি নিমিত্ত লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে? কিন্তু আমরা দেখিতেছি এক ব্যক্তি আজন্মদরিদ্র, নানাবিধ যত্ন করিয়াও তাহার দারিদ্র্য ঘুচেনা, আর এক ব্যক্তি

* "আদৌ বীজং ততোঽঙ্কুরঃ কিমাদাবঙ্কুরস্ততো বীজ মিত্যনির্ণয়েন বীজাঙ্কুর প্রবাহোঽনাদিঃ।" ন্যায়াবলী

জন্মাবধি কেবল সুখভোগ করিতেছে দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। ইত্যাদি স্থলে আমরা কেবল কার্য্য দেখিতেছি কারণ দেখিতে পাই না। যদি বল আজন্ম দরিদ্র ব্যক্তির পিতা দরিদ্র থাকাতে সেও দরিদ্র হইয়াছে এবং আজন্ম সুখী ব্যক্তির পিতার অতুল সম্পত্তি থাকাতে সে সুখভোগ করিতেছে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব তাহাদের পিতার মধ্যেই বা এরূপ বৈষম্য কি নিমিত্ত হইল? ইহার পর ক্রমশঃ যতদূর যাইবে ততদূরই প্রশ্ন চলিবে মীমাংসা কিছুই হইবে না অর্থাৎ তাদৃশ বৈষম্যের প্রতি কোন কারণই দৃষ্ট হইবে না। অন্য দিকে একজন সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ইহজন্মে তদনুরূপ ফল পাইতেছে না, দুঃখে দুঃখেই জীবন শেষ করিতেছে। অপরে নিয়ত গর্হিত কার্য্য আচরণ করিয়াও তদনুযায়ী ফল না পাইয়া বরং সুখে জীবন যাপন করিতেছে। এখানে কর্ম্ম আছে কিন্তু ফল নাই, একদিকে কার্য্যের প্রতি কোন কারণ দেখা যাইতেছে না অপরদিকে ...র্য্যের ফল দৃষ্ট হইতেছে না কিন্তু ...ই থাকা আবশ্যক। সুতরাং ...ন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বজন্মের সৎ ও ... কর্ম্মের ফলকে পরজন্মের সুখ ... প্রতি কারণ বলিয়া এই বিষম ...র এক প্রকার সমাধান করিয়াছেন ...ত হইবে।

বৈশেষিক সূত্রকার বলেন

"তৎসংযোগো বিভাগঃ।" ৬অ, ২আ ১৫সূ।

যতদিন লোকের ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম থাকিবে ততদিন এই পৃথিবীতে জন্ম মরণের ধারাপ্রবাহ থাকিবে, ততদিন জীবগণ এক দেহের পর অপর দেহ আশ্রয় করিয়া আপন আপন কর্ম্মভোগ করিবে। এইরূপ জন্মপ্রবাহকে বেদে অজরঞ্জরী ভাব এবং দর্শনশাস্ত্রে প্রেত্যভাব বলে। যথা গৌতমসূত্রে—

"পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ।" ১অ ১আ ১৯সূ

"প্রেত্য-মৃত্বা, ভাবো জননং, প্রেত্যভাবঃ। তত্র পুনরিত্যনেনাভ্যাসকথনাৎ প্রাগুৎপত্তিস্ততোমরণং তত উৎপত্তি রিতি প্রেত্যভাবোঽয়মনাদি রপবর্গান্তঃ।" সূত্রবৃত্তি

মৃত ব্যক্তির পুনর্ব্বার উৎপত্তির নাম প্রেত্যভাব। প্রথম উৎপত্তি, তাহার পর মরণ, তাহার পর আবার উৎপত্তি এইরূপে প্রেত্যভাব অনাদি কিন্তু মোক্ষ হইলে ইহার নাশ হয়।

গৌতম বলেন—

"আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ।"

৪ অ, ১আ ১০ সূ

আত্মার নিত্যত্ব যদি স্বীকার কর তবে প্রেত্যভাবও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ভোক্তা একমাত্র আত্মা এবং ঐ সকল কর্ম্ম হইতেই উত্তমাধম কুলে জন্ম হইয়া থাকে।

আমরা এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিত দিগের এতদ্বিষয়ক মতামত সংক্ষেপে

প্রকাশ করিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেও অদৃষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাঁহারা আমাদিগের আচার্য্যগণের ন্যায় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে অদৃষ্ট বলেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন "অদৃষ্ট শব্দের অর্থ ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তি-নিষ্পত্তি অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ংই প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন যাপনের জন্য এক একটী অপরিবর্ত্তি পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।" বকল সাহেব সভ্যতার ইতিহাসে লিখিয়াছেন

"They require us to believe that the Author of creation, whose beneficence they at the same time willingly allow, has, notwithstanding His Supreme goodness, made an arbitrary distinction, between the elect and the non-elect; that He has from all eternity doomed to perdition millions of creatures yet unborn, and whom His act alone can call into existence: and that He has done this, not in virtue of any principle of justice, but by a mere stretch of despotic power."

অদৃষ্টবাদীরা বলেন যদিও ঈশ্বর সকল জীবের উপর সমান দয়াবান্ তথাপি তিনি কতকগুলি লোকের জন্য মুক্তি এবং কতকগুলি লোকের জন্য কেবল নরকভোগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি অনন্ত পূর্ব্বকাল হইতে যাহারা অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই এমন সকল আত্মারও নরক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই আবার ইহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ন্যায়ানুসারে এরূপ করেন নাই আপনার ইচ্ছাতেই করিয়াছেন।

ইংলিসচার্চ্চের ১৭ নিয়মে লিখিত আছে

"Predestination to life is the everlasting purpose of God, whereby (before the foundations of the world were laid) He hath constantly decreed by His counsel, secret to us, to deliver from curse and damnation those whom He hath chosen in Christ out of mankind, and to bring them, by Christ to everlasting salvation." &c.

মনুষ্যের অদৃষ্ট পরমেশ্বরের এক প্রকার নিত্য অভিপ্রায়, ইহা দ্বারাই তিনি সৃষ্টির ভিত্তিস্থাপনের পূর্ব্বে আপনার ইচ্ছানুসারে মনুষ্যজাতির মধ্য হইতে কেবল কতকগুলি লোককে অভিশাপ এবং নরক হইতে নিস্তার করিবার জন্য খ্রীষ্টের শিষ্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবং ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে খ্রীষ্ট তাঁহাদিগকে অনন্তসুখময় মোক্ষধামে লইয়া যাইবেন।

পাঁচ শতাব্দীতে অগষ্টাইন এই মতের প্রচার করেন, তাহার পর কালবীন ইহার পোষকতা করিয়া দূর পর্য্যন্ত বিস্তার

করেন। আমাদিগের দেশেও এইরূপ মত যে এক সময় প্রচলিত হইয়াছিল তাহা, "অয়ং দরিদ্রো ভবিতেতিবৈধসীং লিপিং ললাটেঽর্থিজনস্ত জাগ্রতীম" এবং "ললাটে লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবার্য্যতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এক প্রকার প্রতিভাসিত হইতেছে। আমাদের দেশে এখনও এই মত এইরূপে প্রচলিত আছে যে বালক জন্মিবার পর ষষ্ঠ দিবস রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া সেই নববালকের কপালে সুখ দুঃখ ভোগাদি লিখিয়া যান এবং ঐ নিমিত্ত সূতিকাগারের দ্বারে লেখনী ও মসীপাত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। বোধ হয় এই নিমিত্তই অদৃষ্টের নাম "কপাল" হইয়া থাকিবে। আর সংস্কৃত "ভাগধেয়" কথাটীও এই মতের পোষকতা করিতেছে, ইহার অর্থ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যের সুখদুঃখ একবারে ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়াছে।

এই মত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলবাদী দিগের মতের উপর যে সকল সন্দেহ হইয়াছিল, তৎসমুদয় এক প্রকার নিরস্ত হইয়াছে বটে কিন্তু আর কতকগুলি নূতন দোষের আবির্ভাব হইল। দয়ার সাগর পরমেশ্বর যদি আপনার ইচ্ছাতে নিজ সৃষ্ট মনুষ্যগণ হইতে কতকগুলি লোককে সুখী এবং কতকগুলি লোককে দুঃখী করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অদ্বিতীয় মাহাত্ম্য কোথায় রহিল? তাঁহার ঈশ্বরত্বে কলঙ্ক হইল—তিনি একজন সামান্য মনুষ্য অপেক্ষাও হীনস্বভাব হইলেন।

পরমেশ্বরকে পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইউরোপে আর একটি মতের আবির্ভাব হয়। ইহার অনুসারে মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন। আর্ম্মিনিয়স এবং তাঁহার শিষ্যেরা এই মতের প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ সকলের উপরেই সমান, কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে মনুষ্যেরা স্বাধীন। বর্ত্তমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতাবলম্বীই অনেক।

ওএষ্টমিনিষ্টর কনফেসন (Westminster Confession) নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর ভাবিঘটনা সকল জ্ঞাত আছেন বটে কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিয়া দেন নাই। মনুষ্য সকল স্বাধীনেচ্ছু, তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে পাপ বা পুণ্য করিয়া থাকে।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতিলক্ষ্মী
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বোধ হয় আমাদের দেশেও এইরূপ কোন মত এক সময় প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

যাহা হৌক এই স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের মত যে ভ্রমশূন্য নয় ইহা দেখাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বকল সাহেবের এতদ্বিষয়ক বিচারটি এখানে উপন্যস্ত হইতেছে।

তিনি বলেন "স্বাধীনেচ্ছাবাদীদের মত এই যে মনুষ্যমাত্রে বিবেচনা করে এবং জানে যে তাহারা স্বাধীন, সুতরাং

রূপে তর্ক করিয়াও এই বুদ্ধির অপলাপ হয় না। যাহা হৌক এই মতের পোষণের জন্য দুটী স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে। প্রথম মনুষ্যের হৃদয়ে একটি স্বাধীন চেতনাশক্তি বাস করে। দ্বিতীয় ঐ চেতনা দ্বারা যাহা জানা যায় তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কোনরূপে অন্যথা হয় না। এই দুইটী স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে প্রথমটি সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কথনই সত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় নাই। দ্বিতীয়টি ত সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম বিবেচনা কর চৈতন্য যে মনের একটি ধর্ম্ম সে বিষয় কিছু স্থিরতা নাই, অনেক বড় বড় চিন্তাশীলদিগের মতে ইহা মনের একটি অবস্থামাত্র। যদি ইহা ঠিক হয়, তবে ত স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের তর্কের মূলে আঘাত হইল, কারণ যদিও, মনের ধর্ম্মসমুদয় সকল অবস্থাতেই একরূপ কার্য্য করে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু মনের অবস্থার বিষয় এ কথাটি স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু কারণবিশেষে মনের অবস্থাবিশেষ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আর যদিও চৈতন্যকে মনের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি ইতিহাসাদিতে ইহার সম্পূর্ণ অস্থিরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যের সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে যে সকল অবস্থা অতীত হইয়াছে, প্রত্যেক অবস্থাতেই তাহাদের বিশ্বাস বিভিন্নরূপ হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই সেই অবস্থার ধর্ম্ম, দর্শন ও নীতি ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করিয়াছে। এক সময় যাহা বিশ্বাসের উপযোগী ছিল, অন্য সময় তাহাই আবার উপহাসের স্থল হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল বিশ্বাস যখন প্রচলিত ছিল, তখন তাহারা আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য স্বাধীনেচ্ছার ন্যায় চৈতন্যের অংশরূপে পরিগণিত হইত।

ঐ সকল ধর্ম্মাদি চৈতন্য দ্বারা স্থিরীকৃত হইলেও উহাদিগকে কথনই সত্য বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর বিপরীত পথ আশ্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক সময় সত্যের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার না করিলে চৈতন্যদ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ের সত্যতা আর কিছুতেই প্রমাণীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ তর্ক করিলে সৎপ্রতিপক্ষতা দোষ সত্ত্বেও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়।"

"আমরা সাধারণ মনুষ্যদিগের কার্য্য হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; অবস্থা বিশেষে কি মনুষ্যের ভূত প্রেতাদির অস্তিত্বের বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান হয় না? কিন্তু তাদৃশ পদার্থের স্থিতির বিষয় প্রায় সকলেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। যদি বল সে সকল জ্ঞান যথার্থ নয় ভ্রমমাত্র, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বিষয় বিশুদ্ধ চৈতন্য দ্বারা স্থিরীকৃত আর কোন কোন বিষয় বা ভ্রমাত্মক চৈতন্য দ্বারা স্থিরীকৃত ইহা কিরূপে স্থির

হইবে? যদি একস্থলে চৈতন্য আমাদিগকে বঞ্চনা করে, তবে অন্য স্থলে বঞ্চনা না করিবার কারণ কি? যদি এ বিষয়ে কোন প্রতিভূ না থাকে তবে কেবল চৈতন্যের উপরই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, আর যদি কোন প্রতিভূ থাকে, তবে চৈতন্যকে একপ্রকার তাহার অধীন স্বীকার করিতে হইতেছে। এক্ষণে দেখ চৈতন্যের প্রধানতা না থাকিলে স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের মূল অশুদ্ধ হইল সুতরাং আর একটি নূতন ভিত্তি স্থাপন করা আবশ্যক হইতেছে।" †

স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের আশঙ্কা এই যে যদি আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন না হইত, তবে আমরা সময়ে সময়ে চুরি ও নরহত্যা প্রভৃতি সমাজবিগর্হিত কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে কখনই নিস্তার পাইতে পারিতাম না। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে ইচ্ছা স্বাধীন হইলেই বা কিরূপে ঐ সকল নিন্দনীয় কার্য্য হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন, সুতরাং যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তখন তাহাই করিব। চুরি করিতে ইচ্ছা হইল চুরি করিলাম, খুন করিতে ইচ্ছা হইল খুন করিলাম; যদি ঐ সকল ইচ্ছার প্রতিবন্ধক কিছু থাকে, তাহাহইলে আর তাহাদের স্বাধীনতা কোথায় রহিল?

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের উৎপত্তির বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বকল সাহেব একটি যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস লিখিয়াছেন। বোধ করি এখানে তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"মনুষ্য যখন এরূপ অসভ্যাবস্থায় থাকে যে তাহাদের বাস করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে না কেবল এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করতঃ মৃগয়াদি কার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তখন তাহারা কি নিমিত্ত যে কোন কোন দিন প্রচুর এবং কোন কোন দিন অল্প খাদ্য লাভ হয় ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা সকল বস্তুকেই অকস্মাৎ সঙ্ঘটিত বিবেচনা করে। তাহারা জানিতে পারে না যে সকল ভূমির সমানরূপ শস্য উৎপাদন কারিণী শক্তি নাই এবং ইহাও বুঝিতে পারে না যে সকল কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি একটি না একটী কারণ আছে।

"পরে যখন তাহারা কালক্রমে কৃষাণ রূপে পরিণত হয় চাস বাস করিতে থাকে, তখন তাহারা দেখে যে, ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে তাহার এত দিন পরে ফল পাওয়া যায়। এক্ষণে তাহাদের কিছু কিছু ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে থাকে। এখন আর পূর্ব্বের মত সকল কার্য্যকেই অকস্মাৎ সঙ্ঘটিত বিবেচনা করে না, এক্ষণে তাহাদের হৃদয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞানের ঈষন্মাত্র আলোক প্রকাশিত হয়।

* See Buckle's History of Civilization page 14.

"এইরূপে সমাজ ক্রমশঃ যতই উন্নতি প্রাপ্ত হয় ততই তদন্তর্গত মনুষ্য সকল নৈসর্গিক নিয়ম গুলি বিশেষরূপে বুঝিতে থাকে, আর পূর্ব্বে যাহা অকস্মাৎ সংঘটিত বিবেচনা করিত তখন তাহার পরিবর্ত্তে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান, স্থান গ্রহণ করে। অর্থাৎ তখন তাহারা বুঝিতে থাকে যে কোন কর্ম্ম অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না একটি কার্য্যের উৎপত্তির জন্য পূর্ব্বে আর একটী কার্য্যের অবস্থিতি আবশ্যক।

"সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত দুই মত হইতে ক্রমশঃ স্বাধীনেচ্ছা ও অদৃষ্টবাদীদিগের মত উদিত হইয়া থাকিবে। সমাজের উন্নতির সহিত যে এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবটিত হইবে ইহাও কিছু আশ্চর্য্য নয়। প্রত্যেক দেশে ধনরাশি যখন একপ্রকার বর্দ্ধিত সীমা প্রাপ্ত হয়। তখন সেখানে এক এক ব্যক্তির পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের স্ব স্ব অভাব পূরণ করিয়াও উদ্বৃত্ত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত সেই দেশে অনেকের পরিশ্রম না করিলেও চলে। ঐ সকল পরিশ্রমশূন্য মনুষ্যেরা পরিশ্রমকারী মনুষ্যগণ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া প্রায় আমোদ আহ্লাদে জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা (অতি অল্পই) বিদ্যাধ্যয়ন ও তাহার প্রচারের জন্যও যত্ন করিয়া থাকেন।"

"ইহাও সচরাচর দেখা যায় যে এই শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আবার কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যঘটনাবলী একবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজের মনের বৃত্তিগুলি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল মহাত্মারা যখন মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তখন ইঁহাদিগের দ্বারা এক একটি নূতন দর্শন বা ধর্ম্ম পরিস্থত হয়, যাহা বহুতর মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া নিজের অনুগামী করে। এ স্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আদিমাচার্য্যগণ সাময়িক সাধারণ মত সমুদয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদের মত স্থির করেন, কারণ প্রচলিত মত সকলের আকর্ষণীশক্তি একবারে পরিত্যাগ করা কঠিন। তবে নূতন দর্শন বা নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় যে শুনা যায়, বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে কিন্তু তৎকালপ্রচলিত মতের নূতন পদ্ধতিতে সংগ্রহ মাত্র। এই জন্য বলা যাইতেছে যে পূর্ব্বে বাহ্য জগতে যাহা অকস্মাৎ বলিযা জ্ঞাত ছিল তাহাই ক্রমে অন্তর্জগতের স্বাধীনেচ্ছা রূপে পরিণত হইয়াছে এবং পূর্ব্বকালের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ক্রমশঃ অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে। বিশেষ এই যে প্রথমটীর উন্নতির কারণ তার্কিকগণ, দ্বিতীয়টির পোষণ কর্ত্তা ধর্ম্মপ্রচারকগণ। একদিকে তার্কিকগণ মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিরপেক্ষ অকস্মাৎ বিষয়ক মতটী তন্ন তন্ন সমালোচন করতঃ তাহার সামগ্রী দ্বারাই স্বাধীনেচ্ছাবিষয়ক মতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যদিকে ধর্ম্মপ্রচারকগণ কার্য্য

কারণ সম্বন্ধের উপর একখানি ধর্ম্মের চর্ম্মমাত্র আবরণ দিয়া অদৃষ্টের আবির্ভাব করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন যে অসাধারণ ঐশীশক্তি প্রভাবে এই সৃষ্টি যথানিয়মে একরূপে চলিতেছে এক্ষণে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের সহিত এই মতেরও যোগ করিলেন যে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভেই যাহা যেরূপ হইবে তাহা একবারে নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।"*

এক অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া একটী দীর্ঘ প্রস্তাব ত লিখিয়া বসিলাম। এক্ষণে পাঠকগণের মনোরম হওয়া না হওয়ার বিষয় ইহার অদৃষ্ট। আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকি, অদৃষ্ট না থাকিলে জগতের মধ্যে সর্ব্বদা এরূপ বৈষম্য ঘটিবে কেন? কিন্তু আমরা অদৃষ্টকে অদৃষ্টই রাখিতে চাই। প্রাচীন মহর্ষিগণের ন্যায় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে অদৃষ্ট বলি না; তাহার প্রথম কারণ এই যে বীজাঙ্কুর ন্যায়ে সৃষ্টি অনাদি, ইহার ঠিক তাৎপর্য্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, দ্বিতীয় কারণ এই যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলকে, অদৃষ্ট বলিলে অদৃষ্টের আর অদৃষ্টত্ব থাকিল কই? দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহাতে ঈশ্বরে পূর্ব্বোক্ত দোষারোপ হয় এবং অদৃষ্টেরও অদৃষ্টত্ব থাকে না। এই নিমিত্ত আমরা এই দুইটি মতের অতিরিক্ত একটি নবীন মত অবলম্বন করিয়া বলিতেছি যে, যে সকল কারণ পরম্পরা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে তাহার নামই অদৃষ্ট।

বৈজিকতত্ত্ব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই পরিচ্ছেদে বৈজিক প্রবলতাসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। জাতিবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বীজের প্রবলতা থাকে। শৃগাল ও কুক্কুরের মধ্যে শৃগালের বৈজিকপ্রবলতা অধিক; অশ্ব ও গর্দ্দভের মধ্যে গর্দ্দভের বৈজিক প্রবলতা অধিক। শৃগাল ও কুক্কুরে শাবক উৎপাদিত হইলে শৃগালের ন্যায় শাবক হয়, কুক্কুরের ন্যায় একেবারে হয় না। অশ্ব ও গর্দ্দভ সংযোগে যে শাবক জন্মে তাহা গর্দ্দভের ন্যায় হয় অশ্বের ন্যায় হয় না। এই স্থলে বলিতে হইবে অশ্ব অপেক্ষা গর্দ্দভের বৈজিকবল অধিক সেই জন্য শাবক গর্দ্দভের ন্যায় হয়।

এইরূপ আবার ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেও দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ

* See Buckle's History of Civilization page 9

বৈজিকপ্রবলতা থাকে যে তাঁহারা যে স্ত্রী গ্রহণ করুন, বা যে পুরুষ গ্রহণ করুন সন্তানে কেবল তাঁহাদেরই শারীরিক চিহ্ন প্রকাশ হইবে; অপরের কোন চিহ্নও থাকিবে না। প্রথম পরিচ্ছেদে যে সকল পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক গুলির বৈজিকপ্রবলতা দেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। ডারউইন সাহেব একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে কুক্কুরটির শাবক মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ হইত, যে বর্ণের কুক্কুরীর গর্ব্ভে জন্ম হউক তাহার ঔরসজ শাবক নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হইত। উপস্থিত লেখকের একটি গাভী ছিল, তাহার বর্ণ গোয়ালারা বোধ হয় "সামলা" বলিত অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতবর্ণের লোমে তাহার অঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল। কোথায় কৃষ্ণবর্ণ অধিক বা কোথায় শ্বেতবর্ণ অধিক এমত নহে, উভয় বর্ণের লোম সর্ব্বাঙ্গে সমভাবে সন্নিবেশিত ছিল আর তাহার খুর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই গাভীর বৎসমাত্রেই "সামলা" হইত। অন্য "সামলা" গাভীর বৎস মধ্যে কোনটি শ্বেতবর্ণের হয় বা কোনটি কৃষ্ণবর্ণের অথবা অন্য বর্ণের হয় কিন্তু যে গাভীটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে তাহার বৎস "সামলা" ভিন্ন অন্য বর্ণের কখন হয় নাই; শ্বেতবর্ণের বা রক্তবর্ণের বা যে বর্ণের বৃষজাত হউক বৎসের বর্ণ নিশ্চয়ই "সামলা" হইত তাহার খুর নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এ স্থলে বলিতে হইবে যে গাভীটির বৈজিকশক্তি অতি প্রবল ছিল। যে কোন বৃষ হউক কোন অংশে আপনার আকৃতি বৎসে দিতে পারিত না। সকল বৃষই গাভীটির নিকট বৈজিক অংশে দুর্ব্বল বলিয়া সপ্রমাণিত হইত। গাভীটির পুরুষানুক্রমে বৈজিক বিষয়ে এইরূপ প্রবল ছিল, আমরা তাহা ইহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অষ্ট্রিয়া রাজ্যের রাজরাজের বংশেও এইরূপ বৈজিক প্রবলতা আছে বলিয়া শুনা যায়। তাঁহারা যে বংশেই বিবাহ করুন, সন্তানের ওষ্ঠ তাঁহাদের বংশানুরূপ স্থূল হইবে, বিবাহিত বংশের অনুরূপ হইবে না।*

এইরূপ বৈজিকপ্রবলতা কখন স্ত্রীর মধ্যে কখন পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। যেখানে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জননীর মত হয়, যেখানে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জনকের মত হয়। এই জন্য কোন কোন লেখক বলেন যে, যে স্থলে স্ত্রীর বৈজিকপ্রবলতা অধিক সে স্থলে হয় ত কন্যাসন্তান অধিক জন্মে, আর যে স্থলে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা অধিক

* Such are the features of the reigning house of Austria, in which the thick lip introduced by the marriage of the Emperor Maximilian with Mary of Burgundy, is visible in their descendants to this day, after a lapes of three centuries. *Walker on intermarriage page* 145.

সে স্থলে পুত্র অধিক জন্মে। ওবাকার সাহেব লিখিয়াছেন যে আইয়রলণ্ডদেশে একজন সাহেব ক্রমে ক্রমে তিন বিবাহ করেন এবং সেই তিন স্ত্রী দ্বারা তাঁহার যত সন্তান হইয়াছিল সকল গুলিই পুত্র হইয়াছিল।* নাইট সাহেব লিখিয়াছেন যে তাঁহার দুইটী গাভী ক্রমান্বয়ে নই অর্থাৎ স্ত্রীবৎস প্রসব করে। প্রথম গাভীটি পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে চতুর্দ্দশ স্ত্রীবৎস প্রসব করে, আর অপরটী ষোড়শ বৎসরে পঞ্চদশ স্ত্রীবৎস প্রসব করে। তিনি আরও বলেন যে প্রতিবার বৃষ পরিবর্ত্তন করিতেন তথাপি স্ত্রী বৎস ভিন্ন অন্য বৎস হইত না। কেবল উভয় গাভীর একবার একটি করিয়া এঁড়ে অর্থাৎ পুরুষ বৎস হইয়াছিল।†

সর্ব্বদাই দেখা যায় যে ব্যক্তিবিশেষের কখন এক স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে পুত্র প্রসব করিয়াছে আর সেই ব্যক্তির কোন অপর স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে কেবল কন্যা প্রসব করিয়াছে। এমত স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা সেই পুরুষের বৈজিক প্রবলতা ছিল তাহাতেই কেবল পুত্র জন্মিয়াছে আর দ্বিতীয়া স্ত্রী অপেক্ষা তাহার বৈজিক দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়া কেবল কন্যা জন্মিয়াছে। কিন্তু বৈজিকপ্রবলতা বা দুর্ব্বলতাই যে ইহার কারণ তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, ইদানীন্তন পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ মত শুনা যায় না। পূর্ব্বে যাঁহারা এই রূপ মত সমর্থন করিতেন তাঁহারা বৈজিক প্রবলতা ও বীজাধিক্য এই দুই কথার প্রভেদ বিশেষ করিয়া জানিতেন না।

অনেকে বলেন যে, যে দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত সেখানে পুরুষেরা দুর্ব্বল, স্ত্রীলোকেরা বলিষ্ঠ। এই জন্য সে দেশে কন্যা সন্তান অধিক জন্মে। এ কথা সত্য হইলে হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের বৈজিক প্রবলতা যে ইহার কারণ এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। বৈজিক প্রবলতার ফল স্বতন্ত্র। সে যাহাহউক আমাদের দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু তাই বলিয়া যে বাঙ্গালায় কন্যার ভাগ অধিক এমত নিশ্চয় নাই, কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালার লোকসংখ্যা হইয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা বাঙ্গালার স্ত্রীর ভাগ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই অথবা কুলীন প্রভৃতি যাঁহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিশেষ প্রচলিত তাঁহাদের বংশ স্বতন্ত্র করিয়া গণনা হয় নাই। সেরূপ গণনা হইলে ফল কি হইত বলা যায় না, বোধ হয় কন্যা সন্তানের ভাগ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। আমাদিগের বিশ্বাস কুলীনদিগের মধ্যে কন্যার ভাগ অধিক, এ বিশ্বাসের মূল প্রকৃত না হইতে পারে. কিন্তু সচরাচর কুলীন কন্যা সংখ্যা অধিক দেখিতে পা-

* From Philosophical Trans: 1787.
† Quoted by Walker

ওয়া যায় বলিয়া এই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে। যদি এই বিশ্বাস প্রকৃত হয় অর্থাৎ বাস্তবিক যদি কুলীনদিগের মধ্যে পুত্র অপেক্ষা কন্যা সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে বহুবিবাহের কারণ এক প্রকার বুঝা যায়। যেখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক সে স্থলে প্রত্যেক পুরুষে একটি করিয়া স্ত্রী বিবাহ করিলে অনেক গুলি স্ত্রী অবিবাহিতা থাকে। কাজেই পুরুষদিগকে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়। বহুবিবাহের কারণ এই। কিন্তু এক্ষণে বিচার্য্য যে কুলীনদিগের মধ্যে কন্যার সংখ্যা কেন অধিক হয়? পূর্ব্বে যে মতের উল্লেখ করা গিয়াছে তদনুসারে বহুবিবাহই কি ইহার কারণ? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বহুবিবাহের ফল বহু কন্যা এবং বহু কন্যার ফল বহুবিবাহ। কিন্তু আমাদের দেশে আবহমানকাল এরূপ বহুবিবাহের প্রথা ছিল না এক সময়ে না এক সময়ে প্রথম আরম্ভ হয় সেই আরম্ভের মূল কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়া থাকে। যে স্থলে জনকের গঠন একরূপ জননীর গঠন অন্যরূপ, সে স্থলে সন্তানের গঠন প্রত্যেক অংশে জনক জননী উভয়ের ন্যায় হইতে পারে না; কোন অংশে জনকের ন্যায় কোন অংশে জননীর ন্যায় হইয়া থাকে। যথা মহিষের ঔরসে গাভীর গর্ভে বৎস উৎপন্ন হইলে বৎসের কোন অংশ মহিষের ন্যায় কোন অংশ গাভীর ন্যায় হইবে। হয় ত শৃঙ্গ ও পুচ্ছ মহিষের ন্যায় অঙ্গগঠন গাভীর ন্যায় হইবে। বাঙ্গালির ঔরসে কাফ্রির গর্ভে যদি সন্তান হয় তাহা হইলে সন্তানের কেশ হয় ত কাফ্রির ন্যায় কুঞ্চিত হইবে, আকার হয় ত বাঙ্গালির ন্যায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। কিন্তু যে স্থলে জনক জননীর গঠন স্বতন্ত্র নহে উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই রূপ সে স্থলে সন্তানের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণতঃ উভয়ের ন্যায় হওয়া সম্ভব। যে সন্তানের জনক জননী উভয়েই কাফ্রি সে সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাফ্রির ন্যায় হইয়া থাকে। যে গোবৎসের জনকজননী উভয়েই খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন সে বৎস অবশ্য উভয়ের ন্যায় খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহা না হয় তবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পূর্ব্ব পুরুষের সাদৃশ্য ঘটনার কথা যাহা বলা গিয়াছে তাহা ঘটিয়া থাকিবে বা অন্য কোন বিশেষ কারণ প্রবল হইয়া থাকিবে। নতুবা সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহাতে এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, যে স্থলে বৃষ ও গাভী উভয়েই খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন সে স্থলে বৎস অবশ্য খর্ব্বকায় বা শৃঙ্গহীন হইবে।

অতএব জনকজননীর মধ্যে আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে যতই সমসাদৃশ্য থাকিবে, সন্তানের সাদৃশ্য ততই সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। কিন্তু জনকজননীরা ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভব হইলে তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে সমসাদৃশ্য বড় থাকে না। কাজেই তাঁহাদের সন্তান যে উভয়ের ন্যায় হইবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সন্তান এ অবস্থায় হয় পিতার ন্যায়, নতুবা মাতার ন্যায় হইবে, অথবা কতক পিতার ন্যায় কতক মাতার ন্যায় হইবে। অপরাপর স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা নিকট জ্ঞাতির মধ্যে পরস্পরের সমসাদৃশ্য অধিক থাকে। আবার জ্ঞাতি অপেক্ষা সহোদর সহোদরার মধ্যে সমসাদৃশ্য আরও প্রবল হয় এই জন্য বিলাতের পশু ব্যবসায়ীরা, সাদৃশ্য আবশ্যক হইলে সহোদর সহোদরা মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়া লয়, পিতা ও কন্যার মধ্যে সমসাদৃশ্য থাকে অতএব তাহাদের মধ্যেও শাবক উৎপাদন করায়। এই প্রথাকে ইংরেজিতে interbreeding বা in-and-in breeding বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোন প্রচলিত কথা নাই, বোধ হয় আপাতত ইহাকে কুলবীজক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অর্থগ্রহ হইতে পারে। এই প্রথার ফল ভাল মন্দ দুই আছে।

ভাল ফল এই, যে যদি কোন বিশেষ গুণের নিমিত্ত কোন পশু বা পক্ষী প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয় অথবা তজ্জন্য অপর পশু পক্ষী অপেক্ষা তাহার অধিক মূল্য হয়, তাহা হইলে এই প্রথার দ্বারা সেই বিশেষ গুণটি বংশগত করান যাইতে পারে। বিলাতের কোন কোন গোমেষাদির বংশ যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা এই নিয়মের কৌশলে। মাতৃকুল ও পিতৃকুল স্বতন্ত্র হইলে বাঞ্ছিত গুণটি হয় ত বংশগত করান যায় না। এক কুলের গুণ হয় ত অপর কুলের নৈজিক প্রবলতা দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে অথবা হয় ত উভয় কুলের দোষ গুণ সন্তানে আসিয়া গুণ অপেক্ষা কোন দোষের ভাগ প্রবল হইতে পারে, এই ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেবল সহোদর সহোদরায় ও তদভাবে নিকট জ্ঞাতি মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়া লয়। নিকট জ্ঞাতিরা কতকটা সমগুণবিশিষ্ট, এক রক্ত, কাজেই দোষ গুণ কতকাংশে একই প্রকার। এই জন্য বাঞ্ছিত গুণটি তদ্দ্বারা রক্ষা হইলে হইতে পারে।

পশুদিগের মধ্যে এরূপ কুলবীজক যে কেবল ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রথম ঘটনা হইয়াছে এমত নহে। তাহাদের অনেক জাতির মধ্যে ইহা স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্যমধ্যে ইহা কতদূর স্বাভাবিক বলা যায় না, বোধ হয় কেবল সংস্কারবিরুদ্ধ, স্বভাববিরুদ্ধ নহে। জ্ঞাতিবিবাহ অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত আছে জ্ঞাতিবিবাহও এক প্রকার কুলবীজক। ইহা দ্বারা পশুদিগের মধ্যে যে ফল উৎপাদিত হয় মনুষ্যদিগের মধ্যেও তাহাই হইতে পারে।

অর্থাৎ জনকজননীর সহিত সন্তানের সমসাদৃশ্য জন্মিতে পারে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিবিবাহ যে সাধারণতঃ প্রচলিত হইয়াছে এমত নহে। সন্তান জনকজননীর মত হউক ইহা কয়জন লোকে আন্তরিক প্রার্থনা করে বা সেই অভিপ্রায়ে বিবাহ সংঘটন করে? তথাপি যে জ্ঞাতিবিবাহ ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় তাহার মূল কারণ কুলানুরূপ সন্তান কামনা নহে, কেবল মাত্র যে এই বিবাহ অল্প ব্যয়ে, অল্প যত্নে, অল্প বয়সে ঘটে বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে।

জ্ঞাতিগমন প্রথার ভাল ফলের কথা বলা গেল এক্ষণে মন্দ ফলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। পশুব্যবসায়ীরা এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে এই প্রথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে প্রচলিত রাখিলে ক্রমে পুরুষ পরম্পরায় বলক্ষয় হইতে থাকে, আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়, সন্তান উৎপাদিকা শক্তিরও হ্রাস হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেকে এ কথা একেবারে স্বীকার করেন না।* আমরা ইহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি, তবে যাঁহারা ব্যবসা উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন আমরা তাঁহাদের কথা অবহেলা করিতে পারি না। বাইট নামক একজন ব্যবসায়ী একটি শূকর প্রতিপালন করেন, সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত শূকর আপন কন্যার বংশে সন্তান উৎপাদন করে। তাহার ফল এই হইল, যে কতক শাবক অল্প দিনের মধ্যে মরিয়া গেল, কতক চলৎশক্তি রহিত হইল, কতক বা জড়বৎ জন্মিল, এমন কি দুগ্ধপানেও অসমর্থ হইল; আর কতকের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি একেবারে হইল না।† নাথুসীস নামে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন জর্ম্মান স্বদেশে এইরূপ আর একটি পরীক্ষা করেন। ইয়র্কসাইয়ার হইতে তিনি এক বৃহৎ শূকরী আনয়ন করেন, শূকরী তৎকালে গর্ভবতী ছিল; জর্ম্মনীতে আসিয়া কতকগুলি বৎস প্রসব করিল। বৎসগুলি বড় হইলে নাথুসীস সাহেব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শাবক উৎপাদন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ তিন পুরুষ হইলে পর নাথুসীস দেখিলেন, যে ক্রমে খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বলকায় শাবক জন্মিতেছে এবং কতকের সন্তান আদৌ জন্মিতেছে না। শেষ তিনি উহাদের মধ্য হইতে একটী বলিষ্ঠা শূকরী বাছিয়া অন্যবংশজাত শূকরের নিকট দিলেন। তাহাতে শূকরীর প্রথমেই ২১টী শাবক জন্মিল, তৎপূর্ব্বে নিজ গোষ্ঠীতে শূকরী যে

* See marriage of near kin by Mr. Huth 1875. Westminister Review xvci See also Mr. W. Adam on 'consanguinity in marriage' in the Fortnightly review 1865

† Darwin's variation of animals under domistication vol II page 101

কয়েকবার গর্ভবতী হইয়াছিল তাহাতে ৫টি কি ৬টির অধিক শাবক জন্মে নাই তাহারাও অতি দুর্ব্বল হইয়াছিল।

যাঁহারা বলেন যে জ্ঞাতিগামীদিগের বংশগত কোন ক্ষতি হয় না, তাঁহারা প্রায় কেহই রীতিমত পশুব্যবসায়ী নহেন। যাঁহারাই পালিত পশুর অবনতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত আপন পশুর বংশ অবিমিশ্রিত রাখিতে গিয়াছেন, অর্থাৎ অন্যবংশজাত পশুর সংস্পর্শে আসিতে দেন নাই, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে ইহাতে বাস্তবিক অনিষ্ট হইয়াছে। পশুর মূল গুণ রক্ষা হয় বটে কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কয়েকটি দোষ বংশে উপস্থিত হয়। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহা সকল পশুর পক্ষে সমভাবে অনিষ্টকর হয় না। যে সকল চতুষ্পদ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, যথা গো মেষাদি, তাহাদের পক্ষে কুলবীজক বহুকালে অনিষ্ট করে, কিন্তু অন্য পশুর বংশে কুলবীজক দুই চারি পুরুষের মধ্যেই অনিষ্ট আরম্ভ করে।

ইহার স্থূল কথা ডারউইন সাহেব বলিয়াছেন যে কুলবীজকে মন্দ ফল সহজে ধরা পড়ে না, কেন না তাহা অতি অল্পে অল্পে সঞ্চয় হইতে থাকে।* তিন চারি পুরুষ অতিবাহিত না হইলে সে সঞ্চিত দোষ লক্ষ্য উপযোগী স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয় না।† কিন্তু কুক্কুট, কপোত প্রভৃতির সেই তিন চারি পুরুষ অল্পকাল মধ্যেই অতিবাহিত হইয়া যায় অতএব তাহাদের সম্বন্ধে এই পরীক্ষা সকলেই অনায়াসে করিতে পারেন।‡

পশু পক্ষীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া হউক বা অন্য কারণেই হউক, অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে মনুষ্য পক্ষে জ্ঞাতিবিবাহ অবশ্য অনিষ্টকর। আবার কেহ তাহা অস্বীকার করেন। করুন, কিন্তু একটী অনিষ্ট স্পষ্ট দেখা যায়। এক বংশে যদি কোন রোগ থাকে জ্ঞাতিবিবাহে সে রোগ দৃঢ়বদ্ধ হয়। জনক জননী উভয়েরই রক্ত আশ্রয় করিয়া সেই রোগ সন্তানে আইসে। জনক জননী ভিন্ন ভিন্ন বংশের হইলে একের রোগাংশ অপরের রক্ত দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে।

যে সকল দেশে বহুকালাবধি জ্ঞাতি-

---

* The evil results from close breeding are difficult to detect for they accumulate slowly *Variation of animals* vol 2 page 92

† Manifest evil does not usually follow for pairing the nearest relations for two three or even form generations; but several causes interfere with our deleeting the evil—such as the deterioration beir g very gradual, and the difficulty of distinguishing between such direct evil and the inevitable augmentation of any morbid tendenceis which may be latent or apparent in the related parcents *Darwin's variation of animals ch* XVII.

‡ Evedenc of evil effects of close interbreeding can most readily be acquired in the case of animals such as fowls, pigeons, &c which propagate quickly and from being kept in the same place are exposed to the same conditions. *Variation of animals Ch* xvii

বিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল দেশে সকল বিবাহই জ্ঞাতির মধ্যে হয় না অধিকাংশ বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন বংশে হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে যে দুই একটী জ্ঞাতিবিবাহ ঘটে তাহাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল জানা যায় না। তদ্ভিন্ন এই বিবাহ কোন বংশেই পুরুষানুক্রমে হয় না, এবার যদি কেহ নিজগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে, হয় ত তাঁহার সন্তানেরা আবার অপর বংশে বিবাহ করে। কাজেই অনিষ্ট বড় লক্ষ্য উপযোগী হয় না।

পশুদিগের মধ্যে ব্যবসায়ীরা যেরূপ করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কোন বংশে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে তাহাহইলে জ্ঞাতিবিবাহের ফলাফল বুঝা যাইতে পারে। শুনা যায় যে মিশোর রাজ্যে রাজপরিবারের মধ্যে সহোদর সহোদরায় বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু সে বংশ শীঘ্রই লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মরাজ্যের রাজপরিবারের মধ্যে এই প্রথা কতক আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশে কিরূপ প্রথা ছিল বা আছে তদ্বিষয় আগামী সংখ্যায় বলা যাইবে।

রাজসিংহ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রম সিংহ। বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা বলিতে পারি। শ্রুত আছে যে তিনি স্নানাহার করিতেন, এবং রজনীযোগে নিদ্রা দিতেন ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটী ঘর বড় সুশোভিত। শ্বেত প্রস্তরের মেঝ্যা, শ্বেতপ্রস্তরের প্রাচীর; তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পশু পক্ষী এবং মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন, নানা রঙ্গের বস্ত্রের বাহার দিয়া বসিয়া, কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কাহারও নাকে বড় বড় মতিদার নথ দুলিতেছে, কাহারও কাণে হীরকজড়িত কর্ণভূষা

চলিতেছে। অধিকাংশই যুবতী ; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—বলিতে কি একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে। কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দূষিও না—যতদিন হাসিবার বয়স আছে—তত দিন ইহারা হাসিয়া লইবে—হাসির অপেক্ষা আর সুখ কি ? চিত্ত যদি নির্ম্মল হয়, আনন্দ যদি পাপশূন্য হয়, তবে এই যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌবনের হাসির অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই। কাঁদিবার দিন সকলেরই আসিবে, শীঘ্রই আসিবে। যে যত পারে হাসুক, তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ নাই।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়া ছিল। হস্তী দন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি, মহামূল্য। প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণ মধ্য হইতে বাহির করিতে ছিল, যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবীর আয়ি ?"

প্রাচীনা বলিল, "এ আকবর বাদশাহের তসবীর।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।"

আর একজন বলিল, "সে কি লো ? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস কেন ? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়া ছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল এখানা জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি।

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল "ইহার দাম কত ?"

প্রাচীনা বড় দাম হাকিল,

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নূরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল ?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল, বলিল,

"বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা তসবীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন তবে আমি তসবীর দেখাইব। আজ তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাতজন সাত দিক হইতে বলিল, "ওগো আমি রাজকুমারী ! ও

আমি বুড়ী আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল,আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধুম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল প্রায় থামিল—কেবল তাকা তাকি আঁচাআঁচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধা অনিমিক্ লোচনে সেই সর্ব্ব শোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতা প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেত প্রস্তরের বর্ণ নহে, শাদা পাতর এত গোলাবি আভা মারে না। পাতর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারু বর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ও মা—পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতি দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হসিতেছে।

বুড়ী অবাক হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত সকল রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া, বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,

"হাঁ গা তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, কাঁদিস কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল, যে এটা গড়া পুতুল নহে—আসল মানুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজত্বকে নহে এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

আমি জানি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি অনেকে সেই রূপসীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রণাম রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম সম্বন্ধের পায়ে। "তুমি আমার গৃহিণী—অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার হাতে অন্ন জল—অতএব তোমাকে প্রণাম করি—আমাকে একমুঠা খাইতে দিও"—সে প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্তু বুড়ীর প্রণাম সে দরের নহে। বুড়ী বুঝি অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিল।

তিনিই রূপ, তিনিই গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের বা অনন্ত গুণের ছায়া দেখা যায়, সেইখানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হয়। অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যাবে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণাম করিল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা, এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবীর বেচিতে আসিয়াছেন?"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতা টা করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন,

"আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদসাহের তসবীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে আকবর বাদশাহ কি জাঁহাগীর বাদশাহের তসবীর কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল "থাকবে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা লইতে নাই? আপনারা লইবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরিব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবীর সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবীর গুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আকবর বাদশাহ, জাঁহাগীর, শাহা জাঁহা, নুরজাঁহা, নুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকল গুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে। হিন্দু রাজার তসবীর আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া, বলিল, "মা কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন "ওখানি

ঢাকিয়া রাখিলে যে ?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তসবীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন,"অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবীর যে দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষ্মনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবীর?

বুড়ী। (সভয়ে)। রানা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমিও তসবীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে। বীরপুরুষের চেহারা।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্র খানিতে দ্বিগুণ মুনফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল,

"ঠাকুরাণি যদি বীরের তসবীর লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিলেন।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্র গুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন,

"এসো একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল। বল।"

রাজপুত্রী বলিলেন,"আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটীতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটী বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল,

"অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী। বাক পক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি প্রস্তর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটীতে রাখিলেন,

"কে নাতি মারিবি মার।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী, ধীরে ধীরে অলঙ্কার-শোভিত, বামচরণ খানি, ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন — চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন — মড মড শব্দ হইল — ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুত কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে, সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কথাটা সমাপ্ত হইল না — কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল — এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে? এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, "আয়িবুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই— এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বলতে হয় মা। আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি।"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বুড়ী বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী বুঁদী। সে চিত্র গুলি দেশে দেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে বুঁদি গেল। সেখানে গিয়া দেখিল তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া,

বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয় বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে তখন বুড়ীর মন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক্ খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও বুঝি-তেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ ক-রিল যে এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী আর থাকিতে পারিল না—শপথ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর দুঃসা-হসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল, আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম তা হাতে ক্ষতি কি? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—আমার দিব্য এ কথা কাহার কাছে বলিও না।

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফি রিয়া গিয়াই, আপনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল জান! কা-হারও সাক্ষাতে বলিও না। জান, তখনই আপনার প্রিয় সখীর কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী দুই চারি দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাঁদী স্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাহের কাছে গল্প করিল।

ঔরঙ্গজেব সসাগর ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ এক চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু কুমনা ঔরঙ্গজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। যে যত ক্ষুদ্র হৌক, যে যেমন মহৎ হউক, কেহ তাঁহার প্রতিহিংসার অতীত নহে। অমনি স্থির করিলেন, যে সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার উচিত প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলি-লেন, "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।"

যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল—বলিল "সে কি জাঁহাপনা। যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্য-চ্যুত হইতেছে—এক সামান্যা বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য!"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিছু বলিলেন না কিন্তু সেই দিনেই চঞ্চলকুমারীর সর্ব্ব নাশের উদ্যোগ হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি

হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা ভয়ে জয়-সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ্ প্রভৃতি শাহ্‌জাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত—যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন —এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতা প্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাজার সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পানিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন, শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সম্বাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী একলিঙ্গের পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র নির্ম্মল তাহা দেখিতে পাইল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া, বলিল,

"এখন উপায়?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন? উপায় নাই, সখি!—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়।

যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ নবাব, সুবা, যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড লোক কে আছে, যে তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল ওপথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার করিতে পারে তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল,

"আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালন হইয়েছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে তাহা কি একবার ভাবিয়াছ?

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাতা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাথর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল "আমিও সেই পরামর্শই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি করিবে?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটী অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল। বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্ম্মল জানিত ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল শিহরিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলি মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে না প্রতাপ আছে?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াই বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, কিন্তু রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিতে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল—আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম

প্রতাপের বংশতিলক—তাঁরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?" বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইঁহার স্মরণ লই ইনি কি রক্ষা করিবেন না?"

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"রাজকুমারি—যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?"

রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,

"যে রাজপুত হইয়া, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে—সে রাজা হউক্ ভিক্ষুক হউক রূপবান্ হউক কুরূপ হউক যুবা হউক বৃদ্ধ হউক—যেই হউক—সে যদি আমায় যথাশাস্ত্র গ্রহণ করে তবে আমি চিরকাল তাহার দাসী হইব।"

নির্ম্মল কিছু প্রসন্ন হইল। বলিল, "রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না। গোপনে—কেহ না জানিতে পারে এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না?"

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভাল বাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।

নির্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছু মাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।